শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টিতে

নীতিশাস্ত্র

শ্রীল সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টিতে

চাণক্য-নীতিশাস্ত্র

শ্রীল সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

শ্লোক সূচী

প্রস্তাবনা

প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে চাণক্য নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজা চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো বেতন গ্রহণ করতেন না; বরং প্রাসাদের বাইরে একটি কুটিরে অবস্থান করে ব্রাহ্মণের কৃত্যসমূহ পালন করতেন। এভাবে কারও কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না নিয়ে তিনি সবার নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন। একবার সম্রাট তার কিছু কাজের কৈফিয়ত চাইলে তিনি বলেন, "যদি আমার কাজের জন্য আমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়, তবে আমি পদত্যাগ করব।"

চাণক্যের নীতি, মানবতাবাদী ও রাজনীতিবিষয়ক উপদেশগুলো এখনও আমাদের জন্য মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, তিনি ছেলেবেলাতেই চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকগুলো পড়েছিলেন। চাণক্যের রাজনীতিবিষয়ক লেখাগুলো এখনও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয়। যেহেতু তিনি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ ছিলেন, তাই দিল্লিতে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসগুলোকে এখনও চাণক্যপুরী বলা হয়।

(প্রবচন, লস অ্যাঞ্জেলেস– জুন ২২, ১৯৭২)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই তার প্রবচন ও কথাবার্তায় চাণক্যের শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি দিতেন, তাই ভক্তরা তার সম্বন্ধে আরও জানতে চাইতো।

যমুনা দাসী : তিনি কি বড় মাপের ভক্ত ছিলেন?

প্রভুপাদ : না।

যমুনা : তিনি তো কোনো আচার্য ছিলেন না।

প্রভুপাদ : না, না, তিনি কোনো আচার্য ছিলেন না। তিনি রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ ছিলেন। প্রধানত তিনি একজন জড়-জাগতিক ব্যক্তিত্বই ছিলেন বলা যায়।[১]

একবার প্রভুপাদের একজন শিষ্য 'সিদ্ধস্বরূপ দাস' জিজ্ঞেস করেছিলেন, "চাণক্য পণ্ডিতের জনপ্রিয়তা কি ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়?" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেছিলেন, "তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে তার উপদেশগুলোর পারমার্থিক বিশেষত্ব না থাকলেও নৈতিক গুরুত্ব তো অবশ্যই আছে।"[২]

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "যদি চাণক্য কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব না হয়ে থাকেন, তবে শ্রীল প্রভুপাদ কেন প্রায়ই তার লেখার উদ্ধৃতি দিতেন?" চাণক্যের নীতিশিক্ষামূলক উপদেশগুলো অবশ্যই প্রজ্ঞা বা শাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে, যা পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশেও দেখা যায়। কৃষ্ণভাবনা নীতির দর্শন

নয়, বরং তা অপ্রাকৃত। কিন্তু তবুও চাণক্যের উপদেশগুলো সদাচারমূলক শিক্ষার নিদর্শন। সুতরাং তা পরমার্থ অনুশীলনকারী ভক্তদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার ওপর লেখা চাণক্যের শিক্ষাগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের জন্য তা অনুসরণীয়ও বটে। কীভাবে শান্তিতে থাকা যায় এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়, সে বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকরী উপায় চাণক্যনীতিতে রয়েছে। চাণক্য এও উল্লেখ করেছেন যে, নৈতিক চরিত্র আমাদের জীবনে পরিণামে সুখ নিয়ে আসে। শুধু ইন্দ্রিয় উপভোগপূর্ণ অসভ্য জীবন কেবল আমাদের জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্য দুঃখ বয়ে আনে। এ ধরনের অপদার্থের কী প্রয়োজন?

আমি সেই প্রথম দিকে দিনগুলোর কথা স্মরণ করছি, যখন শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্যনীতি সম্পর্কে শিষ্যদের বলতেন। একবার একজন ভক্ত আমাদের আন্দোলন পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তখন আরেকজন ভক্ত চিঠির মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কীভাবে তা হলো? প্রভুপাদ উত্তরে বলেছিলেন, "আমি তাতে কিছুই মনে করিনি। আমাদের অনেক তারকার প্রয়োজন নেই, একটি চাঁদই যথেষ্ট। আমাদের অনেক চাঁদ আছে।" তখন তিনি আমাদের নাম– মুকুন্দ, সৎস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ উল্লেখ করেছিলেন।[৩]

তখন আমাদের ধারণাই ছিল না যে, এটি একটি চাণক্য শ্লোক। শ্রীল প্রভুপাদ সব সময় তার বিভিন্ন মন্তব্যের উৎস সম্বন্ধে বলতেন না। পরবর্তীকালে আমরা বুঝতে পারি যে, পাশ্চাত্যের শেক্সপিয়রের মতো ভারতেও চাণক্য পণ্ডিত অনেক বিখ্যাত ছিলেন।

প্রভুপাদ চাণক্যকে একজন যথার্থ জ্ঞানী বলে স্বীকার করেছিলেন। একবার এক ভক্ত প্রভুপাদকে সরকারের সমালোচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। ভক্তটি ভেবেছিলেন যে, এতে হয়তো প্রভুপাদ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রশ্নটি হলো– "এক তাৎপর্যে আপনি সরাসরি নারী প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন এবং আরেক তাৎপর্যে আপনি বলেছেন যে, জনগণের গোপন কোষাগার রাখা উচিত, যা সরাসরি সরকারের আয়কর নীতিবিরুদ্ধ।" প্রভুপাদ উত্তরে বলেন, "ঠিক আছে, কিন্তু চাণক্য একজন প্রামাণিক ব্যক্তিত্ব, আমি তার লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাহলে আমার দোষ কোথায় অন্যথায় কেন তোমরা চাণক্যপুরী বলছো? তিনি গান্ধীর মতো বড় নেতাদের মতোই সম্মানীয়। আমার দোষ নেই। আমি শুধু প্রামাণিক উৎস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি মাত্র।"[৪]

শ্রীল প্রভুপাদ চাইতেন যেন আমরা নীতিশিক্ষা লাভ করি এবং একইসাথে জড়-জাগতিক ব্যাপারেও দক্ষ হই, যাতে কেউ আমাদের প্রতারণা করতে না পারে। ইতোমধ্যে ২৬নং সেকেন্ড এভিনিউতে, সে স্থানটির মালিক মি. পাইন্

আমাদের সাথে প্রতারণা করেছিলেন। মি. পাইন্ মণিভূষিত বিষধর সর্পের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা সেই মণির ঔজ্জ্বল্যে প্রলুব্ধ হয়ে মি. পাইনের বিষধর সর্পদংশনে দংশিত হয়েছিলাম।

একটি নীতিতে চাণক্য বলেছেন যে, যদি কোনো প্রতারকের সাথে আমাদের চুক্তি বা বিনিময় করতে হয়, তবে আমাদেরও খুব বিচক্ষণ হতে হবে। এ শ্লে-াকটি শ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিষ্যদের জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক।

১৯৭৭ সালে প্রভুপাদের আমেরিকান শিষ্যরা সংস্কৃতিবিরোধী আন্দোলন করছিল। আমরা আন্দোলনের পক্ষের কয়েকজন প্রফেসরের নাম ছাপাতে যাচ্ছিলাম। তাতে রামেশ্বর ভীত হয়েছিল, কারণ সংস্কৃতিবিরোধীরা অবশ্যই এই তালিকা ব্যবহার করে প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবে। তখনও শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্যনীতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, "পরিকল্পনা ফাঁস করো না, পণ্ড হয়ে যাবে।"

আমার মনে পড়ে যখন আমি আমার বইয়ের গবেষণার জন্য বৈদিক সাহিত্য পড়ছিলাম, বিশেষ করে চাণক্য সম্বন্ধীয় একজন পণ্ডিতের লেখা একটি বই। এই পণ্ডিত চাণক্যকে ভারতীয় ম্যাকিয়াভ্যালি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ধূর্ত রাজা চন্দ্রগুপ্ত রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভ করার জন্য অবৈধ কাজেও চাণক্যকে তার দপ্তরে ব্যবহার করতেন। সেই পণ্ডিত বলেছিলেন, "চাণক্য ভবিষ্যতের মানুষের জন্য 'নোংরা রাজনীতি' নামে একটি বই লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে যার কোনো নীতিই নেই।" এই লোকটির ব্যাখ্যা প্রভুপাদের ব্যাখ্যার সাথে এতো অমিল ছিল যে আমি তার বইটি শেষই করিনি।

চাণক্য পণ্ডিত অবৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীল প্রভুপাদ তার বিশেষ কিছু নীতি যেগুলো কৃষ্ণভাবনায় ব্যবহার করা যায়, সেগুলো উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ একজন বিষয়ী মানুষ বলে তার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ে, হায়দ্রাবাদে ভ্রমণের সময় শ্রীল প্রভুপাদকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "চাণক্য কি বৈষ্ণব?" প্রভুপাদ বলেছিলেন, "না, তিনি একজন মায়াবাদী।" আমি বুঝতে পেরেছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্যের নীতিগুলোও সেবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। চাণক্য বলেছেন, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।" এই উপদেশগুলো তার নিজস্ব বুদ্ধিপ্রসূত নয়। তা হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মতো নীতিশাস্ত্র থেকে নেওয়া। এই উপদেশগুলো ভারতীয় সংস্কৃতি ও চেতনার প্রবাহস্বরূপ। একটি প্রবাদ আছে, "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।" ভারতীয়দের এ ধরনের অমূল্য নীতি-সম্পদ আছে বলেই শ্রীল প্রভুপাদ তার প্রবচন এবং কৃষ্ণভাবনায় এসব ব্যবহার করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, চাণক্য বলেছেন যে, "যেহেতু জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই আমাদের এমন কিছু করতে হবে, যাতে আমরা অমর হই। শ্রীল প্রভুপাদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যদিও চাণক্য এখানে এমন কিছু করার কথা বলেছেন, যেজন্য মৃত্যুর পরও আমাদের কথা সকলে স্মরণ করবে, তবুও তা জড়-জাগতিক বিচার। জীবন সার্থক করার একমাত্র উপায় কৃষ্ণভজন।" এভাবেই তিনি চাণক্যের জাগতিক নীতিকে পারমার্থিকতায় পর্যবসিত করতেন।

প্রভুপাদ তার প্রবচনগুলোকে রসালো করার জন্য চাণক্যের নীতিগুলো ব্যবহার করতেন। যখনই চাণক্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হতো, তখনই শ্রোতারা আরও উজ্জীবিত হতো এবং অধিক মনোযোগ দিত। এ নীতিকথাগুলো সবসময় খুব আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিদীপ্ত হতো। এরপর চাণক্য শ্লোক থেকে আমরা আবার কৃষ্ণভাবনায় প্রবিষ্ট হতাম।

শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবচন ও আলোচনা থেকে চাণক্যের এ নীতিকথাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। আশা করছি, এর মাধ্যমে আমরা পাঠককে একটি মূল্যবান সংগ্রহ দিতে পারব। যারা প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন তারা ইতোমধ্যেই চাণক্যের শ্লোকের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু আশা রাখছি, বইটি তাদের অধ্যয়নেও এবং শ্রীল প্রভুপাদের চমৎকার প্রচার কৌশলের ভেতরে প্রবেশ করে দৈনন্দিন জীবন ও প্রচারে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করবে। একবার গুরুকুলের এক শিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভক্তরা চাণক্যের শ্লোকগুলো অনুবাদ করে বাচ্চাদের শিক্ষা দেবে কি না। প্রভুপাদ বলেছিলেন, "চাণক্যের শ্লোকগুলোর জন্য আমার মায়া হয়; যদি আমি নিজেই অনুবাদ করে তা প্রকাশের জন্য তোমার কাছে পাঠাই তাহলে আরও ভালো হতো।"[৫] এ থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ এটি অনুবাদের জন্য অনুগামীদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

আমি অগ্রাহ্য প্রভুর কাছে এ বই অনুবাদের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তার সাথে গ্রন্থের কাজ করতে পেরে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত এবং আমরা ভবিষ্যতে অনেক গ্রন্থের কাজ করতে পারব বলে আশা করছি।

–সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

[১] কক্ষে আলোচনা, ইন্দোর, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭০।

[২] প্রাতঃভ্রমণ, হনলুলু, জুন ১৮, ১৯৭৫।

[৩] পত্র, নভেম্বর ১১, ১৯৬৭।

[৪] প্রাতঃভ্রমণ, মায়াপুর, ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯৭৬।

[৫] পত্র, এপ্রিল ১১, ১৯৭৪।

শ্লোক ১

একোহপি গুণবান পুত্র নির্গুণেন শতেন কিম্।
এক চন্দ্রো তমোঃন্তিন চঃ তারা সহস্রাঃ ॥

একো– এক, ***অপি–*** এমনকি, ***গুণবান–*** সুযোগ্য বা গুণসম্পন্ন; ***পুত্র–*** পুত্র; ***নির্গুণেন–*** অযোগ্য, ***শতেন-*** শত, ***কিম-*** কি (মূল্য), ***তমো-*** অন্ধকার রাত্রি, ***হন্তি-*** ধ্বংস করে, ***ন-*** না, ***চ-*** এবং, ***তারা–*** নক্ষত্ররাজি; ***সহস্রঃ-*** হাজার হাজার।

অনুবাদ

সদগুণসম্পন্ন একজন পুত্র অযোগ্য শত শত পুত্রের চেয়েও শ্রেয়। যেমন একটি চাঁদই রাতের অন্ধকার দূর করে, অথচ হাজার হাজার তারকা তা করতে পারে না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সফলতা, এর সাথে যুক্ত জনবল দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদ কখনোই এ ধরণের সহজিয়া শিষ্য বা শিষ্যাদের চাইতেন না, যারা অবৈধসঙ্গ, আমিষাহার, জুয়াখেলা ও নেশা বর্জন এই চারটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করে না। যদি অধিক শিষ্য গ্রহণ করা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তবে তিনি তাদের অবশ্যই বলতেন, "তোমরা যা খুশি তা করতে পার এবং আমাকে টাকা দিলেই বিনিময়ে তোমাদের মন্ত্র দেব।" প্রভুপাদের উত্তরসূরিদেরও এমন সহজিয়া শিষ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অর্থাৎ সংখ্যা নয়, মানের ওপর জোর দেওয়া উচিত। যখন আমরা মানের প্রতি গুরুত্ব দেব, তখন এমনিতেই অনুসারীর সংখ্যা বাড়বে।

শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার প্রচারক শিষ্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রবচন প্রদানের জন্য পাঠাতেন। মাঝেমধ্যে তারা ফিরে এসে বলতেন যে, খুব অল্পসংখ্যক লোকই তাদের প্রবচন শুনতে আসে। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "হতাশ হয়ো না; যদি কেউ না আসে তবে চার দেয়ালের কাছে আমরা প্রচার করব।" প্রভুপাদও বলতেন, "এই ভেবে আমাদের সান্ত্বনা পাওয়া উচিত, অন্তত দেয়ালে বসবাসকারী পোকামাকরগুলো তো নামকীর্তন শুনছে। চন্দ্র, সূর্য কিংবা দশ দিকের কাছে আমরা প্রচার করব।" অর্থাৎ কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম যেই-ই শুনুক না কেন, কোনো না কোনোভাবে সে উপকৃত হবেই। অধিক অনুসারী তৈরির জন্য প্রচারকদের ভগবানের কথা বিকৃত করা কখনই উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্যে এসেছিলেন, তখন তার পরিচিত অনেকে তাকে তার নিয়মকানুনগুলো শিথিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা প্রভুপাদকে

সংস্কৃত মন্ত্র পরিত্যাগসহ আমেরিকান পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাতে কখনোই সায় দেননি। এমনকি অনেকেই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ নামটির পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক ঈশ্বরভাবনামৃত সংঘের নাম রাখতে বলেছিল। কারণ তাতে, আরও অধিক সংখ্যক অনুসারী পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রভুপাদ তাতেও অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, আপসের চেয়ে শুদ্ধতার প্রতি মানুষ বেশি আকৃষ্ট হবে। যেমন যে সব দোকানিরা ঘি দিয়ে রান্না করে ক্রেতারা তাদেকে অধিক মূল্য প্রদান করে।

যাই হোক, সাধারণ মানুষ সংগঠনের সফলতা বিচার করে লোকবলের ভিত্তিতে। ঠিক যেমন কোনো ব্যবসার সফলতা নির্ভর করে সেই ব্যবসার আর্থিক সম্পদের ওপর। অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন একবার এক রিপোর্টার প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা এত অল্প কেন?" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, "সংখ্যার দিক দিয়ে চাঁদ আকাশে খুবই নগণ্য, কারণ সেখানে অসংখ্য তারকা বর্তমান। কিন্তু এ অসংখ্য তারকার চেয়ে একটি চাঁদের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই চাঁদের কাছে তারকার আধিক্যের হিসাব মূল্যহীন। সুতরাং একটি চাঁদ, অর্থাৎ একজন আদর্শ ব্যক্তিই যথেষ্ট। ঠিক যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ হচ্ছেন ভগবান যিশুখ্রিস্ট।"[১]

একজন যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রভাব অনেক বেশি। "যদি একটি চাঁদও তৈরি করতে পারি, তবে তা-ই যথেষ্ট। অনেক তারকার কোনো প্রয়োজন নেই। এটি আমার গুরুমহারাজের নীতি। অতএব, আমারও নীতি। বেশিসংখ্যক বোকা বা মূর্খের কী প্রয়োজন? যদি একজনও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তবে সে একাই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করতে পারবে।"[২]

এই "এক চাঁদ" নীতির মানে এই নয় যে, শুদ্ধতার বিচারে আমাদের শুধু অল্পসংখ্যক অনুসারীই থাকবে; বরং প্রকৃত রুচিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী এতে আপনাআপনিই আকৃষ্ট হবে। কারণ, এমন যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সারা বিশ্বে নিজেই যথাযথভাবে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আচরণ করে প্রচার করবেন এবং নিজেই উদাহরণ হয়ে থাকবেন। যার ফলে প্রকৃত অনুসারীরা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের সে রকম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করার প্রয়াসী হবে। এভাবে অনুসারীরা সেই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে যুক্ত হয়ে তাকে প্রচারে সহায়তা করবে।

এ ক্ষেত্রে কেউ আবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে যে, "এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কি সে রকম কোনো ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে পেরেছে?" প্রভুপাদকে এ প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেছিলেন, "তা সম্ভব যদি তারা আদর্শ মানুষ হয়।"

কৃষ্ণভাবনা প্রশিক্ষণ মানেই যথার্থ ব্রাহ্মণ তৈরি করা। সকল ভক্তদেরই এমন সাধারণ মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এ জন্যই 'ইস্‌কন'- এ দীক্ষা

গ্রহণের পূর্বে অনুসারীদের চারটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করাসহ প্রতিদিন কমপক্ষে ষোল মালা জপ করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ বিধিসমূহ পালন করার ফলে অধঃপতিত জীব ধীরে ধীরে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে একসময় একজন গুরু হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সবাইকে ব্রাহ্মণ হতে হবে– শ্রীল প্রভুপাদ তা প্রত্যাশা করেননি এবং আদৌ তা সম্ভব নয়। কিন্তু একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান আমাদের তৈরি করতেই হবে; তবে এমন নয় যে, সবার সাথেই আপস করব। তা আমাদের কাজ নয়।”[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ এবং তার গুরুদেব বিশ্বাস করতেন যে, তাদের এই সমস্ত ত্যাগ সার্থক হবে যদি একজনও কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। তার এই ত্যাগ ধারণার চেয়েও অধিক গতিতে উপযুক্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে প্রভুপাদ নিজেও অবাক না হয়ে পারেননি। “একটি চাঁদই যথেষ্ট, আমাদের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য একজন শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করা। কিন্তু সৌভাগ্যবশত, কৃষ্ণের কৃপায় বহু চাঁদসদৃশ ছেলে-মেয়ে এই কৃষ্ণভাবনামৃতে যোগদান করেছে।”[৪]

সম্ভবত আমাদের মধ্যে কেউ-ই নিজেকে সে রকম শুদ্ধ ভক্ত বলে দাবি করতে পারি না। তবুও আমরা শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিটিকে হৃদয়ে ধারণ করি। তাই ভক্তদের শুধু অধিক সংখ্যক অনুসারী বানানোর প্রতি জোর না দিয়ে তাদের মান উন্নয়নের ওপরও জোর দেওয়া উচিত। কেননা শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তার প্রচেষ্টা সার্থক হবে, যদি তার কথায় একজনও শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়। সম্পর্ক তৈরির একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণের প্রতি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা জাগরিত করা এবং অন্যদের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করা।

পক্ষান্তরে, ভক্তের গুণগত শরণাগতির মান বলতে তার সেবা মানসিকতার ক্রমোন্নতিকেই নির্দেশ করে। শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলন সম্প্রসারিত করার জন্য ভক্তরা গ্রন্থ বিতরণ, মন্দির নির্মাণ বা সংস্কারসহ অন্য যেকোনো প্রচারমূলক সেবা করছে কি না, তা নির্দেশ করে কৃষ্ণভাবনার প্রতি তাদের বিশ্বাসের গভীরতা কতটুকু। সুতরাং গুণ ও সংখ্যার মধ্যে কোনোরকম ভুল বিভাজন রেখা অঙ্কন করা আমাদের কখনই উচিত নয়। মান বৃদ্ধি পেলে সংখ্যা আপনাআপনিই বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, সবকিছু যথাযথ হওয়া উচিত। প্রচার, প্রসাদ, মন্দির ভবন সবকিছুই যদি মানসম্পন্ন হয়, তবে আমাদের আন্দোলনও অবশ্যই মানসম্পন্ন হবে। সকলেই আমাদের মানের প্রতি আকৃষ্ট হবে, কিন্তু তারা যদি আকৃষ্ট নাও হয়, তবু আমাদের শুদ্ধভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার চালিয়ে যেতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ তার ভগবদ্গীতার প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। প্রভুপাদের প্রথম গীতা প্রকাশকারী কোম্পানি ম্যাকমিলান থেকে প্রভুপাদকে বলা হয়েছিল যে, অন্যান্য ভগবদ্গীতার বিক্রয় যেখানে কমে যাচ্ছে, সেখানে তার ভগবদ্গীতার বিক্রয় দিন দিন বেড়েই চলছে। তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আমার ভগবদ্গীতা মানসম্মত।"

তাহলে ইস্‌কনে বহুসংখ্যক সদস্য নেই কেন? শ্রীল প্রভুপাদ একটি বিপরীতার্থক উপমা প্রদান করে বলেছিলেন, "যখন তুমি হীরক বিক্রয় করবে, তখন তোমার ক্রেতার সংখ্যা কমই হবে।" প্রভুপাদ শুদ্ধতার মূল্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি আমার শিষ্যদের পাপপূর্ণ জীবন থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে কঠোর না হতাম, তাহলে আমার লক্ষ লক্ষ শিষ্য থাকত।"[৫]

যদিও খুব অল্পসংখ্যক ভক্তই চাঁদসদৃশ হতে চাইত, কিন্তু আমরা সময় অতিক্রমের সাথে সাথে দেখতে পাই যে, এ আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক চাঁদসদৃশ ভক্ত তৈরি হচ্ছে। এ আন্দোলনে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তিই সাধারণ নয়। তাদের দৈন্য, দয়া এবং বৃন্দাবন ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষ্ণের প্রতি তাদের ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, যদিও চাঁদের কলঙ্ক আছে তবুও চাঁদ আকাশে তার উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করে। ভক্তদের গুণাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই তাদের সম্বন্ধে নেতিবাচক বিচার করা উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ হলেন চাঁদ আর আমরা তার কিরণ। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন পূর্ণচন্দ্র।

চাণক্যের এ শ্লোকে দুটি উপমা আছে, একটি চাঁদের সাথে তারকার তুলনা এবং আরেকটি অনেক মূর্খ সন্তানের চেয়ে গুণসম্পন্ন একজন সন্তানের তুলনা। শ্রীল প্রভুপাদ এর অনুবাদ করেছেন, "একজন মূর্খ ও অভক্ত সন্তানের কী প্রয়োজন? দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ– সন্তানকে শিক্ষিতও হতে হবে এবং ভক্তও হতে হবে। না জেনে বা শিক্ষা লাভ না করে কেউ ভক্ত হতে পারে না, আর ভক্ত হলে তার সবই জানা হয়ে যায়। অনেক সময় জাগতিকভাবে কেউ শিক্ষিত নাও হতে পারে অথবা ভক্ত না হতে পারে। কিন্তু যদি ভক্তও না হয় আবার শিক্ষিতও না হয়, তবে এমন সন্তানের কী প্রয়োজন?"[৬]

নীতিশাস্ত্রেও এমন একটি কথা আছে। যদি অন্ধ ব্যক্তির চোখে যন্ত্রণা হয়, তবে তা তুলে ফেলাই শ্রেয়। হিন্দি কবি তুলসী দাস বলেছেন যে, পুত্র এবং মূত্রের উৎস একই। যদি পুত্র বিদ্বান কিংবা ভক্ত না হয়, তাহলে সে মূত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় : একটি সুগন্ধি পুষ্প যেমন একটি

বনকে মহিমান্বিত করে, তেমনি কোনো বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন আগুন সম্পূর্ণ বনটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

সুতরাং একজন মূর্খ ব্যক্তি কেবল অযোগ্যই নয়, ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মকও বটে। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব একাই সমগ্র জগতকে উদ্ধার করতে পারেন।

একজন মূর্খ ব্যক্তি যত ক্ষমতাসম্পন্ন বা জনপ্রিয়ই হোক না কেন, ভালো কিছু করতে পারে না বা বেশি দিন টিকতে পারে না। সে জন্য শিক্ষক, সরকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিত শুদ্ধ আধ্যাত্মিক গুণ অর্জনে তাদের অনুসারীদের উৎসাহিত করা এবং নিজেদের মধ্যেও সেসব গুণ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করা। এভাবেই সমাজের উন্নতি সম্ভব।

তাহলে একজন চাঁদসদৃশ ভক্তের কী কী গুণ থাকা উচিত? শ্রীল প্রভুপাদকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো– কী তাকে সবচেয়ে বেশি খুশি করবে? প্রভুপাদ উত্তরে দিতেন, “কৃষ্ণকে ভালোবাসো।”[৭] সমস্ত সদগুণ কৃষ্ণপ্রেমের অধীন। কৃষ্ণকে ভালোবাসলে অন্য সকল গুণ যেমন– সত্যবাদিতা, পরিশুদ্ধতা, শান্তি, দয়া ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই আসবে। যখন কেউ কৃষ্ণকে ভালোবাসে তখন সে স্বাভাবিকভাবেই তার গুরুর প্রতিও অনুগত ও সমর্পিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই যোগ্য কথাটি ব্যবহার করতেন। এর মানে ভক্তকে উত্তম প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হতে হবে। এটিই মূল বিষয়– সত্যিকার অর্থে নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও প্রয়োগ কেবল বৈষ্ণব আচার্যগণই দেখাতে পারেন।

[১] কক্ষে আলোচনা, মেলবোর্ন, মে ২১, ১৯৭৫।

[২] প্রাতঃভ্রমণ, বোম্বে, মার্চ ২৩, ১৯৭৪।

[৩] প্রাতঃভ্রমণ, লস্ এঞ্জেলস্, জুন ২৩, ১৯৭৫।

[৪] প্রবচন, নিউইয়র্ক, এপ্রিল ১২, ১৯৬৯।

[৫] কক্ষে আলোচনা, বোম্বে, জানুয়ারি ৭, ১৯৭৭।

[৬] প্রবচন, বোম্বে, অক্টোবর ১, ১৯৭৪।

[৭] প্রবচন, নিউইয়র্ক, এপ্রিল ১২, ১৯৬৯।

শ্লোক ২

ঋণকর্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥

ঋণকর্তা– ঋণকারী; ***পিতা–*** পিতা; ***শত্রু–*** শত্রু; ***মাতা– মা; চ–*** এবং; ***ব্যভিচারিণী–***অবিশ্বাসী; ***ভার্যা–***স্ত্রী; ***রূপবতী–*** সুন্দরী; ***শত্রু–*** শত্রু; ***পুত্র–*** পুত্র; ***শত্রু–*** শত্রু; ***অপণ্ডিত–*** জ্ঞানহীন।

অনুবাদ

ঋণগ্রহণকারী পিতা, অসতী মাতা, অধিক সুন্দরী স্ত্রী এবং অজ্ঞ পুত্র পারিবারিক জীবনের শত্রু।

তাৎপর্য

কলিযুগের একটি লক্ষণ হলো গৃহশত্রু। কলিযুগ কলহের যুগ। বিশ্বজুড়ে মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত– দেশের সাথে দেশের যুদ্ধ, দেশের ভেতরে যুদ্ধ, সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের যুদ্ধ এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও যুদ্ধ। কারও শান্তিতে বসবাসের জো নেই।

যে পিতা পরিবারকে ঋণগ্রস্ত করে, তার কারণে এমনকি তার মৃত্যুর পরও পরিবার দারিদ্র্যের কশাঘাতে কষ্ট পায়। যদিও পরিবারের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র নিয়তি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকের যৌথ কর্মের দায় পুরো পরিবারকেই নিতে হয়। পিতা যদি ঋণ গ্রহণ করে, তবে সে জন্য পুরো পরিবারকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। পিতা ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ঋণ লাভ করে। প্রভুপাদ বলেছেন, "বৈদিক আইন অনুযায়ী পুত্র তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য। যেহেতু পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি লাভ করে, তাই পিতার ঋণ কেন গ্রহণ করবে না?"[১] শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্পর্কে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবি 'সি.আর দাস'– এর উদাহরণ দিয়েছেন। তার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। তাই 'সি. আর দাস' যখন ব্যারিস্টার হলেন, তখন তিনি তার পিতার ঋণের টাকা পাওনাদারদের 'পাই টু পাই' বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, যদি পুত্র দরিদ্র হওয়ার কারণে পিতার ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তবে তাকে অপমানিত হতে হয়। এভাবে একজন পিতাও শত্রু হতে পারেন।

পিতা যদি পুত্রকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা না দেন, তবে তিনিও শত্রুরূপে বিবেচিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, যদি কোনো পিতা তার সন্তানকে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারে, তবে তার পিতা হওয়া

উচিত নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তার পিতাকে হত্যা করতে দেখেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করেননি, কারণ তার পিতা ছিলেন কৃষ্ণবিমুখ এবং পরিবারের শত্রু। এই কৃষ্ণবিমুখ মনোভাবের কারণে হিরণ্যকশিপু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শত্রুতে পরিগণিত হয়েছিল। এ জন্যই সে ভগবান নৃসিংহদেব কর্তৃক বধ হয়েছিল।

চাণক্যের নীতিসমূহ বৈদিক সভ্যতার ধারক-বাহক হয়ে আছে। কৃষ্ণভাবনাহীন সমাজে নৈতিকতা অনুসরণ করা কঠিন। অথচ কৃষ্ণভাবনাময় সভ্যতা ছাড়া নৈতিকতা অচল। অত্যন্ত দুঃখের কথা হলো, সমাজ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে এসব মৌলিক নৈতিকতা অনুসরণ করা এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক সভ্যতায় যে স্ত্রীর কোনো সন্তান নেই, তার স্বামী মারা গেলে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। যদি কোনো রমণীর সন্তান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে তিনি ঐ সন্তানের শত্রু বলে পরিগণিত হন।[২] বৈদিক সভ্যতায় ব্যভিচারের কোনো স্থান নেই। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "পরিবারিক জীবনে পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং সন্তানেরাই সম্বল; কিন্তু স্ত্রী বা মাতা যদি স্বামী বা পুত্রের উপস্থিতিতে অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তবে বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী তাকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয়। একজন ধর্মপরায়ণা ও বিশ্বস্ত রমণী কখনোই ব্যভিচারী হতে পারে না।"[৩]

অতি আবেগী কোনো নারী কখনও স্বামীর কাছে ধর্মপরায়ণা হয়ে থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েরই ভুল হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী যখন অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখনই বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি ব্যভিচারী হয়, তাহলে সেও তার পরিবারের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় এবং শত্রু বলে পরিগণিত হয়।

গৃহস্থ আশ্রমে স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়া যায়। স্বামী যদি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, তবে তিনি আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ স্ত্রীকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এমন সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তির প্রতি তার স্ত্রী আবেগ ও অজ্ঞতা ভুলে গিয়ে অনুগত হয়। এ ধরনের জীবন খুবই সুন্দর হয়।"[৪]

ঋণী পিতাকে বা চরিত্রহীন স্ত্রীকে পরিবারের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা খুবই সহজ, কিন্তু একজন সুন্দরী স্ত্রী কীভাবে পরিবারের শত্রু হতে পারে? এর একটি কারণ, পুরুষটি তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত এবং এভাবেই ব্যভিচার হতে পারে। রাবণ সীতা দেবীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে অপহরণ করেছিলেন। সুন্দরী রমণীর স্বামী সর্বদাই দুশ্চিন্তায় থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "আমার পিতা আমার জন্য যে মেয়েকে পছন্দ করেছিলেন, তাকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। যদিও সে বিশ্বস্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তবু তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইনি। তাই পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে আমি

পিতার সাথে আলোচনা করেছিলাম। পিতা আমাকে বারণ করেছিলেন। একদিন পিতা আমাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, তুমি আবার বিয়ে করতে চাইছ বটে, কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি তা করো না। তুমি তোমার স্ত্রীকে পছন্দ কর না, এ তো খুব সৌভাগ্যের কথা।" এ কথার জন্যই প্রভুপাদ তার পিতার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, কারণ তার পিতার বাধাই তার জন্য মহৎ আর্শীবাদ বয়ে এনেছিল। যদি তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হতেন, তবে এত সহজে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে পারতেন না। পারমার্থিক জীবনে স্ত্রীর প্রতি আসক্তি এক প্রকার প্রতিবন্ধকতা।[৫]

সুন্দরী রমণী প্রকৃতপক্ষে কে? ব্যক্তিভেদে তা ভিন্ন হতে পারে। সৌন্দর্য নিহিত থাকে দর্শকের চোখে। বিশেষভাবে যুবতী অবস্থায় একজন নারী পুরুষের কাছে বেশি আর্কষণীয় হয়। "প্রাকৃতিকভাবেই নারীরা যৌবনকালে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। তা না হলে সে কীভাবে পুরুষের দ্বারা সুরক্ষিত হবে? তাদের সুরক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট না হলে সে কীভাবে সুরক্ষা পাবে?"[৬]

এই শ্লোকে শুধু সুন্দরী রমণীর কথাই বলা হচ্ছে না, বরং স্বামী যার প্রতি আসক্ত এমন যেকোনো নারীর কথাই বলা হচ্ছে। তার মানে কি এই যে, প্রত্যেক স্ত্রীই তার স্বামীর শত্রু? না, তাকে এভাবে দেখার প্রয়োজন নেই; যদি সে স্বামীকে আকৃষ্ট করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবোনদের গোপীরূপে দর্শন করতে বলতেন। তারা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সৌন্দর্যকে কৃষ্ণের সম্পদ বলে মনে করে, তবে সে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শান্তিতে বাস করতে পারবে। সৌন্দর্য বিপজ্জনক নয়, সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণই বিপজ্জনক।

এ শ্লোকগুলো বিভিন্ন শিক্ষায় পরিপূর্ণ এবং তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ঋণগ্রস্ত পিতা পরিবারের শত্রু, কিন্তু সেই পিতা যদি তার সন্তানদের কৃষ্ণভাবনার শিক্ষা প্রদান করেন, তবে সেটাই পরিবারের প্রতি তার সর্বোত্তম দায়িত্ব। জো কেনেডি নামে একজন ব্যক্তি তার প্রত্যেক সন্তানের জন্য দশ মিলিয়ন ডলার করে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার সন্তানদের বড় শত্রু; কেননা তিনি তার সন্তানদের আত্মোপলব্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞান রেখে গিয়েছিলেন।

মূর্খ পুত্র বা কন্যা পরিবারের জন্য বোঝা। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা রাজা অঙ্গের কথা শুনেছি, যার পুত্র বেন সন্ত্রাসী ও অসৎ ছিল। রাজা অঙ্গ ছিলেন ধার্মিক। তাই পুত্রের প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন।

এসব প্রতিবন্ধকতা ও শত্রুর কারণেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পারিবারিক জীবনকে পরমাশ্রয় বলে মনে করে না। এমন প্রতিকূলতা আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়,

বরং খুবই স্বাভাবিক। গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে হিরণ্যকশিপু একদিন তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করল যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম? প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তরে বলেছিলেন, "বিষাক্ত সর্পে পূর্ণ অন্ধকূপের ন্যায় এ পরিবার ত্যাগ করে বনে গমন করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।" প্রভুপাদ লিখেছেন, "বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরই মানুষকে সমস্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে বাকি জীবন কৃষ্ণভাবনায় উৎসর্গ করা উচিত।"[৭]

ভক্তরা প্রশ্ন করতে পারেন, কৃষ্ণভাবনাময় গৃহস্থ জীবনে এসব বিষয় আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কি? কিন্তু ইস্‌কন ভক্তদের মধ্যেও তো ব্যভিচার, পুনর্বিবাহ ও ঋণগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা দেখা যায়; তাই চাণক্যের নীতিশিক্ষা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।

আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে একটি পরিবারের সাথে তুলনা করতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই গুরুদেবকে পিতা এবং শিষ্যদের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করতেন। সে জন্যই পুত্র যদি বোকার মতো আচরণ করে বা নারী যদি অসতী হয়, তবে সেই প্রভাব সবার ওপর পড়বে। একইভাবে ভক্তরা যদি পরিশুদ্ধ আচরণ করে, তবে সমগ্র ইস্‌কন পরিবারই উপকৃত হবে।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, মন ও ইন্দ্রিয় ছাড়া আমাদের আর কোনো শত্রু নেই। এটিই মহাভাগবতের লক্ষন। যাই হোক, শ্রীল প্রভুপাদ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার শত্রুর হাত থেকে আমাদের আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করতেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, আমাদের আন্দোলনের প্রকৃত বিপদ নিজেদের মধ্য থেকেই আসবে। বিপদই আমাদের মতবিভেদ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে।

ইস্‌কন হলো ঐক্যবদ্ধ পরিবার। পরিবার হলো সাধারণ উদ্দেশ্যে নিবেদিত শান্তিপূর্ণ সুখী সংঘ। তবু পরিবারে শত্রু থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনা প্রচারের নাম করে অপব্যয় করে, তবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। প্রচারের জন্য এ ধরনের ব্যক্তি শত্রুও বটে। কৃষ্ণসেবার ক্ষেত্রে আমাদের কারোরই বোকা হওয়া উচিত নয়। একজন বোকা সন্তান শত্রু বলে বিবেচিত।

১ প্রবচন, বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৬।
২ প্রবচন, লস্ অ্যাঞ্জেলেস, জুন ২৫, ১৯৭৫।
৩ ভা. ৩/২৩/৩ তাৎপর্য।
৪ ভা. ৪/২৭/১ তাৎপর্য।
৫ প্রাতঃভ্রমণ, মায়াপুর, জানুয়ারি ২২, ১৯৭৬।
৬ প্রাতঃভ্রমণ, মায়াপুর, জানুয়ারি ২২, ১৯৭৬।
৭ ভা. ৪/১৩/২১ তাৎপর্য।

শ্লোক ৩

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥

লালয়েৎ– লালন করা উচিত; ***পঞ্চ-বর্ষাণি–*** পাঁচ বছর; ***দশবর্ষাণি–*** দশ বছর; ***তাড়য়েৎ–*** শাসন করা; ***প্রাপ্তে–*** উপনিত হলে; ***তু–*** কিন্তু; ***দশবর্ষাণি–*** ষোল বছর; ***মিত্রবৎ–*** বন্ধুর মতো; ***আচরেৎ–*** আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

প্রথম পাঁচ বছর পুত্রকে স্নেহ দিয়ে লালন করবে। পরবর্তী দশ বছর তাকে কঠোরভাবে শাসন করবে। ষোল বছর বয়সে পৌঁছলে তার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করবে।

তাৎপর্য

শিষ্যদের প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ ওপরের শ্লোকে উল্লিখিত তিন উপায়ে আচরণ করতেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি আলাদা আলাদা ব্যবহার করতেন।

১৯৬৬ সালে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আমরা জানতাম না তিনি কে? আমরা একজন আচার্যের কার্যকলাপ এবং শিষ্যের কী দায়িত্ব, তা জানতাম না। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তা জানতেন, তাই কর্তৃত্বসুলভ মনোভাব বা পিতার ন্যায় কর্তৃত্বকারীর ভূমিকা নিতেন না। কিন্তু ক্রমেই তিনি আমাদের ভালোবাসা ও সম্মানলাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন শ্রীল প্রভুপাদ "পারমার্থিক বিদ্যালয়" সম্বন্ধে প্রবচন দিয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি আগ্রহ অটুট রাখতে আমাদের উৎসাহ দিতেন। বলতেন, ভক্তিযোগে কর্ম না করার মাধ্যমে কেউ তার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বরং ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "ভক্তিযোগ অনুশীলনকারীকে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয় না, অথচ ব্যক্তিচেতনাকে পরম চেতনার সাথে যুক্ত করার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা যায়।"[১]

পূর্বে শিষ্যদের প্রতি প্রভুপাদের ব্যবহার অত্যন্ত কোমল ছিল। গৌরমোহন দে শৈশবে প্রভুপাদের প্রতি অত্যন্ত কোমল ছিলেন। তিনি পুত্রকে বাধা-নিষেধ করতে পছন্দ করতেন না, বরং সর্বদাই পুত্রের চাহিদা পূরণ করতেন। পরমহিতৈষী ও শুদ্ধভক্ত জ্ঞানে প্রভুপাদ তার পিতাকে ভালোবাসতেন।

যদি বিপজ্জনক না হতো তবে মা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পছন্দের

সবকিছু করতে দিতেন। "প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি নির্জনে মাটি খাচ্ছ কেন? দেখ বলরামসহ তোমার বন্ধুরা সবাই অভিযোগ করছে...আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি তুমি মাটি না খেয়ে থাকো, তবে তোমার মুখ খোল, আমি দেখব।"

পরমেশ্বর ভগবানকেও নিজের পিতার কঠোর নিয়মের প্রতি অনুগত হতে দেখা যায়। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে আমরা জানতে পারি, "জগন্নাথ মিশ্রও দুষ্টুমির জন্য তার পুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে নীতিশিক্ষা দান করতেন।" পরবর্তীকালে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একজন ব্রাহ্মণ তাকে জানাচ্ছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে তিরস্কার করে তিনি অপরাধ করেছেন। তখন তিনি বলেন, "এ বালক দেবতা, যোগী বা মহান সাধু যে কেউ হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না, আমি তাকে কেবল আমার পুত্র বলেই মনে করি। একজন পিতার কর্তব্য তার পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া। আমি যদি তাঁকে শিক্ষা না দিই, তবে সে কীভাবে শিখতে পারবে।"[২]

শ্রীল প্রভুপাদ ভালোবাসাহীন নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করেননি। তিনি বেত্রাঘাত করায় বিশ্বাস করতেন না। গুরুকুলের শিক্ষকদের তিনি বলতেন যে, শিশুদের বেত দেখাতে পারবে, কিন্তু কখনোই প্রহার করতে পারবে না।

লোয়ার স্ট্রিট সাইডের এই শিশু-শিক্ষার দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের প্রতি ধীরে ধীরে কঠোর হতে থাকেন। তিনি আমাদের কঠোর সমালোচনা এবং বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করে তিরস্কার করতেন। আমি তার কঠোর তিরস্কারে হৃদয়ে আঘাত পেতাম এবং ভয়ও পেতাম, কিন্তু জানতাম তিনি কোনো স্বার্থপরতার আশ্রয় নিচ্ছেন না। তিনি আমাদের কঠোরভাবে শাসন করতেন; তাই তার অসন্তুষ্ট হওয়াকে আমরা ভয় পেতাম। নিজেরা চাইতাম বলেই তাঁকে অনুসরণ করার সাথে সাথে তার কথা আমরা শুনতাম। সে জন্যই কোনো বাক্য ব্যবহার না করেও তিনি শুধু ভ্রুকুটি বা হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই আমাদের তিরস্কার করতে পারতেন। এমনকি শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবের পর এখনও আমি মাঝে মাঝে প্রভুপাদকে স্বপ্নে দর্শন করি। তাকে আমার প্রতি বিষণ্ন হতে দেখলে নিজেকে সংশোধনের তাগিদ অনুভব করি। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি কেন অসন্তুষ্ট হতেন? আমাদেরই শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা কখনোই তার তিরস্কারের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ করি না।

হরিসৌরি প্রভু তার পারমার্থিক ডায়েরীতে শ্রীল প্রভুপাদের ক্রোধের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন শ্রীল প্রভুপাদ সামান্য রাগান্বিত হতেন, তখন আমাদের অনুভূতিকে আঘাত করার জন্য তিনি তিক্ত মন্তব্য করতেন। যদি তার ক্রোধ আরেকটু বেড়ে যেত, তবে তার নিচের ঠোঁট কাঁপত। আর

যদি কোনো শিষ্য বড় ধরনের ভুল করতেন, তবে তিনি তার সাথে কথা বলতেন না। তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এসব ব্যবহার ভক্তদের নিয়ন্ত্রণের কোনো কৌশল নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ কখনই তার শিষ্যদের অমঙ্গল চাইতেন না। তিনি ক্ষমা করতেন এবং ভুলেও যেতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও কখনও তার শিষ্যদের কঠোর দণ্ড দান করতেন। উদাহরণস্বরূপ, মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং মুকুন্দকেও তার ব্যক্তিগত সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করবেন বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহাপ্রভুকে তাদের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন। মহাপ্রভুর সঙ্গ হারানো ছিল তাই মৃত্যুর চাইতেও বেশি বেদনাদায়ক। শ্রীল প্রভুপাদ কখনই তার কোনো শিষ্যকে পরিত্যাগ করতেন না। তিনি শিষ্যদের তিরস্কার করতেন, ক্রোধ অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, কিন্তু সব সময় চাইতেন ভক্তরা যেন তার কৃপার প্রভাবে পরিশুদ্ধ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ শুধু শিষ্যদেরই নয়, কখনও কখনও অতিথিদের প্রতিও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতেন। একদিন ডা. প্যাটেল শ্রীল প্রভুপাদের সাথে জুহু বিচে হাঁটছিলেন। প্রভুপাদ হাটার সময় ভারতীয় অভিনেতাদের সমালোচনা করছিলেন। তাই ডা. প্যাটেল মন্তব্য করেছিলেন, "আপনি খুব কঠোর"। উত্তরে প্রভুপাদ বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমাকে অবশ্যই অনেক কঠোর হতে হবে।" তখন ডাঃ প্যাটেল আবার বলেন, "আপনি শুধু কঠোরই নন কর্কশও বটে"। শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় উত্তর দেন, "হ্যাঁ, আমাকে এমনই হতে হবে।"[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ কঠোর হলেও পারমার্থিক বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। যাই হোক, শ্রীল প্রভুপাদের সেই কঠোরতা একসময় কোমল পুষ্পে পরিণত হতো। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের ক্রোধ ভুলে যাওয়ার একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

শ্রীল প্রভুপাদ যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন তাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক ভক্তকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে গৃহস্থ ছিল এবং সে গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ করত। শহরে থাকত অথচ প্রভুপাদকে পৌঁছে দেওয়ার সময় সময়মতো আসত না। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ অন্য ভক্তদের কাছে তার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তাকে শুধু বোকা নয়, একগুঁয়ে বোকা বলেও সম্বোধন করছিলেন। প্রভুপাদ বলেছিলেন, "তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছাড়া আর কিছু নও।" অবশেষে প্রভুপাদকে ঠিক সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য আরেকটি গাড়ি ও চালকের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

পরে সেই ভক্ত প্রভুপাদের রাগান্বিত হওয়ার কথা শোনার পর ক্ষমা চেয়ে প্রভুপাদের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল। প্রভুপাদ তার সব দোষের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি যে, সেই ভক্তের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা বা রাগ ছিল না। তিনি সর্বদাই এমন মহৎ ছিলেন। এ ঘটনা নির্দেশ করে যে, শ্রীল প্রভুপাদের ক্রোধ সর্বদা সৎ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত এবং তা সম্পুর্ন নিয়ন্ত্রিত।

প্রভুপাদ একবার মি. কুশীর সাথে কথা বলার সময় চাণক্য পণ্ডিতের এই শ্লোকটি উলেখ করেছিলেন। প্রভুপাদ বলেছিলেন, "পাঁচ থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত পুত্র কিংবা শিষ্যকে বাঘের মতো শাসন করা উচিত।"

মি. কুশী : এ ক্ষেত্রে কি লাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে?

প্রভুপাদ : হ্যাঁ।

তমালকৃষ্ণ : হ্যাঁ, প্রভুপাদ আপনি এভাবেই আমাদের শিখিয়েছিলেন।

মি. কুশী : প্রভুপাদ কি আপনাকেও শাসন করেছিলেন?

তমাল কৃষ্ণ : হ্যাঁ, প্রভুপাদের কাছ থেকে তা-ই পেয়েছিলাম। এমনকি যদিও আমাদের বয়স পাঁচ বছর ছিল না, তিনি এমনভাবে শাসন করতেন যেন আমাদের বয়সও পাঁচ বছর। যেহেতু পারমার্থিকভাবে আমরা তখনও নাবালক, সে কারণেই প্রভুপাদ আমাদের প্রতি কঠোর ছিলেন।

প্রভুপাদ : এসব ছেলেদের আমি কঠোরভাবে শাসন করেছি, এমনকি সামান্যতম ভুলের জন্যও।

মি. কুশী : আপনি?

প্রভুপাদ : "কিন্তু তারা সব সহ্য করত, কারণ তারা আমাকে বুঝত।"[৪]

একবার শ্রীল প্রভুপাদ যখন মায়াপুর মন্দিরের ব্যবস্থাপকদের আচরণ সংশোধনের বিষয়ে কথা বলছিলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন প্রভুপাদের কথায় দুঃখ পেয়ে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন। তখন প্রভুপাদ তাদের বলেছিলেন যে, শাসন করার সময় তার মন খারাপ করা উচিত নয়। গুরুদেব হিসেবে শিষ্যদের দোষ ধরা কর্তব্য, এমনকি যদি শিষ্যদের দোষ নাও থাকে। এ উদাহরণ আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের কঠোর মনোভাব বুঝতে সহায়তা করে।

শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা, অর্থাৎ আমরা প্রভুপাদের কঠোর শাসন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতাম, কেননা আমরা তাকে সন্তুষ্ট করতে চাইতাম। আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলমন্ত্রই হলো গুরুদেবের সেবা করা। ভক্তরা প্রায়ই তিনি অসন্তুষ্ট হলে দুঃখ পেতেন, কিন্তু নিজেদের শোধরানোর গুরুত্বও তারা উপলব্ধি করতে পারতেন।

আমরা অবশ্যই একজন আচার্যের মনোভাব বুঝতে পারি না। তবে আমরা জানতাম যে, প্রভুপাদ ব্যক্তিগত স্বার্থে আমাদের প্রেরণা দিচ্ছেন না। প্রভুপাদ তার বন্ধু বা তার দ্বারা প্রভাবিত লোকদের কারোরই মন জয় করতে চাইতেন না এবং তার মনোভাবে এমনকি ভক্তরাও মনঃক্ষুণ্ন হতেন না। তিনি যদি কাউকে বিষণ্ন বা হতাশাগ্রস্ত দেখতেন, তবে নিজেও ব্যথিত হতেন এবং বলতেন, "তুমি আমার শিষ্য, তুমি কেন এমন করেছ?" প্রভুপাদ ছিলেন পরদুঃখে দুঃখী। শ্রীল প্রভুপাদের দয়াপূর্ণ হৃদয়টি যদি কোনো শিষ্যের অশোভন আচরণে ব্যথিত হতো, তবে তিনি করুণাপূর্বক তাকে তিরস্কার করতেন।

ভক্তরা প্রভুপাদকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই ভালোবাসতেন, কিন্তু তাই বলে আমরা তাকে অনুকরণ করতে পারি না। প্রভুপাদ তার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করার অনুপ্রেরণা দানে অনেক দক্ষ ছিলেন। আমাদের আত্মসমর্পণই প্রভুপাদকে আমাদের ওপর শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করত।

এ শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পনেরো বছরের কম বয়স্ক কিশোরদের কঠোরভাবে শাসন করতে হবে এবং পনেরো বছর পার হওয়ার পর পিতামাতাকে তার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা প্রশ্ন করতে পারেন, "কবে আমরা ষোলো বছর বয়সে পৌঁছতে পারব এবং কবে গুরুদেব আমাদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হবেন?" যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রভুপাদ এই তিন প্রকার আচরণ যুগপৎ বা একইসাথে করতেন। তিনি কখনও আমাদের সাথে এমন আচরণ করতেন যেন আমাদের বয়স পাঁচ, কখনও বা মনে হতো আমাদের বয়স দশ; আবার কখনও একজন বন্ধুর মতো।

তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায়, "একজন শিষ্য কী কখন ষোলো বছর বয়সে পদার্পণ করতে পারেন? গুরুদেবের সাথে হাত মেলাতে কিংবা নিজেকে পরিণত ভাবতে পারেন?"

শিষ্যকে গুরুদেবের সামনে সর্বদা বোকার মতো থাকা উচিত, কিন্তু তাই বলে বোকা হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনায় পরিপক্বতা লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। শিষ্য যতই পরিপক্ব হয়, তার সাথে গুরুদেবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ততই দৃঢ় হয়, যদিও শিষ্য সর্বদাই গুরুদেবের সেবক। তাই গুরুদেবের সাথে বন্ধুত্ব শিষ্যের পরিপক্বতার লক্ষণ হতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ তার এক পত্রে বর্ণনা করেছেন যে, শুরুতে শিষ্যের স্বাধীনভাবে চলা উচিত নয়। প্রতি পদক্ষেপে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শিষ্য যত উন্নতি করে, ততই গুরুদেবের উপদেশ ও নির্দেশ উপলব্ধি করে এবং পুরস্কার হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে।[৫]

শিষ্যদের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। শুরুতে তাদের কৃষ্ণভাবনা চর্চা স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। পর্যায়ক্রমে তারা স্বেচ্ছায় তাদের জ্ঞান ও ভালোবাসা সহকারে এতে মনোনিবেশ করে। এটিই গুরু ও শিষ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রাথমিক অবস্থা।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবের পর, তিনি যে সরাসরি শিষ্যদের শাসন করতে পারবেন না, সে ধারণা থেকে শৈথিল্য জন্ম নেয়। এখন প্রবীণ শিষ্য ও শিষ্যা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করার সময় এসেছে, তবে শুধু বন্ধুত্ব বা কর্তব্যের খাতিরে নয়, বাধ্যবাধকতা বলেও। আমাদের বাধ্যতা হতে হবে আন্তরিক। প্রভুপাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদের বিভিন্নভাবে উদ্দেশ্যহীন করে তুলবে, কিন্তু তার প্রতি আমাদের প্রীতিপূর্ণ আন্তরিক মনোভাবই আমাদের সুচারুভাবে পরিচালনা করবে। এভাবে আমরা দেখব যে, আমরা স্থিরভাবে গুরুদেবকে অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি এবং গুরুদেবের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছি। একদিক থেকে শ্রীল প্রভুপাদই আদর্শ দৃষ্টান্ত। তিনি তার গুরুদেবকে গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে সেবা করতেন এবং সর্বান্তকরণে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদেশ পালনে একনিষ্ঠ থাকতেন।

একবার ভাগবতম প্রবচনে তিনি তার শিষ্যদের সাথে সম্পর্ককে পিতার সাথে পরিপক্ব সন্তানের সম্পর্ক বলে বর্ণনা করেছিলেন, "এটি প্রত্যাশিত নয় যে, প্রবীণ বয়সেও তোমাদের ভর্ৎসনা করতে হবে। এ কাজ খুব কঠিন, কেননা প্রবীণ বয়সের শিষ্যকে বা সন্তানকে ভর্ৎসনা করলে সে ব্যথিত হতেই পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত, কারণ এসব আমাদেরই নিয়ম-কানুন। আমাদের অবশ্যই তা পালন করতে হবে। চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ– *প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে/পুত্রম মিত্রবৎ-আচরেৎ*। "ষোলো বছর বয়স হলে শিষ্য কিংবা পুত্রের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করা উচিত।" তাই ভৎর্সনা সত্ত্বেও আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি, তোমরা চুল বড় করে আবার হিপ্পি হয়ে যেও না। প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার হলেও মস্তক মুণ্ডন করো। আমি তোমাদের ভর্ৎসনা করতে পারি না, তোমরা যুবক আর আমি বৃদ্ধ।"[৬]

কৃষ্ণও তার পিতা নন্দ মহারাজকে এভাবেই বলেছিলেন, "বস্ত্রহরণের জন্য যখন গোপীরা নন্দ মহারাজের কাছে নালিশ করবে বলে কৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন, "তোমরা আমার পিতার কাছে নালিশ করতে পারো, আমি তাতে কিছুই মনে করি না। কেননা আমি জানি, আমার পিতা বৃদ্ধ, তাই তিনি আমাকে কিছুই করতে পারবেন না।"[৭]

আমরা জানি, যখন কোনো ছেলে পরিণত হতে থাকে, তখন তার মধ্যে

স্বাভাবিকভাবেই পিতামাতার প্রতি অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। প্রভুপাদ তার শিষ্যদের শিশু নয়, বরং পরিণত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, তার শিষ্যরা তাদের পিতামাতা ও সমাজের প্রতি যথেষ্ট বিরুদ্ধ, যার জন্য তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে পারবে। সে জন্যই প্রভুপাদ তার শিষ্যদের কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ করেছিলেন যেন তারা তাদের মস্তক মুণ্ডন করে।

আমাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রভুপাদের ইচ্ছা এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আমাদের আগ্রহ, প্রভুপাদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছিল। অথচ জগতের সম্পর্কগুলো নির্ভর করে ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করার ওপর। শিষ্যের আত্মসমর্পণের লক্ষণ প্রকাশ পায় তার দণ্ডবৎ প্রণামের মাধ্যমে। শিষ্য গুরুর কাছে শারীরিকভাবে প্রণতি নিবেদন করে, কিন্তু সেবার মাধ্যমে নিজেকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে সমর্পণ করে, "আপনি এখন আমাকে মারতেও পারেন, বাঁচাতেও পারেন, সব আপনার ইচ্ছা।" যতক্ষণ না আমরা এভাবে গুরুদেবের শরণাপন্ন হচ্ছি, ততক্ষণ কৃষ্ণ আমাদের উদ্ধার করবেন না।

সে জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনি কখনোই তার শিষ্যদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আপস করতেন না। যেভাবেই হোক, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সবসময় তার নিয়ন্ত্রণে রাখতেন যেন আমরা ভক্তিপথে সুরক্ষিত থেকে উন্নতি করতে পারি।

[১] প্রবচন, নিউইয়র্ক, এপ্রিল ১৯, ১৯৬৬।
[২] চৈ: চ: আদিলীলা ১৪/৮৬-৮৯।
[৩] প্রাতঃভ্রমণ, বোম্বে, মার্চ ২৩, ১৯৭৪।
[৪] সাক্ষাৎকার, বোম্বে, এপ্রিল ৫, ১৯৭৭।
[৫] পত্র, জানুয়ারি ২, ১৯৭২।
[৬] প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ২৫, ১৯৭৬।
[৭] লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যায় ২২।

শ্লোক ৪

ন কশ্চিৎ কস্যচিন মিত্রম্ ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ রিপুঃ।
কর্ণেন হি জানাতি মিত্রানি চ রিপুম্ তথাঃ ॥

ন– না; ***কশ্চিৎ***– কেউ; ***কস্যচিন***– কারোর; ***মিত্রম***– বন্ধ, ***রিপু***– শত্র; ***কর্ণেন***– সঠিক কারণের দ্বার; ***হি***– বস্তুত; ***জানাতি***– জানা যায়; ***মিত্রানি***– বন্ধুর মতো; ***চ***– এবং; ***রিপুম্***– শত্রুর মতো।

অনুবাদ

স্বভাবত কেউই আমাদের বন্ধু বা শত্রু নয়। একমাত্র কাজের দ্বারাই মানুষ আমাদের বন্ধু বা শত্রু বলে পরিগণিত হয়।

তাৎপর্য

নীতিশাস্ত্রের এ শোকটি এটিই নির্দেশ করে যে, কাউকে সত্যিকারভাবে বন্ধু ও শত্রুরূপে দেখার জন্য কারও পূর্বাপর সংগতিপূর্ণ আচরণ সম্বন্ধে জানা একান্ত প্রয়োজন। যাকে আমরা বন্ধু বলে ধরে নিয়েছিলাম, বৈরী পরিস্থিতির কারণে সে তো শত্রুও হয়ে যেতে পারে। এমনকি শত্রুও অনেক সময় বন্ধু হয়ে যায়। যেমন সীতা উদ্ধারের সময় বিভীষণ রামের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

এ শ্লোকটির অন্তর্নিহিত অর্থ অতিসূক্ষ্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ কেউ কারও বন্ধু বা শত্রু হতে পারে না। যারা নিজের ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণ না করেই কারও সাথে তাদের বন্ধুত্ব বা শত্রুতা দাবি করে, এ শ্লোকটি তাদের মুখোশ উন্মোচন করছে।

বৈদিকশাস্ত্রে এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে সৈনিকেরা দিনের বেলায় একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছে, অথচ রাতের বেলায় পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে। আবার একজন সৎ ব্যক্তি যদি তার সন্তান বা বন্ধুকে কোনো কারণে তিরস্কার করেন, তবে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে, অসুর বা ভক্তদের পার্থক্য নিরুপণ করা যায় তাদের আচরণ দেখেই, শারীরিক গঠন, জন্ম কিংবা অন্য কোনো গুণাবলি বিচার করে নয়। উদাহরণস্বরূপ, ভক্তরা কখনোই নিজেকে প্রভু বা কর্তা বলে মনে করেন না, বরং কৃষ্ণকেই সর্বময়কর্তা বলে মনে করেন। ভক্তরা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করেন, কিন্তু অসুরেরা সর্বদা ভগবানকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের মন বন্ধু বা শত্রু উভয়ই হতে পারে। এটি এর আচরণের ওপর নির্ভর করে। বন্ধুমন আমাদের মঙ্গল কামনা করে এবং শত্রুমন আমাদের মঙ্গলের বিপরীতে কাজ করে।

আমার মন যখন আমার বন্ধু, তখন আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, আমি চিন্ময় আত্মা এবং কোনো না কোনোভাবে আমি জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি বলে আমি জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। এ ক্ষেত্রে আমি আমার বন্ধু। কিন্তু আমরা যদি অপূর্ব এ সুযোগ পেয়েও এর সদ্ব্যবহার না করি, তবে আমিই আমার পরম শত্রু। "যিনি তার মনকে জয় করতে পেরেছেন মনই তার সর্বোত্তম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন মনই তার সবচেয়ে বড় শত্রু।" [১]

ইন্দ্রিয় হিসেবে মন সর্বদাই নিরপেক্ষ; সে প্রকৃতপক্ষে আমাদের শত্রু নয়। তা একটি যন্ত্রের ন্যায়, অবশ্যই তাকে যথাযথভাবে পরিচালনা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। বৈষ্ণবগণ সর্বদাই তাদের মনের নিকট প্রার্থনা করেন যেন সে ইন্দ্রিয় উপভোগের আসক্তি ত্যাগ করে, যা কৃষ্ণভাবনার প্রতি আসক্ত আত্মার শত্রু। তাই মনকে বন্ধু হিসেবে রাখার জন্য আমাদের কল্যাণার্থেই একে সর্বদা ভগবৎসেবায় নিয়োজিত রাখতে হবে। বন্ধুত্ব মানে এই নয় যে, মন আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে সহায়তা করবে। মন যখন আমাদের অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়, তখন মনই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, এই পৃথিবীতে আমাদের বন্ধু বা শত্রু বলে কিছুই নেই :

"হে পিতৃদেব, দয়া করে আপনি আপনার আসুরিক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। আপনার হৃদয়ে শত্রু এবং মিত্রের ভেদ না করে সকলের প্রতি সমভাব পোষণ করুন। অসংযত এবং বিপথগামী মন ব্যতীত এই জগতে অন্য কোনো শত্রু নেই। সর্বভূতে সমদর্শনের ফলেই পূর্ণরূপে ভগবানের আরাধনার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।"[২]

এটিই মহাভাগবতের দর্শন। মহাভাগবত সকলকে ভগবানের দাসরূপে দেখেন। যাই হোক, জগতে সকলের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। তাই কাউকে বন্ধু বা শত্রু ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "যে মনে করে তার অনেক শত্রু সে প্রকৃতপক্ষে মূর্খ অথচ একজন কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত মনে করেন, অনিয়ন্ত্রিত মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ছাড়া তার আর কোনো শত্রু নেই।"

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য– আমাদের শত্রু এবং এসব আমাদের মধ্যেই বাস করে। এ শত্রুগুলো ভগবানের দাসরূপে দেখতে আমাদের বাধা প্রদান করে। মনই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমরা

ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনকে জয় করার মাধ্যমে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি।

যদিও প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই বলেছেন যে, মহাভাগবতের বন্ধু বা শত্রু নেই; কিন্তু যারা মহাভাগবত নয়, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি প্রচারকারীর বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। মধ্যম অধিকারী ভক্তকে ভক্তসঙ্গে ভগবৎসেবা, কৃপা বিতরণ এবং শত্রুদের এড়িয়ে চলতে বলা হয়। মনুসংহিতায় ছয় ধরনের শত্রুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের হত্যা করা যেতে পারে, যথা : যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, যে বিষ প্রয়োগ করে, যে ঘরে আগুন দেয়, যে স্ত্রী হরণ করে, যে ধন লুণ্ঠন করে এবং যে অন্যের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে।

আমাদের আন্দোলনেরও শত্রু রয়েছে। অনেক দার্শনিক আমাদের আন্দোলনকে ভাবাবেগপূর্ণ কর্মকাণ্ড বলে অসম্মান করে। বিরুদ্ধ সংস্কৃতির লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে মগজধোলাই বা জোরজবরদস্তির অভিযোগ করতে পারে। এমন আরও অনেকেই আছে। ভক্তরা একে শাস্ত্রীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেন। ভক্তরা শত্রুকে কর্মের প্রতিনিধি মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত শত্রু বলে মনে করেন না। সর্বোপরি, তারাও স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্য দাস। এটিই মহাভাগবতের দর্শন। ভক্তরা এ দর্শন অন্তরে যত্নের সাথে ধারণ করেন; কিন্তু বাহ্যে প্রচারের স্বার্থে সব ধরনের আক্রমণ থেকে কৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য তাদের শত্রু-মিত্র বিবেচনা করতে হয়। ভক্তরা হলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি বীরযোদ্ধার ন্যায়। দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলে, "কৃষ্ণ বলে আসলে কোনো ব্যক্তি নেই। কৃষ্ণ উপজাতীয় নেতাদের সৃষ্টি পৌরাণিক নায়ক।" ভক্তরা এসব কথা পূর্বেই শুনেছেন। ক্ষত্রিয়ের মতো আমরা প্রতিবাদ করে থাকি : "ব্যক্তিগত কোনো কিছুই নয় মহাশয়, আসল কথা হলো আপনার বুদ্ধি মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।" প্রফেসর বাবু আমাদের ভাবপ্রবণতার অভিযোগ তুলতে পারেন। ভক্তরা তাকে হয়তো দুষ্ট বলেও আখ্যায়িত করতে পারেন। বিতর্ক আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে; কিন্তু ভক্ত কৃষ্ণকে রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাই হোক, অবশেষে ভক্ত তার অন্তদর্শন অনুযায়ীই বিচার করেন যে, সেই পণ্ডিতও অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন এক চিন্ময় আত্মা।

সুতরাং এমন বিতর্কের উত্তেজনা থেকে দূরে থাকাটা ভক্তদের জন্য স্ববিরোধী কোনো বিষয় নয়। তবু প্রচারে গেলে ভক্তদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আন্দোলনের শত্রু ও মিত্রের পার্থক্য করতে হবে। আমেরিকায় অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ একবার বলেছিলেন, "আমারও শত্রু আছে।

আমার শত্রু হলো কৃষ্ণভাবনায় যোগদানকারী ভক্তদের পিতামাতাগণ, যারা আমাকে পছন্দ করেন না।” ভারতে প্রভুপাদের শত্রু ছিল সরকার, কিছু স্মার্ত ব্রাহ্মণ এবং তার কিছু গুরুভ্রাতাও। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শের বিরোধীদের শূকর ও কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন।

এ শ্লোকের ভিত্তিতে শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের প্রধান মাপকাঠি হলো আচরণ। তাই বলে এই নয় যে, যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা আমাদের শত্রু। ভক্তরা এই বিষয়টি বুঝতে না পেরে অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোর ভাষায় বল্লভাচার্যের বিরোধিতা করেছিলেন এবং শ্রীধর স্বামীকে সমালোচনা করার জন্য তাকে ব্যভিচারী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এর সবই ঘটেছিল ভক্ত এবং পণ্ডিতদের মধ্যে। কিন্তু মহাপ্রভুর সমালোচনা সত্ত্বেও বলভাচার্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করতেন এবং মহাপ্রভুও নিমন্ত্রণ স্বীকার করতেন। কেউ কারও প্রতি কোনো অপরাধ নিতেন না।

অপরাধশূন্য বিতর্কের জন্য আমাদের বুদ্ধি ও বৈরাগ্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষ সাধারণত এতই হীনমানসিকতার যে, কেউ বিরোধিতা করলে তাকে শত্রু বলে গণ্য করে পরাজিত করতে চায়। মতের ভিন্নতা সবসময় হবেই। এদের মধ্যে অনেক মত নিয়ে আবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিতর্ক চলে। তবু অপরাধ প্রদান বা গ্রহণ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। এ শ্লোক অনুসারে যদিও দুজন ব্যক্তিকে পরস্পরের শত্রু বলে মনে হয়, কিন্তু তারা পরস্পরের শত্রুর মতো আচরণ করে না। তাই তাদের শত্রু বলে মনে করা যাবে না। পক্ষান্তরে, দুজন ব্যক্তিকে বন্ধুর মতো দেখালেও যদি তাদের কোনো আচরণ উভয়ের জন্য মঙ্গলকর না হয়, তবে তারা একে অপরের শত্রুই বটে। বন্ধুরা কেউ কাউকে প্রতারণা করে না। বিশেষ করে ভক্তদের উচিত পরস্পরকে সহায়তা করা এবং জগজ্জীবনের চরম লক্ষ্যকে উপলব্ধি করা। তবেই তারা প্রত্যেকের বন্ধু হতে পারবে।

[১] যোগসিদ্ধি, শ্লোক নং ২।
[২] ভাঃ ৭/৮/৯।

শ্লোক ৫

ধনানী জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেত
সৎ নিমিত্তাম বরং ত্যাগ বিনাশে নিয়তে সতি ॥

ধণানী– ধনী; ***জীবিতম–*** অস্তিত্ব; ***চ–*** এবং; ***এব–*** নিশ্চিতভাবে; ***পরার্থে–*** পরম উদ্দেশে; ***প্রজ্ঞান–*** একজন জ্ঞানী ব্যক্তি; ***উৎশ্রেয়ত–*** পরিত্যাগ করা উচিত; ***সৎ–*** নিত্য; ***নিমিত্তাম–*** জন্য; ***বরম–*** উৎকৃষ্ট; ***ত্যাগঃ–*** ত্যাগ করা; ***বিনাশে–*** ধ্বংস; ***নিহ্যতে–*** নিযুক্ত হয়; ***সতি–*** তাই।

অনুবাদ

কারও অধিকারে যা আছে তার সবই বরং সৎ উদ্দেশে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশে ব্যয় করা উচিত, কারণ মৃত্যুকালে কেউ তার সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।

তাৎপর্য

এ শ্লোকে গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। এর যুক্তিগুলোও অখণ্ডনীয়। আমাদের সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই সর্বোত্তম উদ্দেশ্যেই আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত। যদি এ যুক্তি উপলব্ধি করার স্তরে কেউ উপনীত হতে না পারে, তবে সে একটি পশুর চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে না। পশুরা জানে না, কীভাবে জীবনকে উচ্চতর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হয়। তারা কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণে রত থাকে। কিন্তু মানুষ ইন্দ্রিয় তর্পণের ঊর্ধ্বের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম।

১৯৬৬ সালে প্রভুপাদ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে চাণক্যের এ শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন, "কেউ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করছে, কেউ সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করছে, আবার কেউ চুরি বা হত্যার মতো বিভিন্ন জঘন্য কাজে নিয়োজিত হয়ে জীবন উৎসর্গ করছে। সকলকেই অন্তিমে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু যিনি আত্মোপলব্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করছেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। সর্বোত্তম কারণে জীবন উৎসর্গ করা শুধু সাহসিকতারই পরিচয় নয়, জড়বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়ও বটে।"[১]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *যো বা এতদ একাক্ষর গার্গী*....। "যে ব্যক্তি জড়-জাগতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে না, সে সবচেয়ে বেশি দুঃখী এবং যে আত্মোপলব্ধি না করে নিশ্চুপ থাকে, সে কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করে।"[২] এ ধরনের মানুষকে কৃপণ বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজেকে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়োজিত করেন, তাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ।

যখন বলি মহারাজ ব্রাহ্মণ বেশধারী বালককে দান করতে চেয়েছিলেন, তখন তার কুলগুরু শুক্রাচার্য তাকে বাধা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "এ বালক স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, সে তোমার শিক্ষা, সৌন্দর্য, সম্পদ, সম্মান সবকিছু নিয়ে শত্রু ইন্দ্রকে দিয়ে দেবে।"[৩] কিন্তু বলি এর বিরোধিতা করে বলেন, "আমি দান করতে চাই।" তখন তিনি ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়েছিলেন, যেখানে অন্য অনেকেই দান হিসেবে তাদের সর্বস্ব প্রদান করেছেন। "দধিচী, শিবি প্রভৃতি মহান ব্যক্তিগণ সাধারণ মানুষের জন্য তাঁদের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। শাস্ত্রই এর প্রমাণ। "তাই কেন আমি এই সামান্য ভূমি প্রদান করব না? এখানে চিন্তা বা বিবেচনা করার কী আছে?"[৪]

বৃত্রাসুরের কাহিনীও আমাদের এই বিষয়টিই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি বৃত্রাসুরকে পরাজিত করতে পারেন, তবে স্বর্গরাজ্য ফিরে পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, বৃত্রাসুর বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং তিনি দেবতাদের দ্বারা নিহত হতে প্রস্তুত ছিলেন। বৃত্রাসুর তার নিজের জীবনকে সর্বোত্তম কাজে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হন না। "ভক্তের বেঁচে থাকা বা মৃত্যুবরণ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা বেঁচে থাকলেও তিনি কৃষ্ণসেবায় যুক্ত থাকেন, মৃত্যুর পরও ভগবদ্ধামে গিয়ে একই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। তার ভগবৎসেবা কখন ব্যাহত হয় না।"[৫]

এ শ্লোক আমাদের যথার্থ যুক্তবৈরাগ্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করে। যুক্তবৈরাগ্যের অর্থ কোনো কিছু পরিত্যাগ না করেই এর প্রতি বিরাগ হওয়া এবং একে কৃষ্ণসেবায় ব্যবহার করা। যদি জীবনকে আমাদের ত্যাগ করতেই হবে বলে বিবেচনা করতে হয়, তবে যেন ভগবৎসেবার আগুনেই আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, চারটি বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে; যথা- প্রাণ, অর্থ, ধ্যান এবং বাক্য। এ শ্লোক শিক্ষা দেয় যে, সর্বোত্তম কাজেই আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করা উচিত। আমরা যদি জীবন উৎসর্গ করতে না পারি, তবে আমাদের অর্থ উৎসর্গ করা উচিত। যদি আমরা প্রাণ বা জীবনও উৎসর্গ করতে না পারি, তবে আমাদের বুদ্ধি উৎসর্গ করতে পারি। আর যদি তাও না পারি, তবে অন্তত আমাদের কৃষ্ণকথা বলা উচিত। জীবনকে আমাদের কোনো না কোনোভাবে কৃষ্ণভাবনার কাজে উৎসর্গ করতেই হবে এবং যেহেতু সারা জীবনের কৃতকর্মের ফল হলো মৃত্যু। কাউকে কৃষ্ণভাবনার আন্দোলনের জন্য শহীদ হতে বলা হয়নি। সত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে বরং বেঁচে থাকাই ভালো।

যুক্তবৈরাগ্য অনুসরণ করলে আমরা প্রতারক হবো না। ভক্তরা সাধারণত 'বৈরাগ্য' শব্দটির প্রতি অত্যধিক আসক্ত থাকে এবং প্রচার করে যে, জড়-

জাগতিক সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করা উচিত। তারা মনে করে জড় বিষয়সমূহ ত্যাগ করলেই পরম কারণের জন্য ত্যাগ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ (এবং রূপ গোস্বামীপাদ) যুক্তবৈরাগ্যের মাধ্যমে জড় বিষয়সমূহকে কৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করার কথা বলেছেন। ভক্তদের অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। ভক্তরা কি প্রকৃতপক্ষেই তাদের জীবন, সম্পদ, বুদ্ধি বা বাক্য কৃষ্ণসেবায় ব্যবহার করছেন? এমন নয় যে সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা ভগবানকে শুধু পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি অপর্ণ করব। উৎসর্গ অবশ্যই সৎ হতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে সেবা-সাধনাকে সৈনিকদের কার্যক্রমের সাথে তুলনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের মৃত্যুবরণের কথা বলতেন। বলতেন, "যদি যুদ্ধ করতে হয়, তবে আমাদের যুদ্ধও করতে হবে।" বোম্বেতে যেমন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম; কিন্তু ফলের জন্য কৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। যেখানে জমিটি পাওয়ার কোনো আশাই আমাদের ছিল না, কিন্তু আমরা জমিটি পেয়েছিলাম। তাই নিয়মিত যুদ্ধ চলত। পুরো বোম্বে নগরী বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছিলাম, কারণ আমরা কৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। আমরা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, "হে কৃষ্ণ, তুমি এখানে অবস্থান করছ। যদি তোমাকে এখান থেকে সরানো হয়, তবে এত বড় অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু ফলের জন্য অবশ্যই কৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।"[৬]

আমরা যদিও শ্রীল প্রভুপাদের এই বিশাল সাফল্যের অনুকরণ করতে পারি না, কিন্তু পরম কারণের জন্য জীবন উৎসর্গ করার সাধনে আমরা সকলেই তো প্রচারক। তবে উৎসর্গ করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে। প্রায়ই ভক্তরা অংশগ্রহণ করার পর রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রচার করতে গিয়ে কলহে লিপ্ত হয়। তারা তাদের জড়-জাগতিক স্বার্থ ত্যাগ করে, কিন্তু সাথে সাথে পারমার্থিক স্বার্থও জলাঞ্জলি দেয়। পারমার্থিক জীবনের নামে তারা তাদের সাধনা ত্যাগ করে। ভক্তিযোগের এ স্তরে তাদের মনোভাব মোটেই পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত ও পরিণত হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তার শিষ্যদের কাছেও তেমনটিই চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একজন যথার্থ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। তিনি কখনই রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো কাজ করতেন না। সময় ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কঠোরভাবে কথা বলতেন, কিন্তু আদর্শ ভদ্রলোক ছিলেন। বাহ্যিক কোনো ঘটনার দ্বারাই তিনি কখনো পরাভূত হতেন না এবং কখনোই উন্মত্ত হতেন না। সাধারণত যেসব গুণ কেবল বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে, সেসব

গুণই তাকে সংকট সমাধানের আবেগপূর্ণ পরিস্থিতির উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত রাখত। তার ব্রাহ্মণগুণসমূহ এবং সাধক জীবনে প্রচারের লক্ষ্য ত্যাগ করার কথা তিনি কখনই ভাবতেন না। এ কথাও কখনও বলতেন না যে, কোনো কারণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ সবসময় চাইতেন যেন, আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যবহার করি। তা কেবল মৃত্যুবরণ করে নয়, বরং বেঁচে থেকে কৃষ্ণের জন্য আমাদের যা কিছু আছে, তা তাঁর সেবায় উৎসর্গ করে।

অনেক ভক্তই ইতোমধ্যে তাদের একটি জিনিস প্রদান করেছেন, তা হলো তাদের যৌবন। ইতোমধ্যেই এ মহৎ উৎসর্গ তারা করেছেন এবং যারা তাদের জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টি দান করেছে, ইস্‌কনে এসে তাদের অভিজ্ঞতা যা-ই হোক না কেন তারা কিছুই হারায়নি।

মাঝে মাঝে ভক্তরা অনুতপ্ত হয়, কারণ এই যে, এত বছর ধরে তারা ইস্‌কনে থেকেছে শুধু এমন অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে, তাদের সব ধরনের জড়-জাগতিক প্রয়োজন ও বাসনাসমূহ একদিন পূরণ হবে। ইস্‌কন অবশেষে তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ভক্তরা শুধু তাদের জাগতিক নিরাপত্তাই হারায়নি, তাদের যৌবনকেও হারিয়েছে, যে সময় তারা তাদের পেশাগত জীবন গড়ে পরিবারের জন্য অনেক পরিকল্পনা করতে পারত। ভক্তরা তাই এক কঠিন বাস্তবতার শিকার হয়, যেখানে জগতের প্রতিষ্ঠিত যুবকদের সাথে তারা কখনোই প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। চাকরি শুরু করে অর্থ উপার্জন করা চল্লিশ বছর বয়সে অধিক কঠিন, তবে কেন পঁচিশ বছর বয়সে তা করা হয়নি। এ কারণেই পুরোপুরি ইস্‌কনের আশ্রয়ে এসে ভক্তরা অনেকেই শোকগ্রস্ত হয় এবং এখন পূর্ণরূপে যুক্ত না থেকে তা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। তবু ভক্তদের এ সংঘ ত্যাগ করা উচিত নয়। জীবনের এসব পরিবর্তন এলেও তাদের আদর্শ ত্যাগ করা উচিত নয়, অথবা এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, তারা এমন মূল্যবান কিছু হারিয়েছে যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। বিষয়টি এমন হতে পারে যে, এখানে তাদের অংশগ্রহণের কারণ ছিল আরও অন্তর্নিহিত, কিন্তু এখন তারা ইস্‌কনের কাজে তাদের পুরো সময় ও সামর্থ্য নিয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছে না। সত্য তো এটাই যে, তারা মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, তাই যেকোনোভাবেই হোক জীবনকে উৎসর্গ করতেই হবে। সুতরাং সর্বোত্তম কারণের জন্যই জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যৌবনেই মাত্র ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারা ভারতবর্ষে প্রচারের জন্য ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তার ভক্তদের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন, যাতে তারা সকলের কল্যাণের জন্য তাদের মাঝে কৃষ্ণভাবনা বিতরণ করতে পারেন। একই মনোভাব নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদও নিষ্ঠাবান ও

উন্নত চেতনাসম্পন্ন প্রচারকদের কাছে তার আহ্বান পাঠিয়েছেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও আমাদের উৎসাহ হারানো উচিত নয়।

ভগবৎবিহীন সভ্যতার কারণে সারা বিশ্বই আজ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অনেক উন্নত ও উচ্চশিক্ষিত ভক্তের প্রয়োজন, যারা সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনার জাগরণ ঘটানোর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবেন। এ জন্যই সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষকে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে মানবসমাজে ভগবৎচেতনার জাগরণ ঘটানোর জন্য জীবন উৎসর্গের আহ্বান জানাই।[৭]

এ শ্লোকে উল্লিখিত সেনাবাহিনীর চেতনা শক্তিশালী হলেও এর জন্য নির্দেশনা, নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। ক্ষত্রিয় এবং মঠের সন্ন্যাসী উভয়ই কঠিন নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে, যদিও তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। ক্ষত্রিয়দের উদ্দেশ্য হলো হত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সেনাবাহিনীর ভূমিকা আদেশ পালন করে এবং নিজেরা মরতে, এবং অন্যদের হত্যা করতে প্রস্তুত থাকে। মঠের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে, তাদের গুরুর আজ্ঞা পালন করতে হয়, অন্যদের হত্যা করা নয়, জড়-জাগতিক বাসনাকে হত্যাপূর্বক আত্মত্যাগের পন্থা অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়টি ভগবদ্গীতার আলোকে আলোচনা করেছেন, যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে সেনাপতির কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৮] গুরু ও কৃষ্ণের প্রতি আমাদের অনুগত থাকতে হবে এবং সেটিই আমাদের উৎসর্গ। আমাদের প্রচার বন্দুক চালনা ও দেশ শাসন নয়, বরং গ্রন্থ ও হরিনাম বিতরণ করা। এর জন্য প্রয়োজন আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গ। গুরু ও কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলে আমাদের সে আজ্ঞা পালন করতে হবে। প্রশিক্ষিত মন যখন গুরু ও কৃষ্ণের নির্দেশ পালন করার আজ্ঞা দেয়, তা আমাদের পালন করতে হবে এবং পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবেই আমাদের বৈধী ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। সকালে ঘড়ির কাঁটার অবস্থান দেখে আমাদের ঘুম থেকে উঠতে হবে। আত্ম-শৃঙ্খলা আত্মোৎসর্গেরই অংশ।

নিয়মানুবর্তিতার কারণ এ শ্লোকেই নির্দেশ করা হয়েছে– আমাদের সকলকেই মরতে হবে। জীবন ক্ষণস্থায়ী। ভক্তের কাছে এ শৃঙ্খলা আরোপিত হয়েছে, কারণ তাকে একই সাথে দেহের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে হবে। যদি আমরা এ সত্যের মুখোমুখি হই– যেকোনো মুহূর্তে দেহের মৃত্যু হতে পারে, তবে আমরা উপলব্ধি করব যে, আমরা যা হারাব তা আসলে আমাদের কর্মের ফল। যদি আমাদের কর্ম

জড়কেন্দ্রিক হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করার জন্য অবশ্যই আমরা এ জগতে ফিরে আসতে বাধ্য। কিন্তু যদি আমাদের কর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন হয়, তবে আমরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাব। এ উপলব্ধি ছাড়া এ শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে আমরা সক্ষম হব না।

যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছেন যে, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো যদিও আমরা সর্বত্র মৃত্যুকে দেখতে পাই, তবু কখনো ভাবি না যে আমরা মারা যাব। জড়-বাসনাকে আমরা আঁকড়ে ধরি এই ভেবে যে, যখনই মৃত্যুর সঙ্কেত পাব, সাথে সাথে বৃন্দাবনে গিয়ে সর্বস্ব পরিত্যাগ করব। কিন্তু তা হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। আসন্ন মৃত্যুর নোটিশ হয়তো আমরা কখনোই পাব না। এজন্যই মরে নয়, বরং বেঁচে থাকতেই আমাদের সবকিছু ত্যাগ করা উচিত। এই চেতনার বশবর্তী হয়ে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মিনিটকে কৃষ্ণভাবনার জন্য উৎসর্গ করা উচিত।

মনের সামনে মৃত্যুকে সাথে নিয়ে বাস করার অর্থ নিরন্তর আসন্ন মৃত্যুর ধ্যান করা নয়। এর অর্থ বাস্তবতার নিরিখে মৃত্যুকে দেখা এবং এমনভাবে জীবনযাপন করা যাতে আমাদের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য সাহসিকতার প্রয়োজন। আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যও সাহসের প্রয়োজন।

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার অর্থ এটাও যে, জীবন নির্বাহের জন্য অপরিহার্য উপাদানগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সরবরাহ করা। এর অর্থ গ্রন্থ বিতরণ ও মন্দির নির্মাণ করা। এর অর্থ কৃষ্ণভাবনার স্পর্শে আমাদের পরশপাথররূপে তৈরি হওয়া। অমৃতের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য জীবনের কিছু পরিবর্তন সাধন করা। মৃত্যু তো কেবল এক নির্দিষ্ট জীবনের সমাপ্তি মাত্র, সাক্ষাৎ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না।

মৃত্যু সত্যি সত্যি আসার পূর্বে সে সম্বন্ধে কিছু আগাম বার্তা আমরা অবশ্যই আশা করব। তাহলে আমাদের মন ও হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হব এবং একান্তভাবে কৃষ্ণের চরণে নিবদ্ধ করে তার ওপর নির্ভরশীল হতে পারব।

১ প্রবচন, নিউইয়র্ক, এপ্রিল ৫, ১৯৬৬।
২ ভগীঃ ২/৭ তাৎপর্য।
৩ ভা. ৮/১৯/৩২।
৪ ভা. ৮/২০/৭।
৫ ভা. ৬/৯/৫৫ তাৎপর্য।
৬ প্রবচন, হাওয়াই, জানুয়ারি ২৩, ১৯৭৪।
৭ ভা. ৬/১০/৬।
৮ ভগী ১৮/৫৯ তাৎপর্য।

শ্লোক ৬

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রং চ শিষ্যং চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ ॥

লালনে– লালনে; ***বহবঃ–*** বহু; ***দোষাঃ–*** দোষ; ***তাড়নে–*** শাসনে; ***গুণাঃ–*** গুণাবলি; ***তস্মাৎ–*** অতএব; ***পুত্রম্–*** পুত্রকে; ***চ–*** এবং; ***শিষ্যম–*** শিষ্যকে; ***চ–*** এবং; ***তাড়য়েৎ–*** শাসন করা; ***ন–*** না; ***তু–*** কিন্তু; ***লালয়েৎ–*** লালন করা উচিত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত স্নেহ করার ফলে সন্তানের অনেক দোষ জন্মায়, কিন্তু কঠোরতায় সুন্দর চরিত্র গড়ে ওঠে। তাই সন্তান ও শিষ্যের প্রতি কোমল নয়, কঠোর হোন।

তাৎপর্য

অভিধান অনুসারে 'কঠোর' শব্দের অর্থ প্রয়োজন ও নীতি মেনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে যথাযথভাবে নিয়ম-কানুন, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ মারাত্মক কঠিন আইন ও নিয়ম-কানুনসমূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে আরোপ ও পালন করা। আমরা যারা প্রভুপাদের ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তারা প্রশ্ন করতে পারি যে, প্রভুপাদ কি এ কঠোর নীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন? নিশ্চয়ই শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শতকরা ৮০ ভাগ কোমল ছিলেন।" পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণভাবনা প্রচারের জন্য প্রভুপাদও শুরুতে কোমল ছিলেন। তবুও তিনি চাণক্যের নীতি অনুমোদন করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তা উল্লেখ করতেন, "রাগ করো না, কিন্তু শিক্ষক বা পিতা হিসেবে তোমাদের ভালো দিকগুলো নয়, ভুল-ত্রুটিসমূহই খুঁজে বের করা আমার কাজ। যদি শুধু কোমল আচরণ করা হয়, তবে অনেক বেশি দোষ-ত্রুটি থেকেই যাবে। কিন্তু যদি তুমি শাসন করো, তবে দেখবে তারা অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েছে।[১]

শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ে এক হত্যাকারী চোরের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, যে অপরাধের জন্য ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। তার সর্বশেষ ইচ্ছানুযায়ী সে তার মায়ের সাথে দেখা করতে চেয়েছিল, তার মা তার কাছে আসামাত্র সে তার মায়ের কান কামড়ে ধরেছিল। তারপর সে বলেছিল, "আমি ছোটবেলায় যখন চুরি করতাম, তখন তুমি আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলে, শাসন করনি। তোমার সেই স্নেহশীলতার কারণেই আমার আজ এ কঠিন পরিণাম হয়েছে।"

ভক্তরা গুরুদেবের কাছ থেকে প্রশংসিত হওয়ার চেয়ে তিরস্কৃত হতেই বেশি পছন্দ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তার গুরুদেবের তিরস্কারের কথা স্মরণ

করতে পছন্দ করতেন, "আমরা এত বেশি উদগ্রীব ছিলাম যে, যখনই তিনি আমাদের তিরস্কার করতেন, আমরা তা আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করতাম।" শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। একদিন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন প্রবচন দিচ্ছিলেন, তখন একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাদের প্রভুপাদকে কিছু বলতে চাইছিলেন, তাই তিনি তখন ডাক্তারের দিকে ঘুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তাঁদের দেখে রেগে গিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আমার মনোযোগ যে ডাক্তারের প্রতি ছিল, গুরুমহারাজ তা লক্ষ করেছিলেন এবং তিনি আমাকে যেকোনোভাবেই হোক শাসন করেছিলেন। প্রথমে তিনি ডাক্তারকে কঠোর বচনের দ্বারা শাসন করেছিলেন– "আপনি কি মাসে ষাট রুপি দান করে আমাদের কিনে ফেলেছেন?" তারপর তিনি আমার দিকে ঘুরে আমাকে বলেছিলেন, "তুমি কি ভাবছ আমি অন্যদের জন্য কথা বলছি? তুমি কি সব শিখে গেছ? তুমি তোমার মনোযোগ ছিন্ন করলে, তবে কেন তুমি আমার জায়গায় এসে আমার বদলে কথা বলছো না।"[২] এ ঘটনা খুব বিরল ছিল না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ নিয়মিতই তার শিষ্যদের শাসন করতেন। "সামান্য অসংগতির জন্যও তিনি শিষ্যদের শাসন করতেন। কিন্তু আমরা তা পছন্দ করতাম।"

ভগবানের অনেক ভক্ত আবার ভগবানের দ্বারা তিরস্কৃত হতে পছন্দ করতেন। অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হওয়াকে পরমানন্দ হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতেন যেন মহাপ্রভু রেগে গিয়ে তাকে শাসন করেন। সনাতন গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর দ্বারা জগদানন্দকে তিরস্কারের কথা জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "প্রভু, আপনি জগদানন্দকে অমৃত প্রদান করেছেন, অথচ আমার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব দেখিয়ে আমাকে নিম ও নিসিন্দার তেতো রস পান করাচ্ছেন।"[৩] তবে মহাপ্রভু যখন অত্যন্ত কঠোর হতেন, তখন তার সঙ্গ থেকে সঙ্গীদের নির্বাসন দিতেন। কিন্তু এমন শাস্তি কেউ চাইতেন না।

একইভাবে আমাদেরও গুরুদেবের করা তিরস্কারকে তার কৃপা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং তার এ মনোযোগ সর্বদাই শিষ্যের কামনা করা উচিত। যদি আমরা দেখি যে, গুরুদেব আমাদের শাসন করছেন না, তবে বুঝতে হবে যে, আমরা তার অনুগত শিষ্য হয়ে তাঁকে আমাদের শাসন করার ক্ষমতা অর্পণ করিনি। আনুগত্যহীন শিষ্যকে শাসনের সময় গুরুকে খেয়াল রাখতে হয় শিষ্য সেটা গ্রহণ করবে কি না, যদি না গ্রহণ করে তবে তাকে কোনো নির্দেশ দেওয়া কখনই উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইস্কনের পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি এর অধিকাংশ অর্থ ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতেন। অনিবার্য কারণেই তিনি এ এলাকার শিষ্যদের দোষত্রুটি দেখতেন এবং তাদের শাসনও করতেন। ব্যবস্থাপকদের একজন শ্রীল প্রভুপাদের সমালোচনায় কষ্ট পেলে প্রভুপাদ চিঠি লিখে তাকে নীতিশিক্ষা প্রদান করেন :

আমি জানি, তুমি নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রম করছো। তিরস্কার করাটা আমার কাজ নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং একজন গুরু হিসেবে তোমার ভুল-ত্রুটি দেখা আমার কর্তব্য। এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর গুরুদেবের কাছে নিজেকে দোষযুক্ত বলে উপস্থাপন করেছিলেন। গুরুদেবের কাছে দোষযুক্ত থাকা ভালো, তাতে সংশোধনের সুযোগ থাকে। কিন্তু কেউ যদি নিজেকে নির্ভুলভাবে, তবে সংশোধনের তো সুযোগই থাকে না। এটা আমার প্রাথমিক কর্তব্য মাত্র। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, নিজের শিষ্য এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য তার ভুল ধরা ভালো।[৪]

প্রভুপাদের শিষ্যরাও অগ্রগতি সাধনের সাথে সাথে তাদের গুরুদেবের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও শিষ্যদের ত্রুটির মাত্রা অনুযায়ী শাসন করতেন। যদি কোনো নতুন ভক্ত এসে শ্রীবিগ্রহের সামনেই প্রভুপাদের চরণের কাছে বসে সাধারণদের সাথে কথা শোনে, তবে প্রভুপাদ তেমন কিছু বলতেন না, কিন্তু প্রবীণ কেউ এমনটি করলে তিনি কঠোরভাবে তাকে শাসন করে বলতেন, "তুমি তো সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছ, অথচ এ তোমার কেমন দৃষ্টান্ত।" প্রবীণ ভক্তদের জন্য শাসন আরও কঠিন হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রবীণ ভক্তরা এ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রবীণ ভক্তদের প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭৪ সালে এক প্রবচনে বলেছিলেন যে, জিবিসিদের অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি যমরাজের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। যমরাজ দ্বাদশ মহাজনের একজন হয়েও তাকে পুনরায় বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।[৫]

এ শ্লোকটির সাথে তৃতীয় শ্লোকের কিছুটা মিল আছে। দশ বছর থেকে কঠোর শাসনের পর যখন ষোলো বছরে পদার্পণ করে, তখন সে বন্ধু বলে পরিগণিত হয়। এর দ্বারা এটাই বোঝায় যে, সন্তান বা শিষ্য তখন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তখন সে উচ্চতর স্বাদ লাভ করে।

উদাহরণস্বরূপ, যেকোনো পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পূর্বে বৃন্দাবনের ভক্তদের চেকে প্রভুপাদের স্বাক্ষর এবং দিল্লিতে প্রভুপাদের একজন বিশ্বস্ত ভক্তের স্বাক্ষর নিতে হতো। অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে প্রভুপাদ অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং তিনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অদক্ষ কোনো ভক্তকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস

করতেন না। তবে এটি সত্য যে, যদি কোনো ভক্ত তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তবে শ্রীল প্রভুপাদ তার ওপর কঠোরতা কমিয়ে দিতেন। তখন তিনি ভক্তদের দায়িত্ব নিতে দিতেন এবং তাদের নিজেদের চেকে স্বাক্ষর করার অনুমতি দিতেন। যাই হোক, কোনো শিশুও হয়তো কঠিন শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো যথেষ্ট বয়স্ক হতে পারে। তার এ শৃঙ্খলা দার্শনিক দিক থেকে যথেষ্ট কার্যকরি নাও হতে পারে। শক্তিশালী শৃঙ্খলা বিধানে পুরোপুরি সক্ষম না হলেও যদি কোনো শিশুও পিতা ও গুরুকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয়, তবে সেও কৃপা লাভ করবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, একমাত্র গুরুদেবই শিষ্যকে শাসন করতে পারেন, যে নির্দ্বিধায় শাসনের কঠোরতাকে গ্রহণ করে। তিনি এমন কাউকে শিক্ষা দিতে পারেন না, যে তার নিয়ন্ত্রণ মোটেই স্বীকার করে না।

আমরা এটি কল্পনা করতে পারি যে, কত কঠিন হবে যখন গুরু তার শিষ্যের নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে কঠোর হন, কিন্তু নিজে শাসন মেনে চলেন না। এটা তাদের অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাবে, যেখানে গুরু ও শিষ্য উভয়েই বদভ্যাসে জড়িয়ে পড়বে। কারণ যদি পারমার্থিকভাবে আমরা অগ্রগতি চাই, তবে বদভ্যাসকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে এবং গুরু ও শিষ্য উভয়কেই কঠোরতা মেনে নিতে হবে। গুরুদেব সেবার প্রতি তার শিষ্যের মনোযোগের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই পারেন, "দরজাটা খুলেছ? বাতিটা কি বন্ধ করেছ?" তখন শিষ্য বলতে পারে, "ওহ্ না তো, আমি ভুলে গেছি।" "এখন বন্ধ করো যাও, আমি তোমাকে হাজারবার বলেছি।" শিষ্যও আনন্দের সাথেই সে নির্দেশ পালন করল। এটাই কৃপা।

এই একটা ঘটনার সম্বন্ধে হয়তো আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা হয়েছে, যখন গুরুদেব আমাদের ভুল ধরিয়ে দেন, তা কতটা খুশি করে আমাদের। তা যে আমাদের সংশোধন করে– তা শুনতে কার না ভালো লাগে? ভালোবাসা ছাড়া শাসন চলতে পারে না। ভালোবাসা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই উত্তম শিষ্য ও উত্তম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ডালাসের গুরুকুল পরিদর্শনে গিয়ে কীভাবে কোমলতা ও কঠোরতার সাথে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা নিয়ে শিক্ষকদের বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছিলেন :

প্রশ্ন : আমাদের কি কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত?

শ্রীল প্রভুপাদ : তা হতে হবে ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে। কঠোরতা খুব ভালো ব্যবস্থা নয়। তারা যেন ভালোবেসে নিজে থেকেই

পালন করে। উপর দিয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা খুব ভালো ধারণা নয়। ভালোবাসাই এর মূলনীতি হওয়া উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের জন্য বিধিনিষেধ প্রয়োজন এবং শিক্ষকের উচিত নিজেরা পালন করে কঠোরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। "যদি তুমি অনুশীলন না করো, অথচ তাদের তা করতে বাধ্য করো, তা মোটেই ভালো উপায় নয়। কিন্তু যদি তুমি আবার অতিরিক্ত স্নেহশীল হও, তবে তাদের মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি থেকে যাবে। তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখাই উত্তম পন্থা। অতি কোমলতা প্রদর্শন করো না। তবে ভালোবাসা না থাকলে শিষ্যরা নরক যন্ত্রণাতুল্য যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হবে। সেটা বোকামিই বটে।"[৬]

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ভালোবাসার শাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমি জানি না, কীভাবে তিনি তা করতে পারতেন, তিনি প্রত্যেককে আকৃষ্ট করতেন আর প্রত্যেকেই তাকে ভালোবেসে ফেলত। তখন তিনি কঠোরভাবে তাদের অনুশাসন করতেন। একই সাথে এটিও খুব পরিষ্কার যে, তিনিও তাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং অনুশাসন আরোপ করা হতো, তাদেরই ভালোর জন্য।

আমার মনে আছে, ১৯৬৯ সালে বোস্টনে যখন আমরা আমাদের ভাড়া বাসার বাইরে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে হাঁটছিলাম, তখন তিনি হলে পড়ে থাকা একটি পত্রিকার শিরোনাম পড়ার জন্য থেমে গেলেন। তা ছিল "নিক্সন ছাত্রদের সাবধান করে দিয়েছেন..." সে সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ করছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে, নিক্সনের সতর্কবাণী কাজে আসবে না। বললেন, তাদের ভালো না বেসে তুমি তাদের বাধ্য করতে পারো না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বললেন, "ঠিক যেমন আমি যখন তোমাদের কিছু করতে বলছি, তোমরা সাথে সাথেই তা করছ। কারণ এখানে ভালোবাসা আছে।" এবং তাঁর কথা একদম ঠিক ছিল। এমনকি নিক্সন স্বয়ং যখন জাতীয় রক্ষীকে আহ্বান করেছিলেন, ছাত্ররা তা মানতে রাজি হয়নি।

প্রভুপাদের শিষ্যরা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন, কারণ তারা তাঁকে ভালোবেসেছিল। তিনি কৃষ্ণের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করতেন। তিনি আমাদের নিত্য, জ্ঞান ও পরমানন্দময় জীবনের সন্ধান দিতেন। তিনি আমাদের সুস্বাদু প্রসাদ খাওয়াতেন। তার মন্দিরে আমাদের থাকতে দিতেন এবং মন্দিরের কিছু দায়িত্বও দিতেন। জপ-কীর্তনে নিযুক্ত করতেন। তাই তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর কঠোরতা আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতাম যেহেতু যে ব্যক্তিকে আমরা ভালোবাসি আমরা তাঁর সাথেই আমাদের ভালোবাসার জীবন নির্বাহ করতে চাই।

আমাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, তিনি একজন শুদ্ধভক্ত যিনি কৃষ্ণকে আমাদের দিতে পারেন। এ বিশ্বাসের পেছনে অনুসরণ ছাড়াও কিছু

ভাবপ্রবণতাও আমাদের ছিল। যদিও প্রভুপাদ যে আমাদের মতো এতোগুলো যুবকের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারতেন, একদিক থেকে তা এক রহস্য, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে আমাদের দায়িত্ববোধের জন্যই। তাঁর প্রতি দায় পূরণের মাধ্যমেই আমরা উপলব্ধি করেছি যে, সেই অনুশাসন আমাদের নিজেদের জন্যই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তার কঠোরতা পছন্দ করতাম। জানতাম অন্যরাও তা করত। গর্ব নয় বরং ধর্মীয় মনোভাবের জন্যই আমরা নিজেদের নিরাপদ ও যথার্থ মনে করতাম। প্রভুপাদের অনুশাসনই বাইরের প্রভাব এড়ানোর জন্য আমাদের শক্তি প্রদান করত এবং আমরা ষোলো মালা জপ করতাম, ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম এবং জড়-জাগতিক কথা না বলে শুধু কৃষ্ণকথা বলতাম। সেই অনুশাসনের মধ্যে থেকে আমরা নিজেরাও নিজেদের ওপর অনুশাসন আরোপ করতে শিখেছি। গুরু হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দর এক সম্পর্ক তৈরি করেছেন, যা অন্য সব সম্পর্কের মতোই বাস্তব, পারিবারকেন্দ্রিক ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিল। এই একটি মাত্র সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের সবকিছু– বন্ধু, বান্ধবী, সঙ্গী-সাথী এবং পরিবারকে ত্যাগ করেছি।

পত্রের মাধ্যমেই প্রভুপাদ বেশি পরিমাণ অনুশাসনের প্রয়োগ করতেন। তিনি তার শিষ্যদের যখন-তখন ডানে-বায়ে সরিয়ে সঠিক পথে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতেন। উপলব্ধি ও সেবা নির্ধারণ এবং চলমান সম্পর্কের সত্যতা অনুভব করতে তাঁর পত্রসমূহই তাঁর শিষ্যদের সহায়তা করত।

শ্রীল প্রভুপাদ অনুশাসন মেনে চলতে পারতেন কারণ তিনি নিজের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলোর প্রতি কঠোর ছিলেন না যেখানে ইন্দ্রিয়গুলো স্বাদ আস্বাদন করার পরও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। তার কঠোরতা ছিল কৃষ্ণভাবনায় স্বাভাবিক শুদ্ধতা। তিনি জড়-জগৎরূপ হ্রদের ঊর্ধ্বে উত্থিত প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায়। তিনি কঠোরতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন, কারণ তিনি এমন কোনোকিছুই কখনো স্পর্শ করতেন না যা কঠোর ও পরিশুদ্ধভাবে কৃষ্ণভাবনাময় নয়।

প্রভুপাদের শিষ্যরা তার এ শুদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত। অনেকেই জড়বাসনা নিয়ে এসে প্রভুপাদের সাথে মিলানোর চেষ্টা করত, কিন্তু তার মুখোমুখি হলে তারা তাদের হীনতা অনুভব করে উপলব্ধি করত যে, তাদের সেই বাসনা তাদের ত্যাগ করা উচিত। তার অনুশাসন ও দৃষ্টান্ত আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ আদর্শের আকাঙ্ক্ষা করার জন্য প্রেরণা দান করত।

অভিধানিক অর্থের দিকে তাকালে কঠোরতার আরেকটি অর্থ হয়, যথা : 'যথার্থ বা নির্ভুল'; সত্য সম্পর্কে কঠিন কথা। পরম, সঠিক বা সম্পূর্ণ। এর সবই শ্রীল

প্রভুপাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি কঠোর বা মারাত্মক ছিলেন না, কিন্তু কঠিন কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন। তার শিষ্যরা তার স্বাভাবিক শুদ্ধতা অনুভব করতে পারলেই অন্যকিছু না করতে পারলেও কঠিন কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদাহরণ দিয়ে বলতেন যে, তারা নিয়ম-নীতির প্রতি অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু বৈষ্ণব সে তুলনায় অধিক নমনীয়। বৈষ্ণব ভক্তি অনুশীলন করেন। ভক্তি এত ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তা নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করলে সবচেয়ে অধঃপতিতও পবিত্র হতে পারে। বিধি পালনে বৈষ্ণবের নমনীয়তা স্বেচ্ছাচারিতা নয়, বরং তা ভগবৎসেবা সাধনে সুবিধার উপর ভিত্তি করে হয়। সাধারণত একজন্য অধিক উন্নত ভক্ত নবীনদের তুলনায় অধিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবৎসেবা সাধন করতে পারেন। তবুও নবীনদের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্যই উন্নত ভক্তগণ নিয়ম-কানুনসমূহ পালন করেন এবং কঠোর আচরণ করেন।

যারা তাকে অনুসরণ করে না, তাদের ওপর তো তিনি কঠোর হতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, আমাদের ভদ্র হতে হবে, কিন্তু কেউ যদি জল দেখিয়ে আমাদের দুধের কথা বলে, তবে আমরা তো তাদের কথা মেনে নিতে পারি না। শিষ্য নয় এমন অনেক অতিথি যখন শ্রীল প্রভুপাদের সাথে কথা বলতে আসত, তাদের তো তিনি মাথা নেড়া করার কথা বা ঘরে প্রবেশের আগে জুতা খোলার কথা বলতে পারতেন না। তারা যা করে না, তিনি তাদের তা-ও করতে বলতেন না। কিন্তু এদের যে কেউ যদি বলত যে কৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ, তবে প্রভুপাদ তা কখনই সহ্য করতেন না। এভাবেই তিনি তাঁর কাছে আসা সবার সাথে আচরণ করতেন।

এ শ্লোকের গভীর অর্থ সেটি : ভক্ত কৃষ্ণভাবনার দর্শনে আপসের ব্যাপারে দৃঢ়-অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আপোসের প্রতি এই অনিচ্ছাই উত্তম চরিত্র গঠন করে।

শৃঙ্খলার শুরু হয় আত্ম-শৃঙ্খলা থেকে এবং আত্ম-শৃঙ্খলার শুরু হয় প্রশিক্ষিত মন থেকে। এ জন্যই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের মনকে সকালে জুতা দিয়ে এবং রাতে ঝাড়ু দিয়ে পেটানোর কথা বলেছেন। এ উপায়ে আমরা অবাধ্য মনের সাথে আপস করব না, কিন্তু পরমার্থ অনুশীলনে আমরা অটল থাকব।

১ প্রবচন, টোকিও, এপ্রিল ২২, ১৯৭২।

২ প্রবচন, টোকিও, এপ্রিল ২২, ১৯৭২।

৩ চৈ. চ অন্ত্য ৪, ১৬৩।

৪ পত্র, এপ্রিল ২০, ১৯৭৪।

৫ প্রবচন, জেনেভা, জুন ৪, ১৯৭৪।

৬ ইসকন ইন 1970's, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০।

শ্লোক ৭

কিম্ তয় ক্রিয়তে ধেন্বাঃ যা ন দোগ্ধ্রী ন গর্ভিণী।
কো হ্যতঃ পুত্রেণ যতেন য ন বিদ্বান ন ভক্তিমান ॥

কিম– কী; ***তয়–*** তার সাথে; ***ক্রিয়তে–*** কর্তব্য; ***ধেন্বাঃ–*** গাভীর সাথে; ***য–*** কে; ***দোগ্ধ্রী–*** দুগ্ধ প্রদান করে; ***ন–*** না; ***গর্ভিনী–*** কল্পনা করে; ***কঃ–*** কী; ***অর্থ–*** মূল্য; ***পুত্রেন–*** পুত্র দ্বারা; ***যতেন–*** জন্মের দ্বারা; ***য–*** কী; ***ন–*** না; ***বিদ্বান–*** জ্ঞানী; ***ন–*** না; ***ভক্তিমান–*** ভক্ত।

অনুবাদ

যে গাভী গর্ভধারণ ও দুগ্ধ দান করতে পারে না, তার কী প্রয়োজন? যে পুত্র বিদ্বান বা ভগবদ্ভক্ত কোনোটিই নয়, তারই বা কী প্রয়োজন?

তাৎপর্য

অনেক সময় ভক্তরা প্রশ্ন করেন, কেন চাণক্য পণ্ডিত পুত্রের ভগবদ্ভক্ত ও বিদ্বান হওয়াকে সমজ্ঞান করেছেন। উত্তরের জন্য আমাদের বিচার করতে হবে, চাণক্য পণ্ডিত কী ছিলেন? তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। শ্লোকসমূহ তখনই পুরোপুরি বৈষ্ণবীয় হতো, যখন তা শ্রীল প্রভুপাদ উদ্ধৃত করতেন। প্রভুপাদের কাছে শিক্ষিত পণ্ডিত মানেই ভগবদ্ভক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন যে পণ্ডিত যদি ভক্ত না হয় তার পাণ্ডিত্য বৃথা।

জড় জগতে পিতা-মাতামাত্রই সন্তান লাভের জন্য উদগ্রীব; কিন্তু তাদের সন্তান অকেজো হয়ে বেড়ে উঠলে তা যে কত বেদনাদায়ক হয়, তা তারা কখনোই বিবেচনা করেন না।

মহারাজ চিত্রকেতু ও তার পত্নীর কোনো সন্তান না থাকায় তারা অঙ্গিরা মুনির কাছে একটি পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। অঙ্গিরা মুনি জানতেন যে, পূর্বকৃত কর্মের ফলে চিত্রকেতু কখনো সন্তান লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি জোর করছিলেন, তাই তিনি তাঁর পত্নীকে সন্তান লাভ করার আশীর্বাদ করেছিলেন। তিনি তাদের সতর্কও করেছিলেন যে, এই সন্তান তাদের সুখ-দুঃখ উভয়েরই কারণ হবে। মহারাজ চিত্রকেতু যদিও মুনির এই সতর্কবাণী শুনেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে সন্তান স্বেচ্ছাচারী বা অন্য কোনো ত্রুটিযুক্ত হলেও কোনো অসুবিধা নেই। তিনি বিচার করেছিলেন যে "নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো।" শ্রীল প্রভুপাদ এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, এ জড় জগৎ এত কলুষিত যে প্রত্যেকেই সন্তান লাভ করতে চাইছে, এমনকি সে যদি কুলাঙ্গারও হয়।[১] যখন কোনো পরিবারের সন্তান দুঃখ-দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ হয়, পিতামাতা এরূপ পুত্রের

জন্য তাদের নিয়তিকে দোষারোপ করেন। যদি তারা আরও যত্নবান হতেন এবং চাণক্যের এ শ্লোকটি উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহলে তারা অবশ্যই সাংসারিক জীবনের এমন সব তিক্ততা অতিক্রম করতে পারতেন।

দেবতাদের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে অসুরেরা যখন কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছিল, তখন বৃত্রাসুর তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "হে দেবগন, এই অসুর যোদ্ধাদের জন্ম বৃথা। প্রকৃতপক্ষে মাতৃদেহ থেকে বিষ্ঠার ন্যায় এদের পতন হয়েছে।"[২] এখানেও কুপুত্রের নিন্দা করা হয়েছে। চাণক্যের হিতোপদেশমূলক এ রকম আরেকটি শ্লোক পাওয়া যায়, যে সন্তান ভগবানের ভক্ত বা মহৎ নয়, সেই সন্তানের মূল্যই বা কতটুকু? পুত্র হচ্ছে অন্ধের চক্ষুর ন্যায়, যা কোনো কাজেই আসে না, কেবল দুঃখই দেয়।

মহাভারত থেকে আমরা শিক্ষা পাই কীভাবে দুর্যোধনের মতো ঈর্ষাপরায়ণ, অভক্ত সন্তান পুরো পরিবারের অধঃপতনের কারণ হয়ছে। পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সাথে দুর্যোধন তার ভাইদের নিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। সেটা তাদের বিনাশেরই কারণ হয়েছে। এ ধরনের হিংসার কুফল সম্বন্ধে অবগত হয়ে মহাত্মা বিদুর পূর্বেই ধৃতরাষ্ট্রকে তার কুপুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলেন এবং এই শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি নিষ্পাপ বিবেচনা করে মূলত পাপের সাক্ষাৎমূর্তি দুর্যোধনকে পালন করছেন। কিন্তু সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আর এভাবে শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী অভক্তের পালনের মাধ্যমে আপনি সমস্ত দিব্য গুণবর্জিত হচ্ছেন। এই ধরনের দুর্ভাগ্য থেকে এখনই নিজেকে মুক্ত করুন এবং পরিবারের কল্যাণ সাধন করুন!"[৩]

বৈদিক শাস্ত্রানুসারে একজন সুপুত্র তার পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানসহ পিতার মৃত্যুর পর আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন। এমনকি সেই পিতা যদি অত্যন্ত পাপীও হয়। প্রভুপাদ এই বিষয়ে লিখেছেন, "কিন্তু পুত্র যদি ইতিমধ্যেই বিষ্ণুবিদ্বেষী হয় তাহলে এরূপ বৈরী মনোভাব নিয়ে কীভাবে সে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণকমলের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবে?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান আর দুর্যোধন তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। সেজন্য সে তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর তাকে সুরক্ষা দিতে অসমর্থ হয়। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে তার নিজেরও অধঃপতন হলো। তাহলে সে কীভাবে তার পিতাকে সুরক্ষা দিতে পারবে? বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সত্যিকার অর্থেই তিনি যদি তার পরিবারের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন হন, তাহলে যেন তিনি দুর্যোধনের মতো অযোগ্য পুত্রকে যত দ্রুত সম্ভব পরিত্যাগ করেন।[৪]

এ শ্লোকের সিদ্ধান্ত কঠোর বলে মনে হতে পারে। তা পিতামাতাকে অযোগ্য সন্তান পরিত্যাগের পরামর্শ দেয়। চাণক্য আর যাই হোক কোনো অসম্ভব উচ্চ আদর্শের হিতোপদেশ দিচ্ছেন না, বরং পৃথিবীতে যা ঘটছে তারই নির্দেশ করছেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আসলেই পিতামতার ভজনে বিঘ্নের কারণ হতে পারে। এমন পিতামাতা প্রাথমিকভাবে তাকে সতর্ক করে এবং অবশেষে যখন সে যথেষ্ট বড় হয়, তখন তাকে বাড়ি পরিত্যাগ করে নিজের মতো জীবন খুঁজে নেওয়ার অনুমতি দেয়। বহু পরিবারে ক্ষেত্রে এমনটিই পরিলক্ষিত হয়, বাস্তবিক সমীক্ষার ফলও তাই বলে। যদিও সন্তানের যত্ন নেওয়া এবং তাকে ভগবৎভাবনায় পরিচালিত করা পিতামাতার কর্তব্য, তবুও সন্তানদের ভক্তিপথ গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়। পিতামাতাকে এই ধরনের সন্তানদের ভরণপোষণ করার প্রয়োজন নেই।

শ্রীল প্রভুপাদের বয়স পঞ্চাশ বছর হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর অভক্ত পুত্রদের ভরণপোষণ করেছিলেন। এরপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই শ্লোক অভক্ত সন্তানকে বাড়ির বাইরে ছুড়ে ফেলার বা হত্যা করার শিক্ষা কোনো পিতামাতাকে দিচ্ছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন এ সম্পর্কে বলছিলেন, তখন তিনি অযোগ্য পুত্র ও আসুরিকভাবাপন্ন পুত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করেছিলেন। এমন নয় যে পিতামাতাকে পুরোপুরি নির্দয় হতে হবে। প্রভুপাদ প্রায়ই শিশুদের পশুর সাথে তুলনা করতেন। তিনি বলতেন পশুদের বিচারবুদ্ধি কম এবং তাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাদের ব্যবহার বা হত্যা না করে সর্বদা সুরক্ষিত রাখা উচিত। একইভাবে কোনো পিতার যোগ্য সন্তানের সঙ্গে অকর্মা সন্তানের তুলনা করা এবং তাকে হত্যা করা উচিত নয়।

আসলে কোনো সন্তান যদি আসুরিক ভাবাপন্ন হয়, পিতামাতার উচিত তাকে পরিত্যাগ করা। উদাহরণস্বরূপ অন্যায়কারী ও দুর্বৃত্ত শাসক বেনের পিতা অঙ্গ মহারাজ তার অত্যাচারী পুত্রের প্রচণ্ড পীড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করে বনে গমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকায় এসে অনেক অযোগ্য ছেলেমেয়েকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেননি বরং ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে আমাদের অযোগ্যতা ছিল এবং কর্মের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মধ্যে পারমার্থিক গুরু-শিষ্যের এক নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। তিনি আমাদের নতুনভাবে জন্মদান করেছিলেন এবং যোগ্য হয়ে ওঠার নতুন সুযোগ প্রদান করেছিলেন। অযোগ্য সন্তানদের হত্যা করার

পরিবর্তে কীভাবে নতুনভাবে তাদের বিকাশ ঘটানো যায়, সেটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করেছিল এমন কিছু শিষ্যকে যখন শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা দান করছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "তাদের কাছে গিয়ে মিনতি করো, 'আপনার পরিবারের সন্তানরা উত্তম চরিত্রের, ভক্ত, শিক্ষিত এবং সম্মানীয় হবে বলে আশা করছি।'"[৫]

কুকুর-বিড়াল জন্ম দেয়ার কী আবশ্যকতা আছে? তাকে ভক্তিমান বা বিদ্বান হওয়া উচিত। তাই আমরা আপনার সন্তানদের বিদ্বান ও ভক্তিমান হওয়ার শিক্ষা দিতে যাচ্ছি। আপনি কি আপনার সন্তানকে এভাবে বড় করতে আগ্রহী নন?' তোমাদের তাকে এভাবে বলা উচিত এবং তা খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করো।" এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, যদিও পিতামাতা এবং তাদের সন্তানেরা সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে আছে, তবু তারা নীতিভ্রষ্ট, তাই তারা তাদের পরিবার তথা জাতির দুঃখের কারণ হবে।

বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ করতে আসা এক ভদ্রলোককেও শ্রীল প্রভুপাদ একই উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান না করে, তবে তারা হিপ্পি, ভবঘুরে, মাতাল হয়ে যাবে এবং পিতার অর্থেরই শুধু অপচয় করবে। তাদের এ বিষয়ে জ্ঞাত করা উচিত।"[৬] তাদের পিতামাতাকেও সাধু ও ভক্তদের এ বিষয়ে বলা উচিত, এমনকি যদি তারা পরিত্যক্ত হয় তবুও। বর্তমানে অনেক পিতামাতাকে তাদের ভগবৎশিক্ষায় শিক্ষিত ভক্ত সন্তানদের জন্য অনুতাপ এবং তাদের পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। পিতামাতা অনুতাপ করেন, এ কারণে যে, তাদের দেয়া সমস্ত জড় শিক্ষা বিফলে গেছে আর তাদের সন্তানরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখন শুধু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভের অভিলাষী হচ্ছে। এ অবস্থায় এ শ্লোকের জ্ঞান পরস্পরবিরোধী। পিতামাতা ভক্ত সন্তানদের অকেজো বলে বিবেচনা করেন এবং তারা এমন সন্তানকে অধিক মূল্যায়ন করেন, যারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতও নয় আবার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিও আগ্রহী নয়। এ ধরনের সন্তানেরা চরমে পিতামাতার দুঃখেরই কারণ হয়, হয়তো বা বিবাদ বা মামলার মাধ্যমে, নতুবা মৃত্যুর সময় যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছেদের দ্বারা।

যদি তা সত্যিই হবে, তবে কেন চাণক্য পণ্ডিত প্রকৃত সু-সন্তানের গুরুত্বের বিষয়ে মন্তব্য করবেন? এর সবই কি পারিবারিক আসক্তি নয়? আমরা আসক্তিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করতে পারি। যেমন– পারিবারিক আসক্তি,

পরিবারের প্রতি বৈরাগ্য এবং সবচেয়ে উচ্চস্তরে বিবেচিত হয় কৃষ্ণের প্রতি আসক্তিকে যেখানে, তাকে পরিবারেরই একজন মনে করা হয়।

পাশ্চাত্যদেশে পিতামাতাগণ শিক্ষিত ভক্তদের কোনো গুরুত্ব দেন না বরং যে সন্তানেরা জাগতিক সুখ ভোগ বৃদ্ধি করতে পারে তাদেরই বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা এমন সন্তানদের বেশি মূল্যায়ন করেন, যারা তাদের গুরুত্ব আরও বর্ধিত করতে পারে। একইভাবে এমন পরিবারও রয়েছে, যারা ভক্ত সন্তানদের গুরুত্ব দেন। উভয়ক্ষেত্রেই পারিবারিক বন্ধনের স্থায়িত্ব হচ্ছে মায়া। এই শ্লোক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পারিবারিক স্থিতিশীলতার ঊর্ধ্বে এক উচ্চতর নীতি বর্তমান, যেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের হাতে তা যন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ কি অযোগ্য শিষ্যদের উপেক্ষা করেছিলেন? আমি তাঁকে কখনোই তা করতে দেখিনি, যদিও আমি দেখেছি যে অনেক শিষ্যই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ উদার ছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করতে, যা করা দরকার ছিল, প্রত্যেককেই স্বাধীনভাবে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে তিনি তা-ই করেছিলেন। এমনকি যদিও তাদের অনুশীলনের মান ভালো ছিল না, তবু তিনি তাদের অকপটে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অমিতব্যয়ী সন্তানের পিতার ন্যায় তার সন্তানদেরও তিনি পুনরায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন; এমনকি যদিও তারা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুনরায় তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিল। প্রভুপাদ খুব ভালোভাই অবহিত ছিলেন যে সুযোগ পেলে খারাপ সন্তানেরাও পুনরায় ভালো হতে পারে। তাই তিনি তাদের ত্যাগ করতেন না।

[১] ভা. ৬/১৪/২৯ তাৎপর্য।

[২] ভা. ৬/১১/৪।

[৩] ভা. ৩/১/১৩।

[৪] ভা. ৩/১/১৩ তাৎপর্য।

[৫] কক্ষে আলোচনা, বৃন্দাবন, জুন ২৪, ১৯৭৭।

[৬] কক্ষে আলোচনা, বৃন্দাবন, নভেম্বর ৫, ১৯৭৬।

শ্লোক ৮

ত্যজ দুর্জন সংসর্গং ভজ সাধুসমাগম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যং অনিত্যতাম্ ॥

ত্যজ–ত্যাগ কর; ***দুর্জন–সংসর্গম্***– দুর্জনের সঙ্গ; ***ভজ***– ভজনা কর; ***সাধু–সমাগম্***– সাধুসঙ্গ; ***কুরু***– কর; ***পুণ্যমহোরাত্রং***– দিন-রাত পুণ্য কর্ম সম্পাদন করো; ***স্মর নিত্যং***– সবসময় স্মরণ করুন; ***অনিত্যতাম***– (এই জড় জগতের) ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি।

অনুবাদ

দুর্জনের সঙ্গ ত্যাগ করো। সাধুসঙ্গে ভজন করো। দিন-রাত শুধু পুণ্যকর্ম করো এবং সর্বদা এ জগতের অনিত্যতা স্মরণ রেখো।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে যখন বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন মহাপ্রভূ উপদেশ দিয়েছিলেন, "*অসৎ সঙ্গ ত্যাগ-এই বৈষ্ণব আচার, 'স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥*"[১] যিনি অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করেছেন, তিনিই বৈষ্ণব। কিন্তু অভক্ত কে? যে জড় বিষয় ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং সাধু নয়, সেই অভক্ত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনটাই নিরূপণ করেছেন। উপদেশামৃতে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন, অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করে সর্বদা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করা উচিত।

আমরা যখন জড়-জগতের অনিত্যতা ভুলে যাই এবং জড়কর্মে ব্যাপৃত হই, তখনই লালসা ও শোকের দ্বারা তাড়িত হই। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সংকট সফলভাবে নিরসনের উপায় বলেছেন, "ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন।" প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, "জাগতিক ব্যক্তিদের জন্য এই জগৎ দুর্দশাময়, কিন্তু একজন ভক্তের জন্য সমস্ত জগৎটাই বৈকুণ্ঠধাম।"[২]

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, কথাটি বোঝা অনেক সহজ, কিন্তু কে বা কারা এই অসৎ ব্যক্তি? শিক্ষিত এবং উচ্চতর মানসম্পন্ন কেউ অবশ্যই এর আওতায় আসবে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভগবানকে জানে না সে শিক্ষিত তো নয়ই বরং গণ্ডমূর্খ। এটি আমাদের মতামত নয়, এটি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।"[৩] শাস্ত্র এ ব্যাপারে খুব কঠোর। এমনকি যদি গুরু গ্রহণের পর জানা যায় যে সে গুরু শঠ, তবে তাকেও ত্যাগ করা যেতে পারে।"

চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন কখনোই ভুলো না যে এ জড়-জগৎ অনিত্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "স্বপ্ন সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত, আমাদের যা আছে, যা আমরা দেখতে পাই সবই স্বপ্ন, ক্ষণস্থায়ী।"[৪] যদি কোনো ব্যক্তি অনিত্য জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ এমনকি পরিবারবাদ গ্রহণ করে, সেটাও সময়ের অপচয়ই মাত্র। কৃষ্ণভক্তি যাজন না করে আমরা শুধু এই অনিত্য, দুঃখময় জগতে আরও কোটি জন্মকাল অবস্থানের জন্য কর্মফল বৃদ্ধি করে থাকি।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "সবসময় মনে রাখতে হবে যে এ জগতের সবকিছুই অল্প কিছু দিনের জন্য। ব্যাস্! এতটুকুই।" এই সত্য বোঝাতে প্রভুপাদ আমাদের এক বৃদ্ধের কাহিনী বলেছিলেন, যিনি প্রায় অমর ছিলেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটির আয়ু এতই বেশি ছিল যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি ব্রহ্মার চেয়েও বেশি দিন জীবিত থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে এই বৃদ্ধ লোকটি অনেক ব্রহ্মার চেয়েও বেশি সময় জীবিত ছিলেন, কারণ প্রতিবার একজন করে ব্রহ্মা দেহ রাখলে তার দেহ থেকে একটি করে চুল খসে পরত। যেদিন বৃদ্ধের সব চুল ঝরে পড়বে, সেদিনই সে মারা যাবে। বৃদ্ধলোকটি পবিত্র নদীর তীরে বসে ধ্যান করে সময় অতিবাহিত করতেন। তার এক শিষ্য তাকে কঠোর সাধনা করতে দেখে একটি কুটির নির্মাণ করে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তদুত্তরে বললেন, "আমি আর অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকব, তাই আমার কুটিরের কী প্রয়োজন?"

মায়াবাদী দার্শনিকেরা এই শ্লোকের শুধু প্রথম অর্ধাংশের অনুশীলন করে। তারা খুব কঠোরভাবে দুর্জন বা ইন্দ্রিয় তর্পকারীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে, কিন্তু সাধারণত ভক্তসঙ্গ করে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত আসলে পরিণামে তাদের অধঃপতনেরই কারণ হয়। শুধু নিষেধাজ্ঞাগুলো পালন করেই কেউ ভগবৎচেতনাময় থাকতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, অনাদৃত যুস্মদ অঙ্ঘ্রয়ঃ– কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন করে কেউ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু যদি সে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের সেবার প্রতি অবহেলা করে, তবে তার পতন নিশ্চিত।[৫]

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এ শ্লোকের নীতিগুলো পালনে একনিষ্ঠ এবং জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে সকলকে রক্ষা করার চেষ্টায় রত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়, বরং ভক্তসঙ্গের জন্যই বিভিন্ন স্থানে আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করেছি। এই কেন্দ্রগুলোর অধ্যক্ষদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা এই কেন্দ্রগুলো বা প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো পতিতালয় হিসেবে স্থাপন করিনি। সেখানে অবশ্যই এমন ব্যবস্থাপনা বা আয়োজন থাকবে, যেখানে সবসময় ভক্তসঙ্গ করার ফলে আমাদের প্রগতি হবে।[৬]

ভক্তরা অনেক সময় এমন প্রবচনের মুখোমুখি হয় এবং এই ভেবে হতভম্ব হয় যে তারা কীভাবে এ আদর্শে পৌঁছুতে পারবে। সম্ভবত ভক্তদের বাইরে কাজ করতে গিয়ে অভক্তদের সঙ্গ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যখন তারা অভক্তদের সাথে থাকে, তখন এ জড় জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়।

এ কথাগুলো একটি আদর্শ নির্দেশ করে। জড়জগৎ আদর্শে পরিপূর্ণ এবং বেড়ে ওঠা ও জ্ঞানী হয়ে ওঠার সাথে সাথে সকলেই একে অন্যের সাথে বিভিন্ন আদর্শ বিনিময় করে। চাণক্যের নীতিগুলো, বিশেষ করে যখন কোনো বৈষ্ণবাচার্যের দ্বারা উল্লিখিত হয়, তখন তা জড়বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। নীতি ও আদর্শগুলোকে হৃদয়ে ধারণ করার পাশাপাশি তা পালনে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। সারাদিন ধর্ম আচরণ করা হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হবে না। উদাহরণস্বরূপ– যদিও আমরা শুদ্ধভক্তি লাভের অভিলাষ করি, কিন্তু এখনও তা অর্জন করতে পারিনি। তাই আমরা এই সমস্ত আদর্শ পালনের অভিলাষ করতে পারি, হয়তো সেটা এতো শীঘ্র নাও হতে পারে।

নীতিগুলো অনুসরণ করা মানে এই জড় জগতের অনিত্যতা স্মরণ করা এবং শাশ্বত বা নিত্য জীবন লাভ করা। যেকোনো সময় মৃত্যু হতে পারে, সেটা সর্বদা স্মরণ নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উচিত এই নীতিগুলোকে জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা। তখন আমরা দেহগত চেতনার পরিবর্তে তখন স্বরূপে (চিদাত্মা) অধিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদা কর্ম করতে পারব। আমরা তখন আমাদের পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি আসক্তির পরিবর্তে বৃন্দাবনের প্রতি আসক্ত হতে পারব। আমরা তা-ই করব, যা এই জড়সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি আসক্তির পরিবর্তে অনাসক্ত হতে উৎসাহিত করে। সর্বদাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব, যদিও সব সময় করার ইচ্ছা নাও হতে পারে। অসৎসঙ্গ ত্যাগের অর্থ এই নয় যে ভক্তরা অভক্তদের সাথে কাজ করতে পারবে না। এর মানে হলো তাদের সাথে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। যদি কোনো ভক্তের এমন কোনো পরিবেশে চাকরি করতে হয়, যেখানে তাকে অভক্তসঙ্গ করতেই হবে, তাহলে তার এই শ্লোক অনুসরণ করা উচিত নয়, বরং তার চিন্তা করা উচিত আত্মা অজেয়। এমন পরিস্থিতিতে ভক্তদের গভীর উপলব্ধিসমূহ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের সাথে বিনিময় করার জন্য সংরক্ষণ করা উচিত।

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, আমাদের সাধুসঙ্গ করা উচিত। আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, সাধু বলতে কৃষ্ণভক্তকেই বোঝায়। তাহলে সাধুসঙ্গ কেমন হওয়া উচিত? কোনো একজন ভক্ত একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কোনো ভক্তের সাথে নববর্ষের রাতের অনুষ্ঠানে সারারাত

মদ্যপান করা এবং নববর্ষে ফোন করাও কি ভক্তসঙ্গ হতে পারে? আমি তা মনে করি না। সেই ভক্তটিই আবার জিজ্ঞেস করেছিল যে তাহলে টিভিতে একসাথে খেলা দেখা (যা শ্রীল প্রভুপাদকে অর্পণ করা হয়েছে) কি ঠিক ছিল। কেউ বলতে পারে, এসব পালন করার মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে, আমেরিকান সভ্যতায় কৃষ্ণভাবনামৃত জন্মলাভ করছে। আমরা আমেরিকানদের বলতে পারি না যে, খ্রিস্টমাস, নববর্ষ বা ইস্টার সানডে উৎসব পালন করবেন না, বরং তারা তাদের এ পবিত্র দিনগুলোকে কৃষ্ণভাবনাময় করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এসব করা যেতে পারে। এই অনুষ্ঠানগুলোর কোনো তাৎপর্য নেই, এমন না ভেবে কৃষ্ণকেন্দ্রিক উৎসব উদযাপন করা যেতে পারে। তাই বলে কোন বিষয়গুলো কৃষ্ণকেন্দ্রিক করা যেতে পারে, তার অবশ্যই সীমা থাকতে হবে। আমি মনে করি, ভক্তরা যখন একত্রিত হয়ে টিভিতে কোনো খেলা দেখে, তখন ভক্তসঙ্গ নয় বরং মায়ার সঙ্গ হয়। ভক্তসঙ্গের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে ভক্তরা একত্রিত হয়ে ভক্তিমূলক সেবাই সম্পাদন করবে।

যখন এই শ্লোক সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তন করছে, তার অর্থ হলো ভক্তসঙ্গে শ্রবণ, কীর্তন ও অন্যান্য ভক্তিমূলক সেবা করা। সাধারণত দিন-রাত পুণ্যকর্ম করার মানে হতে পারে, বৃক্ষরোপণ, পুকুর খনন, রাস্তা নির্মাণ এবং এমন কিছু করা যার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয়। একজন বৈষ্ণবের কাছে অবশ্যই এর থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা হয়। সকলের উপকারের জন্যই একজন বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন, হরিনাম, কৃষ্ণপ্রসাদ, শাস্ত্রগ্রন্থ বিতরণ এবং মন্দির নির্মাণ ও পরিচালনা করেন। এসবই প্রকৃত ধর্মাচরণ এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের এই প্রকার ধর্ম আচরণ করার নির্দেশ দিতেন।

এটি এমন একটি শ্লোক, তা যখন বৈষ্ণব নয় এমন কারো দ্বারা উদ্ধৃত হবে, তখন আমাদের ভোগপ্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে। কেননা এ শ্লোক ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে, যা তারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে, যেখানে সবাই মনে করে, ধর্ম আচরণ করার মাধ্যমে তারা উচ্চতর যোনিতে জন্মলাভ করবে। যেহেতু আধ্যাত্মিক জীবন অগ্রগতিশীল এ ধরনের উন্নত জীবন তাদের যুগপৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ হ্রাস করে এবং তাদের পারমার্থিক স্থিতি উন্নত করে। কিন্তু এটা কলিযুগ এবং পারমার্থিক উন্নতির অনুকূল জন্মলাভের সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়ে আসছে। এই কলহ ও প্রতারণার যুগে উন্নত জন্মলাভের অর্থই বা কী হতে পারে, যেখানে প্রত্যেকটি দেশই বাস্তবিকপক্ষে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা জর্জরিত? শ্রীল প্রভুপাদ প্রগতিশীল আধ্যাত্মিক জীবনকে একটি রাজপথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন এমনকি রাজপথেও বিপদ থাকতে পারে। উন্নতি বা প্রগতি লাভের পরিবর্তে ঐ প্রকার আধ্যাত্মিক অনুশীলনকারী হঠাৎ ধর্মকর্ম

ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হতে পারে। জড়া প্রকৃতির গুণগুলো অচ্ছেদ্য চক্রের ন্যায়। আমরা যদি বৈরাগ্যযুক্ত ও অনুকূলভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন না করি, তবে মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হবে।

আমি ধার্মিক হলেই জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য তা যথেষ্ট হবে, তা একটি ভ্রান্ত ধারণা। এ জগতের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় দুঃখের সম্মুখীন হয়। জনগণের কর্মফলস্বরূপ আমাদের দেশে যেকোনো মুহূর্তে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশে যেকোনো মুহূর্তে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে অথবা প্রকৃতির গুণগুলো আমাদের অধর্মের পথে চালিত করতে পারে এবং আমরা নীচকূলে জন্মলাভ করতে পারি।

মৃত্যুবরণ করা যেমন কঠিন তেমনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করা আরও কঠিন। 'জড়জগৎ নিরাপদ স্থান' শ্রীল প্রভুপাদ সবসময় আমাদের এই ভ্রম ভেঙ্গে দিয়ে বলতেন, "এই জড় জগতে কোনো সুখ নেই।" জড়জগতে সুখ নেই মানে আমরা যেভাবে চাইব সব সেভাবেই হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা অনেক বৃক্ষরোপণ করেছি, অনেক পুকুর খনন করেছি শুধু এতটুকুই পরবর্তী জীবনের উত্তম অবস্থান সুনিশ্চিত করে না। সবই কলির প্রভাবে ভেস্তে যাবে।

ভাগবতে কলিযুগের প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : "হে রাজন, তারপর কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, শুচিতা, ক্ষমা, আয়ু, দৈহিক বল এবং স্মরণশক্তি দিন দিন হ্রাস পাবে। কলিযুগে শুধু সম্পত্তিকেই মানুষের শুভ জন্ম, যথার্থ ব্যবহার এবং সমস্ত সদ্‌গুণের চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। মানুষের ক্ষমতার ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে। দূরে অবস্থিত জলাশয়কেই তীর্থরূপে গণ্য করা হবে এবং মানুষের কেশ বিন্যাসকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে। উদরপূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য এবং ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে। পরিবার ভরণপোষণে সক্ষম ব্যাক্তিকে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে এবং শুধু খ্যাতি অর্জনের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে। এভাবে যখন পৃথিবী দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন। ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর, দস্যুস্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বতে ও জঙ্গলে পলায়ণ করবে। অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক পাতা বৃক্ষমূল, বন্যমধু, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ খেতে শুরু করবে। খরায় পীড়িত হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে।"[৭]

কলিযুগ খুব ভয়ংকর সময়। এটাই কঠোর বাস্তবতা। এমনকি কেউ যদি ধর্ম আচরণ করে নিজেকে স্বর্গ লোকেও উন্নীত করে তবুও তো তা নিত্য নয়।

মাঝে মাঝে দেবরাজ ইন্দ্রকেও তাঁর সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হতে হয় এবং জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করতে বাধ্য হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি স্বর্গলাভ করে সুখভোগ করবেন, তাকেও আবার এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে, যখন কলির প্রভাব আরও বর্ধিত হবে।

অনুরূপভাবে, একজন সন্ন্যাসীর কখনও জাগতিক সুযোগ-সুবিধায় পরিতৃপ্ত এবং এসবে নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ নয়, কেননা সেগুলো গৃহস্থদের দ্বারা অর্পণ করা হয়, যারা এসবের মাধ্যমে সাধুসঙ্গ লাভের চেষ্টা করে। সাধুর সমস্ত জাগতিক চাহিদার যোগান শুধু কতগুলো প্রবচনের পুরস্কার নয়, তিনি এবং গৃহস্থ উভয়েই আত্মতুষ্টিবশত ভুল ভাবতে পারেন যে, তারা প্রত্যেকেই সঠিক কর্ম করছে।

প্রত্যেকেরই উচিত নিজ কর্তব্য হিসেবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছা। বিশেষভাবে গৃহস্থদের সব ক্ষমতা দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেউ তাকে বলতে পারে যে তার অগ্রগতি ভ্রান্ত। কিন্তু আমাদের সমাজ এতটাই জটিল যে তিনি হয়ত এর সাথে সরল সমন্বয় করতে অসমর্থ হবেন। একজন ভক্তকে জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। তাকে কৃষ্ণভাবনাময় থাকার পাশাপাশি তার কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তন অত্যন্ত সরল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। যদি জপকীর্তনকেই প্রথম অগ্রাধিকার দেয়া হয়, তাহলে জাগতিক কর্মকে কৃষ্ণভাবনার সাথে যুক্ত করা সহজতর হবে। জড়জগতের প্রতি অনাসক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে গৃহনির্মাণ করা সহজ হবে। আমরা শুধু পাপমুক্ত বা কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার অভিলাষ করিনা, বরং কৃষ্ণপ্রেম লাভের প্রত্যাশা করি। আমরা ভক্তদের সাথে শ্রবণ, কীর্তন করে, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদের ঐকান্তিকভাবে সমর্পন করে সহজেই সেই স্তরে উন্নীত হতে পারি।

[১] চৈ. চ মধ্য ২২/৮৭।
[২] ভগী ১৮/৫৪ এবং তাৎপর্য।
[৩] প্রবচন, লস্ এঞ্জেলস্, জুন ৪, ১৯৭৬।
[৪] প্রবচন, হায়দ্রাবাদ, নভেম্বর ২১, ১৯৭২।
[৫] ভাঃ ১২/২/৩২।
৬ প্রবচন, লন্ডন, আগস্ট ২৬, ১৯৭৩।
৭ ভাঃ ১২/২/ ১-২, ৬-৯

শ্লোক– ৯

মূর্খাঃ যত্র ন পূজ্যন্তে ধান্যং যত্র সুসুঞ্চতম্।
দম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতাঃ ॥

মূর্খাঃ– মূর্খগণ; ***যত্র–*** যেখানে; ***ন–*** না; ***পূজ্যন্তে–*** পূজিত হয়; ***ধান্যম্–*** শস্য; ***যত্র–*** যেখানে; ***সুসঞ্চিতম–*** সুসঞ্চিত; ***দম্পত্যোঃ–*** স্বামী-স্ত্রী'র; ***কলহঃ–*** ঝগড়া; ***নাস্তি–*** নেই; ***তত্র–*** সেখানে; ***শ্রীঃ–*** লক্ষ্মীদেবী; ***স্বয়ম্–*** স্বয়ং; ***আগতাঃ–*** এসেছেন।

অনুবাদ

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সেখানেই বাস করেন, যেখানে দুষ্ট ব্যক্তিরা পূজিত হয় না, ধানাদি শস্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে এবং দাম্পত্য কলহ নেই।

তাৎপর্য

আপনি যদি জড়সুখ কামনা করেন, তবে তা লাভের পদ্ধতি এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এর মানে কি এ শ্লোকটি উদ্ধৃত করে প্রভুপাদ জড়সুখ লাভের কথা বলেছেন? না, শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন কৃষ্ণভক্তির পথে অনুকূল। যদি আমরা ক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হই, তবে আমাদের সমস্ত শক্তিই জাগতিক সংগ্রামে বিনষ্ট হবে।

একজন আদর্শ গৃহস্থের অবশ্যই তার জীবিকা নির্বাহ করা উচিত এবং নিজেকে তা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, "কাউকে জীবিকার জন্য দূর দেশ গমন বা বহু কষ্টের প্রয়োজন নেই, চাইলে গৃহেই শস্য উৎপাদন করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।"[১] শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কেউ চাইলে বছরের কয়েক মাস পরিশ্রম করেই সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে, যা ভারতীয় অঞ্চলে আজও প্রচলিত। প্রভুপাদ ইসকন ফার্মে তার শিষ্যদের প্রায়ই উপদেশ করতেন "সময় বাঁচিয়ে হরিনাম জপ কর।" বৈদিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুযায়ী, গোরক্ষা ও খাদ্য সঞ্চয়ই সম্পদের ভিত্তি। তাই প্রত্যেকেরই ছোট একখণ্ড আবাদি জমি এবং দুধের জন্য কতগুলো গরু থাকা উচিত।

খুব স্বল্প জাগতিক চাহিদা পূর্ণ করে আমরা গুরু এবং বৈষ্ণবের সেবা করে পারমার্থিক জীবনের যত্ন নিতে পারি। এই শ্লোকের সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো ভণ্ড গুরুর পূজা করা উচিত নয়। পুনরায় সেই গ্রামীণ জীবনধারায় ফিরে যাওয়াও ইস্কনের উদ্দেশ্য গুলোরই একটি। আধুনিক পাশ্চাত্য

কাঠামোয় এটি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তাব। পাশ্চাত্য দেশে মানুষ মহামূর্খদের পূজা করে – মাইকেল জ্যাকসন, ও.জে সিম্পসন। তবুও মনে করা হয়ে থাকে আভিজাত্যরূপে ভাগ্যদেবী সেখানেই রয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদকে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বিভিন্নভাবে এর উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "শুধু অপেক্ষা করো"। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক পাপপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যদেবী সেখানে অবস্থান করছেন বলে মনে হয়, কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে শীঘ্রই তিনি অন্তর্হিত হবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন, আমাদের বদান্যতা স্পষ্ট। অতীতে সবাই খাওয়ার জন্য স্বর্ণের থালা ব্যবহার করত, কিন্তু এখন তারা কাগজের থালা ব্যবহার করে। অতীতে মহিলারা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত, কিন্তু এখন তারা প্লাস্টিকের অলংকার ব্যবহার করে। পূর্বে দেশের সম্পদ স্বর্ণমানে নির্ণিত হতো, কিন্তু এখন হয় কাগজের মুদ্রায়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পাশ্চাত্য জাতিকে প্রতারক করে তুলছে। পরিত্যক্ত স্থানগুলো পুরাতন গাড়ি ও অপচনশীল আবর্জনার দ্বারা অতিমাত্রায় পূর্ণ। যদিও আমেরিকায় সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং পরিবহনব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু শুধু ভগবৎচেতনাহীনতার কারণে সবই মায়ার ফাঁদে পরিণত হচ্ছে।

যাই হোক, পিতৃপুরুষদের পুণ্যকর্মের ফলেও এদেশ সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। এমনকি কিছুদিন পূর্বেও আমেরিকায় সবাই খাদ্য সঞ্চয় করত, ভূমিতে চাষাবাদ করত, ভগবানের আরাধনা করত এবং বিবাহের নীতিগুলোকে সম্মান করত। শ্রীল প্রভুপাদ এখানেও মন্তব্য করেছেন, যাইহোক "অপেক্ষা করুন"।

এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, গৃহকর্ত্রী যদি ভালো হয়, তবে গৃহস্থ জীবনও শান্তিময় হবে। ভক্তি অনুশীলনে প্রভাবিত করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের অসুখী হওয়ার কথা কখনো বলতেন না। বরং আমাদের এমন পর্যায়ে উন্নীত হওয়া উচিত যেখানে আমাদের মন বিচলিত হবে না। এই অবস্থায় আমরা পারমার্থিক অগ্রগতি সাধনে আরও মনোযোগী হতে পারব। ভারতীয় সভ্যতা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল যে, সাধারণ লোকেরাও আত্মোপলব্ধির সহায়ক পরিবেশে বাস করত। শ্রীল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্যে এলেন, তখন স্বভাবতই ভারতীয় সভ্যতার সুবিধাগুলোর আরও প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রথমে আমি ভাবতাম এটি একটি রীতি। যেমন অনুগত পত্নী হওয়া একটি রীতি। কিন্তু আমি যখন ভারতের বাইরে এলাম, তখন অনুগত পত্নী হওয়ার অর্থ বুঝতে পারলাম। ভারতের গ্রামেও যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াও হতো, তবুও স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অনুগত

থাকত এবং বিবাদ থাকা সত্ত্বেও স্বামী সতর্ক থাকতেন যেন স্ত্রীর কোনো অসুবিধা না হয়।[২]

বদ্ধাবস্থায় প্রায় সকলেরই বিবাহ করা প্রয়োজন। স্ত্রীসঙ্গের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তা অবশ্যই শালিনতা ও সুসভ্যতা বজায় রেখে হওয়া উচিত। "পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কোনো অনুকূল পরিবেশ নেই। প্রথমত, পারমার্থিক জীবন এবং মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই এবং কিছুই অনুকূল অবস্থায় নেই। দিন দিন অবস্থার আরো অবনতি হচ্ছে। শিকাগোতে আমার সর্বশেষ ভ্রমণে আমি দেখেছিলাম যে, এক নারী প্রচার করছে যে, গত তিন সপ্তাহের মধ্যে তার দুবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে।"[৩]

শ্রীমদ্ভাগবতে স্ত্রী জাতির বর্ণনায় বলা হয়েছে, "পতিসেবা, পতির নিকট সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হওয়া, পতির আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতি ভালো ব্যবহার এবং পতিব্রতা স্ত্রী জাতির চারটি নীতি।"[৪] ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের ৪০ শ্লোক অনুসারে স্ত্রীজাতি যদি সতী এবং সুরক্ষিত না হয়, তবে পরিণামে বর্ণসংকর ঘটবে বা বর্ণাশ্রম ধর্ম উচ্ছন্নে যাবে। তখন অনাকাংক্ষিত সন্তান উৎপন্ন হওয়ার ফলে সামজিক কাঠামো ধ্বংশ হবে এবং সমাজে কোনো সুখ-শান্তি থাকবে না।

পাশ্চাত্যের মহিলারা প্রায়ই সরলতা ও সতীত্বকে নিবুর্দ্ধিতার সমান বলে মনে করে, কারণ তারা নির্যাতিত হয়। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ আস্থাহীন। এই দোষ কতগুলো নীতিহীন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়, কিন্তু তাই বলে মহিলাদের ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কথায় প্রভাবিত হয়ে নীতি বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। পুরুষ ও মহিলাদের মানসিক প্রকৃতি এক নয়। পুরুষ আধিপত্য করতে চায় আর মহিলাদের সুরক্ষা প্রয়োজন বা তারা সুরক্ষা চায়। তাই তাদের কারো না কারো অধীনস্থ হতে হয়। এটি শুধু আধাত্মিক শুদ্ধতার দিক থেকেই নয়, বিশ্বব্যাপী এভাবেই বিবেচিত হতে হবে।

যারা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে রত, তাদের বৈদিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা উচিত। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই তাদের কৃষ্ণভাবনায় শুদ্ধতা এবং পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। এমনকি ভক্তদের মধ্যেও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার অধীন তাই আমার সাথে তোমার পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত।"তবে স্ত্রীকে তা মেনে নেওয়া উচিত নয়।

পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার এবং পুরুষের মতো নারীদের জীবনযাপনের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের পুরুষদের মতো পাপপূর্ণ জীবন উপভোগের স্বাধীনতা প্রদানের উপায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই, যা তারা ইতিমধ্যেই

করছে। এটি শান্তি স্থাপনের জন্য তৈরি হয়নি। এভাবে শান্তি লাভ হয় না। সমস্ত সমাজটাকেই খুটিয়ে দেখতে হবে এবং পুরুষদের নৈতিকতাপূর্ণ বিশ্বাসী ও রক্ষণশীল স্বামী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে, আর মহিলাদের সহায়ক স্ত্রী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। তারপর যখন তারা একত্রিত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই তাদের পরিবারের শৃংঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং তাদের সময় আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য বাঁচাতে পারবে।

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে কী হবে? তাদের ক্ষেত্রে এ শ্লোক কীভাবে প্রয়োগ করা হবে? সন্ন্যাসীদের অবশ্যই সাংসারিক ঝামেলা নেই। তিনি খাদ্যও সঞ্চয় করেন না। এগুলো গৃহস্থদের কাজ। তবে যাই হোক, সন্ন্যাসীকে সমগ্র সমাজের সুবৃহৎ পরিবারের সদস্য হিসেবে ধরা যেতে পারে। বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের গৃহস্থদের সন্তান হিসেবে দেখা হয়। একই সাথে সন্ন্যাসীরা হলেন গৃহস্থদের গুরুদেব এবং গৃহস্থদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসীর উচিত তাদের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করা। এটাই বৈদিক প্রথা, যারা অর্থনৈতিকভাবে গৃহস্থদের উপর নির্ভরশীল, তারাই গৃহস্থদের গুরুদেব। এই পদ্ধতি বজায় রাখার জন্য বৈদিক সভ্যতার হিংসাপূর্ণ আচরণ করা হতো না, বরং সাধুদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হতো।

চাণক্য পণ্ডিতের এই শ্লোক অনুযায়ী, লক্ষ্মীদেবী সেই গৃহেই থাকেন, যে গৃহ শান্তিময়। লক্ষ্মীদেবীকে আনার জন্য প্রার্থনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেই সৌভাগ্য বয়ে আনবেন। তাহলে আর পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে না।

[১] প্রবচন, সানফ্রান্সিসকো, জুলাই ১৬, ১৯৭৫।

[২] কক্ষে আলোচনা, প্যারিস, আগস্ট ২, ১৯৭৬।

[৩] কক্ষে আলোচনা, প্যারিস, আগস্ট ২, ১৯৭৬।

[৪] ভাঃ ৭/১১/২৫।

শ্লোক ১০

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোহপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

দুর্জনঃ– দুর্জন; ***পরিহর্তব্যঃ–*** পরিহার করা কর্তব্য; ***বিদ্যয়া–*** বিদ্যার দ্বারা; ***অলঙ্কৃতঃ–*** অলংকৃত; ***অপি–*** যদিও; ***সন–*** হয়ে; ***মণিনা–*** মণির দ্বারা; ***ভূষিতঃ–*** ভূষিত; ***সর্পঃ–*** সাপ; ***কিম অসৌ–*** হয় কি; ***ন–*** না; ***ভয়ঙ্করঃ–*** ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

দুর্জন বিদ্বান হলেও যেকোনো মূল্যে তাকে এড়িয়ে চলা কর্তব্য। মণিভূষিত বিষাক্ত সর্প কি অধিক ভয়ঙ্কর নয়?

তাৎপর্য

বিষধর সাপকে পোষ মানানোর মতো মনে হতে পারে, কিন্তু সর্বদাই এটি ভয়ংকর বা বিপজ্জনক হওয়ায়, একে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। একইভাবে পশ্চিমের আকাশ পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল দেখালেও হঠাৎ করেই তা ঘন মেঘ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিলীন হয়ে যেতে পারে। একজন আসুরিক ভাবপন্ন খারাপ লোক বন্ধু হতে পারে, কিন্তু তাকে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয়। ঈশোপনিষদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্তি শুধু সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই নয়, সকল স্তরেই বিদ্যমান। কেননা তারা যতই শিক্ষালাভ করে ততই ভয়ংকর হয়ে ওঠে। "যারা অবিদ্যা অনুশীলন করে তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে হবে। যারা তথাকথিত বিদ্যা অনুশীলনে রত, তারা আরও ঘোরতম অন্ধকারময় স্থানে গতিলাভ করে।"[১] শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন : "ঈশোপনিষদ অনুসারে যারা মূল্যহীন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে ব্যস্ত, তারা অবিদ্যা অনুশীলন করছে। শিক্ষার অগ্রগতির নামে যারা এই ধরনের সভ্যতার সহায়তা করছে, তারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থকামীদের থেকে অনেক বেশি সর্বনাশ করছে। কেউটে সাপের মাথার ওপর বহুমূল্য মণির মতোই নিরীশ্বরবাদী শিক্ষার প্রগতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। বহুমূল্য মণি-শোভিত বিষধর কেউটে সাপ মণিহীন সাপ অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক।"[২]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চপদস্থ জড়বাদীদের সম্পর্কে তেমন মনোভাবই পোষণ করেছিলেন। ভক্তগণের সুপারিশের ফলেই তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন

দান করেছিলেন, মহাপ্রভু বলেছিলেন, "যদিও রাজা একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তবুও তিনি বিষাক্ত সর্পের মতোই।"[৩] এভাবে মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, যারা ভক্তিজীবনে উন্নতি করতে চান, তাদের অবশ্যই জড়বাদীদের সঙ্গ করা উচিত নয়, এমনকি সে যদি উচ্চগুণসম্পন্নও হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু তার উদাহরণটি ভক্তদের জন্য উপদেশ হয়ে থাকবে। জড়বাদীদের সম্পত্তি, উচ্চশিক্ষা, সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের প্রতি কখনোই ভক্তের প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

আমাদের অনেকেরই ভক্তিজীবনের পূর্বে এই শ্লোকটির তাৎপর্যের কথাগুলো সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তথাকথিত এক ধনী ব্যক্তির কাছে আমরা প্রায় প্রতারিত হতে যাচ্ছিলাম। তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি বাড়ি দান করার পরিবর্তে তিনি ইসকনের পাঁচ হাজার ডলার হাতিয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের টাকা চুরি করার পর, মি. পেইনি এবং তার উকিল বললেন যে, আমরা সেই বাড়িটি পাব না।

শ্রীল প্রভুপাদ এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও আমরা তাঁর উপদেশ অমান্য করে টাকাগুলো হারিয়েছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ পত্রে লিখেছিলেন, "ধরে নাও যে, তোমাদের মূর্খতার কারণে কৃষ্ণই সব টাকা নিয়ে গেছেন। ভবিষ্যতে খুব সাবধান থাকবে এবং কৃষ্ণের উপদেশ মেনে চলবে।" পত্রে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, *"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা–* (৫/১৮/২) উচ্চ শিক্ষা অথবা ভালো পোশাক পরিহিত থাকা সত্ত্বেও একজন অভক্ত সকল প্রকার সদ্গুণরহিত।" শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন, "তথাকথিত ভদ্রলোকদের দেখতে পরিপাটি মনে হলেও তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনা আন্দোলন চালিয়ে যেতে আমাদের তথাকথিত অনেক ভদ্রলোকের সাথে মিশতে হতে পারে, কিন্তু তাদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে, যেমনটি আমরা বিষধর সাপের ক্ষেত্রে করে থাকি।"[৪] একজন অভক্ত অন্যের প্রতি ক্ষতিকর আচরণ করতেই পারে, কেননা সে সবসময়ই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ ও চাণক্যের সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। তাঁরা উপদেশ দিয়েছেন, আমরা অভক্তদের কাছ থেকে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল দক্ষতা শিখতে পারি এবং একই সাথে আমাদের উচিত শিক্ষিত অভক্তদের এড়িয়ে চলা, যারা মূলত মণিভূষিত ভয়ংকর সাপের ন্যায়। যদিও একে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, কিন্তু মূলত তা নয়। এখানে আমাদের জন্য উপদেশ

হচ্ছে, যারা জড় জাগতিক গুণে গুণান্বিত, শুধু তাদের সম্মান করতে। আমাদের সরলভাবে মনে করা উচিত নয় যে, মণিভূষিত সাপ সাধারণ সাপের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। একজন নবীন ভক্ত এমন সমৃদ্ধশালী ধনী ব্যক্তির প্রতি হিংসাপরায়ণ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কৃষ্ণভাবনামৃত বর্জন করে তার জাগতিক গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভক্তদের জাগতিক লোকদের কাছে প্রচার করতে হয়। যেহেতু তারা কৃষ্ণভক্তির কথা শুনতে অনিচ্ছুক, তাই জাগতিক লোক হিসেবে তারা আমাদের ততটাই শত্রু, যতটা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তবুও একজন ভক্ত কখনই তাকে করুণা করার ক্ষেত্রে অনুদার নন। শ্রীল প্রভুপাদ এ সমস্ত আসুরিক লোকদের কৃষ্ণভাবনামৃত দানের পদ্ধতি দেখিয়েছেন।

জড়জগতে দুর্ভাগ্যের স্বরূপ বর্ণনা করলে ভক্তদের বোঝা উচিত যে, সাপের মতো ভয়ংকর শত্রু শুধু অন্যদের মধ্যেই নয় আমাদের মধ্যেও রয়েছে। সেহেতু আমাদের সাবধান হতে হবে, যেন আমরা সেই সকল শত্রু দ্বারা প্রতারিত হয়ে ভক্তিজীবন থেকে বিচ্যুত না হই। "মন সবসময় কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য এবং ভয় এই ছয় প্রকার শত্রুকে অনুসরণ করে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনে যুক্ত থাকলেও মনের ব্যাপারে সবাইকে সবসময় সাবধান থাকতে হবে, ঠিক যেমন সাপের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। কখনোই ভাবা উচিত নয় যে, তার মন নিয়ন্ত্রিত, তাই তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যিনি ভক্তিজীবনের প্রতি আগ্রহী তাকে সবসময় তার মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত, কেননা মনের শত্রুগুলো সবসময় মনের সঙ্গেই থাকে। তাই মনকে সর্বদা বশীভূত রাখতে হবে।"[৫]

এমনকি নিজেদের আমরা বৈষ্ণব বলে ভাবতে পারি, যেহেতু আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও মর্যাদা রক্ষা করে আচরণ করা হয়, কিন্তু অহংকাররূপী শত্রু সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। "বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, সৌন্দর্য, যৌবন এবং আভিজাত্য– এই ছয়টি মহাত্মার গুণ, কিন্তু যারা তা লাভ করার ফলে গর্বে অন্ধ হয় এবং তার ফলে তাদের সদ্‌বুদ্ধি বা বিবেক হারিয়ে যায়, তারা মহৎ ব্যক্তিদের মহিমা দর্শন করতে পারে না।"[৬]

অনেক সময় জাগতিক কোনো বিষয়ে দক্ষ অনেক নবীন ভক্ত আসতে পারে, আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন তারা অবহেলিত না হয়। তার পারমার্থিক প্রগতির কথা ভুলে গেলে চলবে না, সাথে সাথে তার অর্জিত জ্ঞান থেকে মন্দিরের লাভের কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ধনাঢ্য শিষ্য ও বিত্তহীন শিষ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। তদুপরি

তিনি সেসব ধনাঢ্য ভক্তদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন, যারা অর্থ দান করতে ইস্‌কনে এগিয়ে আসত, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতো না।

আন্তরিকভাবে বিনয়ী হওয়া সময় ও অনুশীলন সাপেক্ষ। কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি সেই সমস্ত কার্যে নিযুক্ত হয়, যা সে পূর্বে করতো, তবে সে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্বাদ –শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি সরল জীবনের স্বাদ পাবে না। একবার ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে কোনো একজন বিদ্বান ব্যক্তি তার জাগতিক গুণসমূহ দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তখন লোকটিকে গোশালায় সেবারত বালককে সাহায্য করতে পাঠান। বিদ্বান ব্যক্তিটির প্রথম কাজ ছিল গোবর পরিষ্কার করা। এমন নয় যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন বা উপহাস করার চেষ্টা করছিলেন বরং তিনি তাকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভক্তিজীবন কী– গোশালায় সেবাদানকারী ভক্তের ভৃত্য হওয়া।

সেজন্য ভক্তদের হৃদয়কে নির্মল এবং নিজেকে জড় জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হয়। তখন তারা নিজেদের এবং সকলকে চিন্ময় আত্মারূপে দর্শন করতে পারবে এবং সেভাবে প্রচার করতে পারবে, যেন সকলেই উপকৃত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য– এই শত্রুগুলোকে বিষাক্ত সাপের সাথে তুলনা করা হয়। কেননা সাপকে উত্তেজিত না করলেও সে কামড়ায়। সাপ হিংসুক প্রকৃতির মূর্তপ্রকাশ। যখন আমরা আমাদের তথাকথিত সদ্‌গুণাবলির গর্বে গর্বিত হই, তখন আমাদের সবই ধ্বংস হয়। আমরা অন্যের দোষ ধরি অথবা মনে করি তারা আধিপত্য আদায়ের জন্য আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। প্রকৃত ভক্ত সর্বদা বিনয়ী এবং তিনি অন্যের সদ্‌গুণসমূহ দর্শন করে আনন্দিত হন। তিনি প্রতিযোগিতাপরায়ণ নন, তিনি নিজেকে উন্নত করার মতো গুণগুলো নষ্ট করেন না।

[১] ঈশোপনিষদ, মন্ত্র ৯।
[২] ঈশোপনিষদ, মন্ত্র ৯, তাৎপর্য।
[৩] চৈ.চ মধ্য ১১/১০।
[৪] পত্র, মার্চ, ২৮, ১৯৬৭।
[৫] চৈ.চ মধ্য ১১/১০ তাৎপর্য।
[৬] ভাঃ ৪/৩/১৭।

শ্লোক ১১

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

মাতৃবৎ– মায়ের মতো; ***পর-দারেষু***– অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে; ***পর-দ্রব্যেষু***– পরের দ্রব্য; ***লোষ্ট্রবৎ***– মাটির ঢেলার মতো; ***আত্মবৎ***– নিজের মতো; ***সর্ব-ভূতেষু***– সমস্ত জীবকে; ***যঃ***– যিনি; ***পশ্যতি***– দেখেন; ***স***– তিনি; ***পণ্ডিতঃ***– পণ্ডিত।

অনুবাদ

যিনি পরস্ত্রীকে মায়ের মতো, পরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার মতো এবং সমস্ত জীবকে নিজের মতো দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্য পণ্ডিতের এই শ্লোকটিকে অন্য যেকোনো শ্লোকের চেয়ে বেশিবার উদ্ধৃত করেছেন। তাই, এটি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ শ্লোকটি শোনার পর অভিব্যক্তি হলো, প্রকৃত শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় নয়, বরং তা মানব সংস্কৃতির এই তিনটি বিষয় অনুধাবনের বিষয়। সভ্য আচরণ করার সাথে সাথে জড়জগতে টিকে থাকার জন্য এ শ্লোক খুব সরল এক পদ্ধতির অবতারণা করেছে। এই নির্দেশগুলো পালন করার মাধ্যমে মানুষ মায়ার কবল থেকে সুরক্ষিত যেমন হতে পারবে, তেমনি সরল ও মুক্ত হয়ে সুখী হতে পারবে।

এক প্রাতঃভ্রমণে শ্রীল প্রভুপাদ যা বলেছিলেন :

হরিকেশ : আপনি যদি নিজেই উৎকৃষ্ট না হন, তবে আপনার চেয়ে উৎকৃষ্ট কাউকে সংস্কৃতির শিক্ষা দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রভুপাদ : হ্যাঁ, প্রথমত, তোমাদের নিজেদেরই সংস্কৃতিসম্পন্ন ভদ্রলোক হতে হবে। চাণক্য পণ্ডিত ভদ্রলোকের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন– *মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।* সকল নারীকেই মায়ের মতো দেখা উচিত। শুধু নিজের স্ত্রী ছাড়া সকল নারীর সাথে মায়ের মতো আচরণ করা উচিত। ব্রহ্মচারীদেরও এভাবেই শেখানো হতো 'মা'। এটাই সংস্কৃতি। এখন তারা শুধু পরস্ত্রী বা অন্য স্ত্রীলোক হরণের চেষ্টা করে এবং তাদের নির্যাতন করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো সংস্কৃতিই নেই। *পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ*– অন্যের টাকাকে রাস্তায় পড়ে থাকা নুড়ি পাথর বলে বিবেচনা করা উচিত। এই দিকে কারো কোনো খেয়াল নেই। কিন্তু মানুষ

পরিকল্পনা করে কীভাবে অন্যের টাকা হাতিয়ে নেওয়া যায়। *আত্মবৎ সর্বভূতেষুঃ*– তুমি দুঃখ কিংবা সুখ যা-ই পাও, অন্যের কথাও বিবেচনা করা উচিত। যদি তোমার গলা কাটা হয়, তাহলে তোমার কি খুব ভাল লাগবে? তবে তুমি কেন অন্য প্রাণির গলা কাটছ? কোথায় সংস্কৃতি? কোনো সংস্কৃতিই নেই। শুধু প্রতারণা, চুরি, মূর্খতা আর বোকামি। কেউ বুঝেই না যে, সংস্কৃতি মানে কী? এ শ্লোকের তিনটি কথাতেই সংস্কৃতির শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।[১]

বৈদিক শাস্ত্রে 'পণ্ডিত' শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্যের এই শ্লোকের সাথে একমত পোষণ করেছেন। অন্ততপক্ষে শিক্ষার আদর্শের ভিত্তিতে পণ্ডিতকে বিচার করা উচিত। জড়জগতের পণ্ডিতেরা এবং তথাকথিত ধার্মিকেরাও এই বিচারে অযোগ্য বিবেচিত হয়। 'বুধ' শব্দটির অর্থ হলো শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পারদর্শী, কিন্তু শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ফলে কী হবে? যদি কেউ দাবী করেন যে, তিনি আত্মা সম্পর্কে জানেন, ভগবানকে ভালোবাসেন, তাহলে তার অন্তত এই শ্লোকের নিয়মগুলো অবশ্যই পালন করা উচিত।

বৈদিক সভ্যতায় এমনকি অসুরেরাও সদাচার পালন করে। তারা কোনো বিবাহিত মহিলাকে কামপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে না। যখন অসুরেরা ভগবানের ছদ্মবেশী মোহিনী মূর্তি দেখেছিল, তখন তারা তাকে অবিবাহিত জেনেই তার সামনে গিয়েছিল।[২]

একজন ভগবদ্ভক্ত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীত হন, কেননা এজন্য ভক্তি জীবনে পতন ঘটতে পারে। সেহেতু পুরুষদের প্রতি শাস্ত্রীয় বিধি হলো, নারীদের সাথে একা থাকা, সময় নষ্ট করা ইত্যাদি অনুচিত। "স্ত্রী সম্ভাষণ সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, ভোক্তা বা পুরুষ অভিমানে নিজের ইন্দ্রিয় ভোগ্য জ্ঞানে স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"[৩] এই নিয়ম কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ভক্তদের জন্যই নয় বরং সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই বলে নারীদের ঘৃণ্য বিবেচনায় অবহেলা করা উচিত নয় বরং তাদের মাতৃজ্ঞানে ভালোবাসা উচিত। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী আমাদের সপ্তমাতা রয়েছে– গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজপত্নী (রানী), গাভী এবং বসুন্ধরা।

একইভাবে নারীকেও তাদের স্বামী ব্যতিরেকে সকলকে পুত্র জ্ঞান করা উচিত। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী সাধারণত দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করেন। দিনের বেলা মাহিলারা প্রায়ই একা ঘরে থাকেন। মহিলারা তাদের পুত্রজ্ঞান করলে তারা কাম বাসনার দ্বারা প্রলুব্ধ হবে না।

"গৃহস্থের কর্তব্য হলো ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের নিজের পুত্র-জ্ঞান করা। ব্রহ্মচারীরা যদি ছোটবেলা থেকেই নারীদের মাতাজী বলে সম্বোধন করতে

শিখে, তাহলে তারা ভদ্রভাবে বেড়ে ওঠবে। যুবতী কিংবা বৃদ্ধা, ব্রহ্মচারী সকলকেই 'মা' বলে সম্বোধন করবেন।"[৪]

নারীদের বোন বলে সম্বোধন করার ভারতীয় প্রথাকে শ্রীল প্রভুপাদ নিন্দা করতেন। তিনি বলেছিলেন যে, বৈদিক সংস্কৃতিতে এমন প্রথা বলে কিছু নেই। দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল বলেই কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। দুর্যোধন, কর্ণ এবং অন্যরা মহীয়সী দ্রৌপদীকে মাতৃরূপে সম্মান করার পরিবর্তে সভাকক্ষে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে চেয়েছিলেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন কর্ণকে বধ করেছিলেন তখন একজন ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধনীতি অমান্য করে তাকে বধ করেছিলেন। কর্ণ যখন মাটিতে আটকে যাওয়া রথের চাকা তোলার চেষ্টা করছিলেন তখন অর্জুন তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কর্ণ এমনই শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন যে, অর্জুন ভাবছিলেন তাকে মনে হয় কোনোভাবেই জয় করা যাবে না। কর্ণ যখন অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তখন অর্জুন বলেছিলেন, "আপনি নিজে যখন অন্যায়ভাবে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিলেন তখন আপনি অন্যায় করেছিলেন, সেজন্য আপনাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা উচিত।"

ইতিহাসে নারীকে কেন্দ্র করে আরও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। হেলেনের কারণে ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। জাগতিক মানুষেরা স্ত্রী ও কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হলো, নারীর শক্তি ব্যতীত কোনো পুরুষই ব্যবসায় কিংবা যুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে পারে না। কেউ বলতে পারে, "নিজের স্ত্রী ব্যতীত সকল স্ত্রীকে মাতৃরূপে দেখা– চাণক্যের উপদেশ– পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিপ্লব। এই উপদেশ অনুসরণ করলে সভ্যতা আবেগহীন এবং প্রগতিহীন হয়ে পড়বে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য কোনো প্রণোদনা থাকবে না।" রাস্তায় পড়ে থাকা অন্যের সম্পত্তিকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় দেখা এবং সকল জীবকে সমানভাবে দেখা – চাণক্যের এই দুটি উপদেশ থেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে বলেছেন যে, স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিক প্রগতি বৃদ্ধি হয়। যাই হোক, এ সম্পর্ক শুধু স্ত্রী ও পরিবারের সাথে হওয়া উচিত, কোনো প্রকার অবৈধ সম্পর্কে নয়। যখনই আমরা সেই জনপ্রিয় প্রবাদ শুনি, "প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির পেছনে একজন নারীর অবদান রয়েছে"– তখন আমরা সেখানে বহু নারীর কথা চিন্তা করি না। আমরা সেই ব্যক্তির অত্যন্ত প্রিয় একজন নারীর কথা চিন্তা করি, যিনি তার পাশে থেকে তাকে সাহায্য করেছেন, এমনকি উপদেশ দিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, কলেজের অর্থনীতি ক্লাসে তিনি

শিখেছিলেন যে জাগতিক প্রগতির পেছনে রয়েছে পারিবারিক জীবন। সেজন্যই যে সকল ব্যক্তি পরিবারহীন, তারা অধিক কাজ পছন্দ করেন না। জীবনে অগ্রগতি লাভের শক্তি স্ত্রী এবং পরিবার থেকে আসে।

চাণক্যের কথাগুলো মূলত নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তার বিধি নিষেধগুলোর মানে কি- "জীবনে এগিয়ে যাওয়া।" সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত অনৈতিক আচরণ কখনই প্রগতির জন্য সহায়ক নয়। প্রগতি মানে পারমার্থিক জীবনের জন্য সময় সংরক্ষণ করা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এটা সম্ভব, যেখানে একজন মানুষ বিয়ে করে, সন্তান-সন্ততি সহকারে খুব সরল জীবন যাপন করে। গ্রামে কোনো গগনচুম্বি অট্টালিকা নেই। এটা কি খারাপ? সেখানে কোনো মহাসড়ক নেই, ভি.সি.আর. নেই। সকলেই প্রতিদিন গ্রামের গুরুদেবের কাছে শাস্ত্র কথা শ্রবণ করে। কোথায় আবেগ? কোথায় জাতীয়তাবাদ? ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতিযোগিতা নয় বরং শান্তিই একটি প্রেমময় পরিবারের অনুপ্রেরণার বিষয় হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য জগৎ অনৈতিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে যুদ্ধ, দূষণ, মাংসাহার এবং পরিণামে সম্পূর্ণ সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ মনোভাবের ফলে সকলেই ভীত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে। আমরা এত পরিমাণে আবর্জনা উৎপাদন করছি যে, বুঝতেই পারছি না এসব দিয়ে কী করবো। পরিণামে, আমরা এসবের নিচে তলিয়ে যাব। চাণক্যের নীতিকথাগুলো আমাদের আচরণকে সুন্দর একটি গণ্ডির মধ্যে রাখে, যা আমাদের আবেগময় উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ,একজন পণ্ডিত কখনো অন্যের সম্পত্তির প্রতি লালায়িত হন না। সভ্যজীবন মানে অন্যের সম্পত্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের ন্যায় মূল্যায়ন করতে শেখা। শ্রীল প্রভুপাদ মধ্যপ্রাচ্যের চোরদের হাত কেটে ফেলার উদাহরণটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন। আমরা যদি অন্যের সম্পত্তিকে আবর্জনা মনে করতে শিখি, তাহলে তা কেউ স্পর্শও করতে চাইবে না। কেবল হতদরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির লোকেরাই ময়লা আবর্জনাতে মূল্যবান সামগ্রী বা খাবার খোঁজাখুজি করে। কলিযুগের প্রভাবে কেউ ঐ রকম কাজ করতে পারে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, ময়লা সবসময়ই স্পর্শের অযোগ্য। অর্থাৎ কোনো উত্তম বস্তুও যদি অন্যের হাতে থাকে, তাহলে তা এভাবে দেখা উচিত।

'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'- কথাটির অর্থ পৃথিবীর সকল জীবকেই আমাদের নিজের মতো দেখা উচিত। "যেহেতু সকলের হৃদয়েই পরমাত্মা অবস্থান করেন, তাই সকলকে পরমেশ্বর ভগবানের মন্দির হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং কাউকেই নিকৃষ্ট জ্ঞানে অবহেলা করা উচিত নয়।"[৫]

বৈষ্ণব পরদুঃখে দুঃখী। যদিও বৈষ্ণব ব্যক্তিগতভাবে সবসময় সুখী, কিন্তু তিনি অন্যের দুঃখে ব্যথিত হন। একজন বৈষ্ণবের কোনো জীবের প্রতি একটুও হিংসা নেই। সমদর্শনের নীতি শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই নয় ক্ষত্রিয়দের জন্যও প্রযোজ্য। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন দেখেছিলেন যে গাভীকে প্রহার করা হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তরবারি নিয়ে অপরাধীকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হন। সমদর্শীতা শুধু একজন সাধুরই গুণ নয়, সরকারেরও উচিত সকল জীবের আধ্যাত্মিক প্রগতি বোঝা, যাতে তারা যথার্থভাবে বিচার করতে পারেন।

পণ্ডিত শব্দটি ব্যখ্যা করতে, আরও বিস্তৃত ও গভীর সংজ্ঞা রয়েছে। পণ্ডিত তিনি, যিনি ভগবৎপ্রদত্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন এবং নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তৎপর নন, তিনিই বিজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তি।"[৬]

জ্ঞানের তাৎপর্য হলো কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া। "এটা ভগবদ্গীতার সারভূত নির্যাস, 'আমি জড় ও চেতন জগতের সবকিছুর উৎস' সবকিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।"[৭]

পণ্ডিত ব্যক্তির আরেকটি গুণ হলো, তিনি জড়-জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার প্রতি নিরাসক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "যতক্ষণ তোমার এই জড় জগতের প্রতি এক বিন্দুও আকর্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সেজন্যই আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জড় জাগতিক বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হতে হবে।"[৮]

বর্তমানে যে কোনো পণ্ডিত নেই, তা দেখাতে প্রভুপাদ প্রায়ই চাণক্যের এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিতেন। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নারী ও পুরুষকে কুকুর-কুকুরীর মতো এক সাথে থাকার অনুমোদন দেয়। শ্রেণীকক্ষে "যৌন-দর্শন" শেখানো হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "একে বলা হয় শুকরের সভ্যতা। তারা সবকিছু খায় এবং খেয়াল-খুশি মতো যে কারো সাথে যৌনসঙ্গে লিপ্ত হয়।"[৯]

প্রযুক্তিগত শিক্ষা বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয় না। শিক্ষা মানে সংস্কৃতি। ভগবদ্গীতায় উল্লেখিত জ্ঞানের তালিকায় প্রথম বিষয়টিই হলো অমানিত্ব অর্থাৎ বিনম্রতা। জড়-জাগতিক লোকেরা তাদের জাগতিক উপাধি নিয়েই গর্বিত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, "যদিও তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিচ্ছে, কিন্তু তাদের বুদ্ধি মায়া কর্তৃক অপহৃত।"

একজন পণ্ডিত অন্যদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করেন। পণ্ডিত কাকে বলে তা

এই শ্লোকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "'আমি ভগবদ্ভাবিত' একথা বললেই হলো না। এর লক্ষণ রয়েছে– *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি*.........ভগবানকে শুধু ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁদের এ সমস্ত গুণ রয়েছে। ভগবদ্ভাবনা মানে এই নয় যে, আমাকে সুরক্ষিত এবং সুখী থাকতে হবে এবং অন্যরা অসুখী হবে।"[১০] প্রকৃতপক্ষে, যথার্থ শিক্ষা মানে কৃষ্ণভাবনা। "কেউ যদি ভগবদ্ভাবিত না হয়, তাহলে তার কোনো ভালো গুণই থাকতে পারে না।"[১১]

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, "এই আচরণ আমাদের সাধুচিত আচরণে প্রবৃত্ত করবে। তাহলে কি আমরা সকলেই সাধু হয়ে যাব?" হ্যাঁ, আমরা সাধু হব। সাধু-আচরণ ও আসুরিক আচরণের মধ্যবর্তী আরেক প্রকার আচরণ রয়েছে। সাধু-আচরণ করা অসম্ভব নয় তবে মধ্যবর্তী আচরণ করাও মন্দ নয়।

[১] প্রাতঃভ্রমণ, মরিশাস, অক্টোবর ২৫, ১৯৭৫।

[২] ভাঃ ৮/৯/৪।

[৩] চৈ.চ অন্ত্য ২/১৪৪ তাৎপর্য।

[৪] পত্র, বোম্বে, এপ্রিল ৫, ১৯৭৪।

[৫] ভাঃ ৬/৭/২৯-৩০।

[৬] পত্র, বোম্বে, এপ্রিল ১৮, ১৯৭৪।

[৭] ভগী ১০/৮।

[৮] পত্র, লন্ডন, জুলাই ২১, ১৯৭৩।

[৯] প্রাতঃভ্রমণ, বোম্বে, ডিসেম্বর, ১৯, ১৯৭৫।

[১০] প্রবচন, স্টকহোম, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭৩।

[১১] প্রবচন, স্টকহোম, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭৩।

শ্লোক– ১২

গুণৈঃ উত্তমতাম্ যাতি নোর্চ্চৈ আসন সংস্থিতাঃ।
প্রাসাদ শিখরস্থোহপি কাকঃ কিম্ গরুড়ায়তে ॥

গুণৈঃ– গুণের দ্বারা; ***উত্তমতাম্–*** সর্বোচ্চ; ***যাতি–*** লাভ করে; ***ন–*** না; ***উচ্চৈঃ–*** উচ্চতায়; ***আসন সংস্থিতাঃ–*** আসনের অবস্থান; ***প্রাসাদ–*** প্রাসাদ বা অট্টালিকার; ***শিখরস্থ–*** প্রসাদের ছাদে; ***অপি–*** যদি; ***কাকঃ–*** একটি কাক; ***কিম্–*** কীভাবে সম্ভব; ***গরুড়ায়তে–***বিষ্ণুবাহন গরুড়ে রূপান্তরিত হয়।

অনুবাদ

মহৎগুণের দ্বারাই কেউ মহৎ হয়, কেবল উচ্চপদ অধিকার করে নয়। কাক রাজ প্রাসাদের ছাদের ওপর বসতে পারে, তাই বলে সে গরুড় হয়ে যায় না।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে সকল রাজার উদাহরণ দিয়েছিলেন, যারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সাধুদের সভার তত্ত্বাবধানে রাজা নির্বাচিত হতেন। যদিও রাজা উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজসিংহাসন লাভ করতেন, তবুও তাকে সভা কর্তৃক প্রশিক্ষিত ও পরিচালিত হতে হয়। সভা রাজার আচরণে কোনো ভুল পেলে সংশোধন করত। ভুল খুব মারাত্মক হলে সভা রাজাকে সিংহাসনচ্যুতও করতে পারত।

এই শ্লোকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রীল প্রভুপাদ 'হিতোপদেশ' থেকে একটি গল্প বলেছিলেন। একবার এক শিয়াল নীল রংভর্তি একটি পাত্রে পড়ে গিয়েছিল এবং তারপর দেখতে নীল হওয়ায় সে নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিতে লাগল। বনের পশুরা কেউই তাকে চিনতে না পেরে তাকে রাজা বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু যখন আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো, তখন জঙ্গলজুড়ে শিয়ালের কোলাহলপূর্ণ হাক-ডাক শুরু হলো। রাজা সাজা সেই শিয়ালটিও তখন তার প্রবৃত্তি অনুসারে ডেকে উঠল। এভাবেই প্রকাশিত হলো তার আসল পরিচয়, আসলে সে কে? শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "কাউকে উচ্চ পদে উন্নীত করা হলেও তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। তুমি যদি কুকুরকে রাজার পদে অভিষিক্ত কর, তবে সে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ত্যাগ করে জুতা কামড়াতে শুরু করবে।"[১]

এ শ্লোক থেকে বিভিন্ন দর্শন উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ– একজন

জাগতিক ব্যক্তি কোনো যোগ্যতা ছাড়াই উচ্চপদে আসীন হয়েছে, তবে তার কি পদত্যাগ করা উচিত? তা নির্ভর করে ক্ষেত্রবিশেষের ওপর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার পদত্যাগ করা উচিত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার উচিত সেই পদের জন্য উপযুক্ত গুণ অর্জন করা।

কোনো ভক্ত যদি এমন কোনো পদে উন্নীত হন, যেখানে নিজেকে তিনি অযোগ্য মনে করেন, তবে তিনি কী করবেন? এক্ষেত্রে কি তার পদত্যাগ করা উচিত? তা নির্ভর করে কীভাবে তিনি সেই পদে উন্নীত হয়েছেন। যদি গুরুদেব অথবা বৈষ্ণবগণ তাকে বিশেষ সেবা প্রদান করেন, তাহলে তা বিনীতভাবে পালন করা উচিত, বিনয় দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। বিনম্রতা মানে বিনীত ভাবে সেবা করা এবং গুণাবলী অর্জন করা।

গুরুদেবের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেকেউ অবশ্যই বলবেন, "গুরুদেবকে শিষ্য গ্রহণের পূর্বে পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় তা একপ্রকার নিষ্ঠুরতা।" আমি অবশ্য এর সাথে একমত নই। অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই প্রত্যেকে শুরু করে, তবে তাদেরও অবশ্যই প্রাথমিক বা নূন্যতম কিছু যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। গুরুদেব শিখতে পারেন এবং আরও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারেন– এটি চিন্তা করা লজ্জাজনক হবে কেন? এরকম তো আরও পদ আছে।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন পুলিশ হয়, তখন তাকে একটি ইউনিফর্ম এবং একটি বন্দুক দেওয়া হয়। কিন্তু শুরুতে সে অবশ্যই অনভিজ্ঞ থাকে। নতুন ভর্তি হওয়া অনভিজ্ঞ সেনা বলে সবাই তাকে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য হতে সাহায্য করে। সৈনিকের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাকেও শুরুতে ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। তারপর তাকে মৌলিক বিষয়গুলো শেখানোর জন্য বুট-ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। সবকিছুর পর সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পাকাপোক্ত হয়ে প্রকৃত সৈনিকে পরিণত হয়। এসব জাগতিক উদাহরণ হলেও পারমার্থিক বিষয়কেও একইভাবে দেখা যেতে পারে। কারোরই নিজের কার্যক্ষেত্রে নিজেকে অভিজ্ঞ বলে ভান করা উচিত নয়, বরং নিজেকে অযোগ্য ভাবা উচিত। ভক্তরা তার গুরুদেবের ওপর নির্ভর করে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের কর্মের আরও গভীর অর্থ উপলব্ধি করে।

শুধু গুরুদেবই নন সকল ভক্তকেই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। মন্দির প্রধান, জিবিসি, রাধুনী, পূজারী, গ্রন্থ প্রচারক সকলকেই সেবাচর্চার মাধ্যমে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়া উচিত। যোগ্য হতে হলে তাকে শুধু কর্মক্ষেত্রের সম্মান নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না। ব্যবস্থাপনা, প্রচার এমনকি গুরু ভাই ও বোনদের সাথে সম্পর্কিত হতে শেখার জন্য যা করা প্রয়োজন, তা করতে

হবে। একজন ভক্ত অনুভব করতে পারেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাকে শিষ্যগ্রহণ করতে বলেছেন। যখন তিনি প্রথম শিষ্য গ্রহণ করবেন, তিনি শিষ্যকে তাঁর গুরুদেবের সাথে যুক্ত করবেন। তিনি সব সময়ই তাঁর গুরুদেবের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং কঠোরভাবে নিয়মনীতিগুলো অনুসরণ করবেন।

এমন ভক্তদের বিষয়টি গরুড়ের ভান করা কাকের মতো নয়। আমরা গরুড়ের অনুপস্থিতিতে কাককেই ভগবানের বার্তাবাহক বলে স্বীকার করতে পারি। তখন তিনি নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতে পারেন এবং নিজের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে পারেন।

তাহলে কোনো পরিস্থিতিতে যোগ্যতাহীনকে পদত্যাগ করতে হবে? যদি তার যোগ্যতাহীনতার কারণে, তাকে কুৎসিত আচরণ করতে হয়, কিংবা তার সেবাকে অবহেলা করতে হয় অথবা তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে, তবে ঐ সেবায় ভক্তের যুক্ত হওয়া উচিত নয়। তাকে সেই পদ ধরে রাখার জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, বরং তা ত্যাগ করা উচিত। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদত্যাগের সময় শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সাথেই ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন, "কী বোকামী! তিনি অনেক ভুল করেছেন তা প্রমাণিত হয়েছিল এবং জনগণ তাকে তার পদ থেকে টেনে নামাতে চেয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি পদত্যাগ করেননি। বৈদিক সভ্যতায় এটি মস্ত বড় মূর্খামী। এভাবে ভাবলেই তিনি পদত্যাগ করতেন।

চাণক্যের এই শ্লোকে খুব সুন্দর একটি ছবি ফুটে উঠেছে। এর সিদ্ধান্ত মতে, কাক দুর্ঘটনাবশত বা হঠাৎ রাজপ্রাসাদের ওপর বসেনি বরং সে নিজেকে গরুড়ের মতো ভালো চিন্তাশীল মনে করে বলেই রাজপ্রাসাদের ওপর বসেছে। কাক অন্যায়ভাবে গরুড়ের স্থান দখল করেছে। শ্রীল প্রভুপাদ একে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে তুলনা করেছেন, "যেকোনোভাবেই হোক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তারা পদ দখল করে।"[২] যারা এসব পদের জন্য ছোটাছুটি করছে, তারা কেউ যোগ্য নয়, বরং ভোট চুরি করে কিংবা অন্য যেকোনোভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের পদ দখল করে।

ভক্তরা গরুড়ের চিন্তা করলেও আমরা মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের কথা বলছি। গরুড় ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত। তিনি ভগবানের পক্ষীবাহন। মহৎগুণের জন্যই তাঁকে মন্দিরে স্থান দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে পারেন। যদি কাক সেই স্থানে বসে, তাহলে সে গরুড় হয়ে যায় না। তেমনই কোনো মূর্খ যদি সিংহাসন বা সরকারের পদ দখল করে, তাহলেই সে যোগ্য হয়ে যায় না। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের শুধু এটি দেখলে চলবে না যে, কে হোয়াইট হাউজে ঢুকতে

পেরেছে, বা ব্যাসাসনে বসেছে বা মন্দিরের প্রধান হতে পেরেছে, বরং দেখতে হবে যে সে কী করছে বা সেই পদের জন্য তার যোগ্যতা কীরূপ?

কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে, "উচ্চপদ কি দুনীর্তিকে উদ্বুদ্ধ করে?" এটা সত্য যে, ক্ষমতা দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়। এখনও যদি আমরা দুর্নীতি না করি, তবে বিনীতভাবে সেবা বা অন্যদের জন্য ভালো কিছু করে যাওয়ার অনেক সুযোগ থাকবে। আমি মনে করি না যে, ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা মানুষকে চূড়ান্তভাবে দুনীর্তিগ্রস্ত করে। যদি কারো সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে, তবে তো তিনি শ্রীকৃষ্ণ। গুরুদেব সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের পক্ষ থেকে করেন, কখনো নিজের বলেও দাবী করেন না। কেননা তিনি কৃষ্ণের অসীম শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন বলেই শিষ্যেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাই তিনি যেন শুধু কৃষ্ণ সম্পর্কিত কথাই বলেন। যদি তিনি এর ব্যতিক্রম করেন, তবে খুব তাড়াতাড়িই জাগতিক শক্তি তার ক্ষমতা কেড়ে নিবে।

গুরুদেব জানেন যে, তার শিষ্যেরা স্বেচ্ছায় তাঁর সেবা করে। তিনি শিষ্যদের প্রতি সদয় থাকেন, যতক্ষণ কঠোরতার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তিনি অবশ্যই শিষ্যদের প্রতি দয়ালু এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন। এদিক থেকে তার ক্ষমতা অসীম নয়। যদি শ্রীল প্রভুপাদের অসীম ক্ষমতা থাকত, তবে তাঁর অনেক শিষ্য কেন তাঁকে ত্যাগ করেছিল? শিষ্যের উপর গুরুদেবের কর্তৃত্ব নির্ভর করে শিষ্যের আত্মসমর্পণের ওপর। গুরুদেব কৃষ্ণের অসীম ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করেন শুধু তাদের জন্য যারা তাকে অনুসরণ করেন। এভাবে তাকে অনুসরণ করেই শিষ্যেরা পারমার্থিক জীবনে সফলতা অর্জন করে।

আমি জানি কিছু ভক্তের এই ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আমরা তাদের এমনও বলতে শুনি, "উনি ভালো ভক্ত ছিলেন। কিন্তু যখনই মন্দিরের প্রধান হলেন, তখনই তার মধ্যে অহমিকা দেখা দিল।" সন্দেহপ্রবণতা তার প্রতি সকলকে আস্থাহীন করেছিল। তারা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় মনে করে না। তবে আমি এর সাথে একমত নই। যেহেতু আমি পূর্বেই বলেছি যে, সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিনম্রতা এবং আত্মসমর্পণ করতে শেখা যায়। সেজন্য আধ্যাত্মিক দিক থেকে তা কোনো ব্যাপার নয় যে, কেউ কর্তৃপক্ষের আসনে বসলেই দুর্নীতি পরায়ণ হবে। অন্যথায় কীভাবে এই পরম্পরা টিকে আছে? তাহলে যে সমস্ত ভক্ত উচ্চপদ বা ক্ষমতার অধিকারী নন, তারা দুনীতি পরায়ণ হবেন না, তাও সত্য হতে পারে না।

এই শ্লোকটি প্রত্যেক পর্যায় থেকেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শুধু ক্ষত্রিয়দেরই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে এমন নয়, বরং সকল বর্ণের জন্যই যোগ্যতা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ– ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাপনার গুণ নেই। কিন্তু তার মধ্যে অপরাধীকে ক্ষমা করা, নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী হওয়া, জগতে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভে ক্ষণস্থায়ী পদের জন্য লালায়িত না হওয়া প্রভৃতি গুণ রয়েছে। চাণক্য পণ্ডিত নিজেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কোনো পদ অধিগ্রহণ করেননি। যদিও তিনি মহারাজের উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের সুবিধার জন্য তার ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার করেননি। এটা হচ্ছে তাদের সহজাত ক্ষমতা, বৈরাগ্যের ক্ষমতা।

[১] কক্ষে আলোচনা, ইন্দোর, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭০।

[২] পত্র, লস্ এঞ্জেল্স, ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৩।

শ্লোক ১৩

ঋণ শেষ' অগ্নিশেষশ্চ ব্যধিশেষ তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্ধতে যস্মাৎ তস্মাৎ শেষম্ চ কার্যেত ॥

ঋণ শেষঃ– ঋণের শেষ; ***অগ্নিশেষঃ–*** অগ্নির শেষ; ***চ–*** এবং; ***ব্যধিশেষঃ–*** ব্যধির সমাপ্তি; ***তথা–*** তাই; ***এব–*** অবশ্যই; ***চ–*** এবং; ***পুনঃ–*** পুনরায়; ***চ–*** এবং; ***বর্ধতে–*** বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ***যস্মাৎ–*** যার থেকে; ***তস্মাৎ–*** তাই; ***শেষম্–*** সমাপ্তি; ***চ–*** এবং; ***কার্যেত–*** বাস্তবায়িত হয়।

অনুবাদ

অগ্নি, শত্রু এবং রোগব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা উচিত, অন্যথায় তা বাড়তেই থাকবে।

তাৎপর্য

একবার ভেনিস বীচে প্রাতঃভ্রমণকালে এক শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদকে বললেন, "আজ মহাসাগরের ঢেউ অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বড়।"

শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বললেন, "বড় হোক কিংবা ছোট হোক তা সবসময়ই ভয়ংকর।" চাণক্য পণ্ডিত উদাহরণ দিয়েছেন : আগুন, ঋণ এবং রোগ এদের কখনোই বড় কিংবা ছোট ভাবা উচিত নয়। এসব সবসময়ই ভয়ংকর। আপনি যদি কোনো স্থান থেকে ঋণগ্রহণ করেন, এর সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে এত বৃদ্ধি পাবে যে, একদিন তা আর আপনি পরিশোধ করতে পারবেন না। তেমনি আগুন প্রথমদিকে স্ফুলিঙ্গের মতো হলেও ক্রমান্বয়ে তা লেলিহান শিখায় পরিণত হতে পারে। রোগব্যাধিও তেমনই। এখন এখানে সামান্য ব্যাথ্যা, কিন্তু তা বেড়ে যক্ষায় রূপান্তরিত হতে পারে। সেজন্যই কখনো আগুন, ঋণ ও রোগকে অবহেলা করা উচিত নয়, এসব সর্বদা ভয়ংকর।"[১]

এই কথাগুলো খুব সহজবোধ্য মনে হলেও মানুষ স্বভাবতই প্রথম প্রথম এ ক্ষুদ্র বিষয়গুলো অবহেলা করে। ধূমপায়ীরা মনে করে সিগারেটের অবশিষ্ট আগুন আপনা আপনি নিভে যাবে। অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগলেও কেউ ডাক্তারের কাছে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ঋণ যেমনই হোক তা তাড়াতাড়ি পরিশোধ করতে হবে। সকলেই কোনো না কোনোভাবে ঋণী এবং সবাই চায় তাড়াতাড়ি ঋণমুক্ত হতে। সেজন্য আমাদের প্রতি চাণক্যের উপদেশ, কোনো সমস্যা সমাধানের অনুপযোগী হওয়ার পূর্বেই তা যেন নিরসণ করা হয়।

যদিও চাণক্যের কথাগুলো জাগতিক সমস্যার সমাধান দেয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনেও এর ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো দীক্ষিত ভক্ত

যদি কোনো একদিন ষোল মালা জপ করতে অবহেলা করে, তাহলে সে হয়ত তা তেমন গভীরভাবে নেবে না। তেমনি একজন ভক্ত হয়ত ভক্তিজীবনে তার চূড়ান্ত প্রভাব না বুঝে কথা বলার মাধ্যমে অন্য ভক্তের চরণে অপরাধ করতে পারে অথবা পুরুষ ও নারীর মধ্যে লোকদেখানো ভালোবাসা দেখানো হতে পারে, কিন্তু তাতেও হৃদয়ে বাসনার বীজ রোপিত হতে পারে। প্রতিটি ঘটনাই এমন– আগুন, ঋণ রোগের মতোই ভয়ংকর। ভক্তরা উপলব্ধি করতে পারে না যে, প্রকৃত শত্রু তার নিজের সাথেই ক্রোধ, লোভ ও কামরূপে রয়েছে এবং সে তাদের নির্মূল না করে বরং অবজ্ঞা করে।

প্রতিদিন ষোলমালা জপ না করলে, নিজের অজান্তেই তা করার অভ্যাস হয়ে উঠবে। সর্বোপরি আমাদের আরও অনেক সেবা রয়েছে। আমরা না জেনেও হয়তো দীক্ষার মূলপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি। হয়তো খেয়ালিপনায় কোনো বৈষ্ণবের চরণে মত্তহস্তী স্বরূপ বৈষ্ণব অপরাধ করতে পারি। পুরুষ ও নারীর দেখানো ভালোবাসার মধ্যে মায়াদেবী আমাদের প্রবৃত্তি পরীক্ষা করে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য আরও অধিক সুযোগ প্রদান করে। তখন আমরা পতিত হই এবং ফলশ্রুতিতে দুঃখভোগ করতে হয়। এই ছয় শত্রু – যা অনিয়ন্ত্রিত মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থান করে, সেগুলোকে অবজ্ঞা করলে বা ভক্তিযুক্তসেবায় যুক্ত না করলে জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। যেসমস্ত ভক্ত এভাবে পতিত হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই এসব ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের এমন অভিজ্ঞতাই চাণক্যের শ্লোক প্রমাণিত করে, "শুরুতে আমার কিছু সমস্যা ছিলো, কিন্তু আমি সেগুলো গুরুত্বের সাথে নিইনি।"

অনেক সময় ভক্তরা সরলভাবে এসব সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে কৃষ্ণের জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করছে। আমিও সরলভাবে বলি, এর মানে হচ্ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেওয়া। আমাদের এমন চিন্তা করা উচিত নয়, যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করছি, তাই প্রচার বা সেবার নাম করে সূক্ষ্ম ভুলগুলো আমরা অবজ্ঞা করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ একজন ভক্ত তার অন্যান্য সেবা পূর্ণ করার জন্য কিছু সময়ের জন্য তার সাধনা শিথিল করতে পারে। সাধারণত প্রভুপাদ ম্যারাথনের সময় এমনটি হয়ে থাকে। এটা মূলত বিচ্যুতি নয়, তবে তা সম্পূর্ণরূপে ভক্তের মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। তাই বলে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে শক্তি ও সময় দেওয়ার নাম করে সাধনায় শিথীলতা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ শারীরিক অসুস্থতার প্রতি দুই রকম মতামত পোষণ করতেন। একদিক থেকে তিনি ভক্তদের রোগ নিরাময়ের জন্য উৎসাহিত করতেন, আবার অপর দিক থেকে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য শরীরের ঝুঁকি

নিতে বলতেন। অনেকেই আবার এমনই স্বাস্থ্যসচেতন যে, দেহের সামান্যতম পরিবর্তনও খেয়াল করতে থাকে তার সকল চিন্তাই ঐ কেন্দ্রিক করে তোলে। একজন ভক্ত হিসেবে দেহের প্রতি অধিক চিন্তা করা সাধারণত ঠিক নয়, কিন্তু তাই বলে দেহকে অবহেলা করাও উচিত নয়। আমাদের এভাবে চিন্তা করা উচিত নয় যে একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলে অপরটি বাদ পড়বে। যদি কোনো ভক্ত প্রচারের জন্য শরীরিক ঝুঁকি নেয়, তবে যেন কোনো মহাত্মার অনুকরণ না হয়। ঝুঁকি অবশ্যই বিবেচনাপূর্বক নেওয়া উচিত।

আমাদের ঝুঁকি নিতে হতে পারে এবং প্রচারের জন্য কোনো কিছু ক্রয়ের জন্য ঋণও গ্রহণ করতে হতে পারে। চাণক্যের কথায় আমাদের কি ঋণগ্রহণ করা অনুচিত? কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারি, সেক্ষেত্রে কৃষ্ণই আমাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু তবুও ঝুঁকি বারবার সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত, কেননা আমরা একটি সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছি। তবে ঋণ গ্রহণ করা কোনো নীতি হওয়া উচিত নয়।

কারোরই মনে করা ঠিক নয় যে, এসব ছোট ছোট বিষয়গুলো ভক্তিজীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। যখন আমি এই বইটি নিয়ে কাজ করছি বলে জানিয়েছি, তখন এক ভক্ত জানায় যে সে চাণক্যের উপদেশের দ্বারা বিভ্রান্ত, কেননা তিনি উচিত অনুচিতের দীর্ঘ তালিকায় আরও কিছু যোগ করছেন। আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী এসব নীতি নিয়ম থেকে আমরা কি একটু বিরতি নিতে পারি না? যাইহোক মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের সেবা, এইসব নীতি নিয়ম নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ এই নীতিগুলো ব্যবহার করতেন, কেননা তিনি মনে করতেন তা আমাদের জন্য উপকারী হবে। কেউ যদি মনে করে সে এই নিয়মকানুন হতে অব্যাহতি নিবে, তাহলে খেয়াল রাখা উচিত যে সে শুদ্ধভক্তি এবং আত্মসমর্পণ হতেও অব্যাহতি নিচ্ছে। আমরা যখন থেকে জড় জগতে এসেছি তখন থেকেই এরকম নিয়মকানুন বর্জন করছি। জড়া প্রকৃতি আমাদের ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে। তাই ভালো হবে যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের নীতি অনুসরণ করতে পারি এবং বিধি-নিষেধ এড়ানোর পথ না খুজে আত্মসমর্পণ করি। মুলত নীতিনিয়ম মানে আমাদের বাধা প্রদান নয়, বরং যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ভক্তিজীবন অনুশীলনে বাধা দান করে তা থেকে আমাদের মুক্ত করা। আমাদের উদ্দেশ্য হলো পারমার্থিক উন্নতি। চাণক্য বলেন যে, আমরা দিনরাত ধর্ম আচরণ করার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে পারি এবং এজন্য জড় জগতের অনিত্যতা স্মরণ, অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং সাধুসঙ্গ করা প্রয়োজন। যারা পারমার্থিক উন্নতির প্রতি অনাগ্রহী তারা বিধি-নিষেধের বাইরে অন্য কিছু শুনতে চায়– হ্যাঁ, তুমি চকলেট খেতে পারো, অথবা হ্যাঁ, তুমি সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছা ছাড়াও স্ত্রীর

সঙ্গে মিলিত হতে পার। কিন্তু তা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। বিধি নিষেধের মাঝে ফাঁক খোঁজা মানে, জীবনে এসব জাগতিক নীতি অনুসরণে প্রতিকূল মনে করা। নিয়মভঙ্গ না করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার জন্য প্রায় শতাধিক উপায় রয়েছে কিন্তু আমরা এমনটি করতে চাইব কেন?

আমাদের বর্তমান অবস্থায় বৈধী ভক্তি পালন করতে হবে। এজন্য উৎসাহী হতে হবে। আমরা কোনোরকম ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা থেকে মুক্ত রাগানুগা ভক্তি অনুশীলন করতে পারি না। তাতে পতন হতে পারে। সেজন্য আমরা গুরু, শাস্ত্র এবং কোনো কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করি, যাতে মন ও ইন্দ্রিয় জয় করে রাগানুগা স্তরে উপনীত হতে পারি।

এক্ষেত্রে চাণক্যের উক্তিগুলো আমাদের ভক্তিপথের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে সাহায্য করতে পারে। কোথাও আগুন লাগলে যত দ্রুত সম্ভব তা নেভানো উচিত। তোমার ঋণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করো। হৃদয়ে এই ছয় প্রকার শত্রুকে প্রশ্রয় দান করো না। সময়মতো কাজ করো, অপেক্ষা করলে অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে। এ তো স্বাভাবিক জ্ঞান।

একটি স্বাভাবিক জ্ঞান হলো, "অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।" ইস্‌কনের প্রারম্ভিক সময়ে এই কথাটি খুবই ব্যবহৃত হতো। যদি কেউ সামান্য মায়াগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করতো তৎক্ষণাৎ আমরা বলতাম একে অঙ্কুরে বিনষ্ট করো। পরিণত ভক্ত হয়ে পতনের চেয়ে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে সংশোধন করা সহজ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "পতনের তিনটি ধাপ রয়েছে: চিন্তন, অনুভতি ও ইচ্ছা। চিন্তার স্তর থেকে বন্ধ করাই সর্বোত্তম। যদি সেটা অনুভূতি কিংবা ইচ্ছার স্তরে পৌঁছায় তাহলে আরও কঠিন হয়ে দাড়াবে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর একটি প্রবচনে এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি করে বলেছিলেন, "সবকিছুই আমাদের জ্ঞানের জন্য, আমরা যদি অনুসরণ করি। কোনো কিছুই কঠিন নয়। সেজন্য আমাদের পদ্ধতি হলো মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশই হোক বা পরম সত্য বা বৈদিক জ্ঞানই হোক আমাদের অবশ্যই গুরু পরম্পরাক্রমে তা অনুসরণ করা উচিত। এটাই নির্ভরযোগ্য পন্থা এবং আমাদের স্থুল ও সূক্ষ্ম ত্রুটির ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ। যদি আমরা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করি, তবে অনেক দুঃখ এবং সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো। ভুলের মাধ্যমে শেখার প্রয়োজন নেই। আমরা যদি শ্রৌত পন্থায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করি, তবে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় খুঁজে পাব।

[১] প্রাতঃভ্রমণ, লস্ এঞ্জেল্স, এপ্রিল ২৬, ১৯৭৩।

শ্লোক ১৪

নির্গুণেষু অপি সত্ত্বেষু দয়াম কুর্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরন্তে জ্যোৎস্নাম্ চন্দ্রশ্চণ্ডাল-বেশ্মানি ॥

নির্গুণেষু– মুল্যহীন; ***অপি***– এমনকি; ***সত্ত্বেষু***– জীবাত্মা; ***দয়াম্***– করুণা; ***কুর্বন্তি***– প্রদর্শন করে; ***সাধবঃ***– সাধু ব্যক্তিরা; ***ন***– না; ***হি***– অবশ্যই; ***সংহরন্তে***– ঠেকিয়ে রাখা; ***জ্যোৎস্নাম্***– উজ্জ্বল প্রভা; ***চন্দ্রঃ***– চাঁদ; ***চণ্ডাল-বেশ্মানি***– চণ্ডালের গৃহ থেকেও।

অনুবাদ

সাধুগণ সকল জীবকে তাঁদের কৃপা প্রদান করেন, এমনকি যাদের সদ্‌গুণ নেই তাদেরও, ঠিক যেমন সমাজচ্যুত ব্যক্তির গৃহে আলো বিতরণ করতে চাঁদ বিরত হয় না।

তাৎপর্য

প্রকৃতি অত্যন্ত উদার। এর সাথে সাদৃশ্য বিচার করলে আমাদের চেতনা বিস্তৃত হতে পারে। চাঁদ এতোই উদার যে, সে তার আলোক চণ্ডালের গৃহেও প্রদান করে। আমাদের চূড়ান্ত বিচারে অস্পৃশ্য লোকদের বর্ণপ্রথা থেকে বাদ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে এ উপমার গুরুত্ব তো আরো বেশি। মানুষ পাপী বা নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু চাঁদ কোনো পার্থক্য করে না। শ্রীল প্রভুপাদও বলেছেন, "সূর্য কোনো দূষণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না বরং সূর্যালোক ডোবাকে আলোকিত পরিশুদ্ধ করে।"

যদিও এ শ্লোকে কোনো পারমার্থিক কৃপার কথা বলা হচ্ছে না। তবুও আমরা সেটি আমাদের মতো করে ব্যবহার করে পারমার্থিকতায় পর্যবসিত করতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়েছিলেন, "বৃষ্টি সর্বত্রই সমভাবে পড়ে। শুধু ভূমিতে নয়, সমুদ্রেও বৃষ্টি হয়। তেমনই ভগবৎচেতনাময় আন্দোলন কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা স্থানের জন্য নয়। ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত শুধু হিন্দু বা ভারতবাসীর জন্য নয়, এটি সকলের জন্য।"[১]

বৃষ্টির উদাহরণটি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শরৎ ঋতুর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। "বর্ষার মেঘের জল বিতরণ এতই উদারতার সাথে হয় যে, তাকে মহাবদান্য ও উদারচিত্ত মানুষের ধন বিতরণের সাথে তুলনা করা হয়। প্রয়োজন থাক বা না থাক, বর্ষার মেঘ যেমন সর্বত্রই জল বর্ষণ করে– এমন কি পাহাড়, পাথর, সাগর, মহাসাগরসহ যেখানে জলের কোনো প্রয়োজন নেই, সেখানেও বর্ষণ হয়। উদারচিত্ত দাতা যখন তাঁর কোষাগার উন্মুক্ত করে দান করতে থাকেন, তখন তিনিও বিচার করে দেখেন না যে, তাঁর সে দানের কারো প্রয়োজন অছে কি নেই। তিনি মুক্তহস্তে দান করে চলেন।"[২]

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনরূপ কৃপা এই শ্লোকের যথার্থ উদাহরণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করেছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ সর্বত্র অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন, এমনকি পতিতাধম জগাই-মাধাইকেও। তাই মুক্ত ও সাধু পুরুষদের আর কি কথা।"[৩]

"কে চাইল আর কে চাইল না, কে তা গ্রহণে সমর্থ, কে অসমর্থ, সে বিবেচনা না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিবৃক্ষের ফল বিতরণ করলেন।"[৪]

শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য : এটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের সারমর্ম। কে এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করতে সক্ষম, আর কে সক্ষম নয়, সেই রকম কোনো বিচার নেই। তাই কোনো রকম বিভেদ বা বৈষম্যের বিচার না করে, এই আন্দোলনের প্রচারকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো রকম ভেদাভেদের অপেক্ষা না করে প্রচার করে যাওয়া। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন।

পতিতদের কৃপা করলে যে তারা পতিতই থাকবে তা নয়। শ্রীল প্রভুপাদ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলেছেন। পাশ্চাত্যবাসীরা দেখতে রুক্ষ ও নোংরা হলেও তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে পরিচ্ছন্ন, উৎকৃষ্ট ও সুখী হয়েছিল। তিনি তাদের ময়ূরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা ময়ূর শরৎকাল উপস্থিত হলে নৃত্য করতে শুরু করে।

এই শ্লোকটি গ্রন্থপ্রচারকদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। গ্রন্থ প্রচারের সময় বিচারপূর্বক বা সংকীর্ণমনা হয়ে প্রচার করা উচিত নয়। কোনো পার্থক্য বা বৈষম্য না করে সকলের কাছে প্রচার করা উচিত। ভক্তরা প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ খুঁজে বের করে, যাদের কাছে প্রচার করলে বেশি সফল হওয়া যায়। আর এমন বিচার করে যে, একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিই শুধু গ্রন্থ প্রচারের জন্য উপযুক্ত, তারা মানুষের বড় একটি অংশকে বাদ দিচ্ছে। গ্রন্থ প্রচারের ক্ষেত্রে তা গতানুগতিক ধারণা এবং এই গতানুগতিক ধারণা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের, তিনি অকাতরে তাঁর কৃপা বিতরণ করতে চেয়েছিলেন।

আমরা উদার হলে, শ্রীল প্রভুপাদ এবং মহাপ্রভু উভয়ই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। "অপ্রাকৃত মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অঞ্জলিভারে চতুর্দিকে সেই ফল বিতরণ করলেন, আর দরিদ্র, ক্ষুধার্তরা যখন সেই ফল খেলেন, তখন তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মালাকার হাসলেন।"[৫]

এই কৃপা শুধু পতিত জীবদের জন্যই নয় বরং সকল প্রাণীর জন্য। "জীবজন্তু এবং নিম্ন প্রজাতির জীব অবশ্যই এই আন্দোলন বুঝতে পারবে না। তবে কেউ

যদি গুরুত্ব সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তবে তাদের উচ্চৈঃস্বরে নাম জপের কারণে এমনকি বৃক্ষ, পশুপাখি বা নিম্ন প্রজাতিও উপকৃত হবে।"[৬]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "যদি এই ভগবৎ-প্রেমরূপী ফল বিশ্বব্যাপি বিতরণ করা হয়, তাহলে সকলেই তাঁর গুণগান করে আনন্দিত হবে। শ্রীল প্রভুপাদ এই বাণী সার্থক করেছেন, কিন্তু তবুও আরও অনেক প্রচার করতে হবে। *'ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার; জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার।'* "যারা ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের জন্ম সার্থক করে পরোপকার করা।"[৭]

এমন কোনো ভক্তের উদাহরণ কি আছে, যিনি কাউকে তার কৃপার অযোগ্য মনে করেন? একজন মহাভাগবত সকলকেই কৃপার পাত্র হিসেবে দেখেন। মধ্যম অধিকারী প্রচারক অসুর এবং নিষ্পাপের মধ্যে পার্থক্য করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন মহাভাগবত এবং তিনি তার কৃপা জগৎব্যাপি প্রসারে সক্ষম ছিলেন। আমাদেরকে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই অপার কৃপা উপলব্ধি করতে হবে। কে কৃপার উপযুক্তপাত্র এই প্রকার চিন্তা ভাবনা দূর করতে হবে। তবুও ভক্তরা নিজেরা কতটুকু সাহসী যে, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যাখ্যানকারী অসুরদেরও সেই কৃপা প্রদান করবে। তারা শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না হিংস্রতা বা প্রতিক্রিয়াও দেখায়। মধ্যম অধিকারী ভক্তের উচিত এই ধরনের ব্যাক্তিদের কাছে প্রচার করা থেকে বিরত থাকা। এর ফল সাধারণত আশাব্যঞ্জক হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে তার শিষ্যদের এভাবে শিক্ষা দিতেন। প্রভুপাদের একজন শিষ্য যিনি বারবার পতিত হয়েও ফিরে এসেছিলেন। একবার তিনি ফিরে এসে কান্না করতে করতে প্রভুপাদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি ফিরে আসতে চাই।" প্রভুপাদ বললেন, "না, তুমি অনেক অভিজ্ঞ তাই আমার সব কৃপা ত্যাগ করেছ। আমি তোমাকে আর কৃপা করতে পারি না। তুমি আমাকে কৃষ্ণের কাছে অনেকবার লজ্জিত করেছ।" যেখানে কেউ নিজেকে আশাহীন বা আস্থাহীন বলে প্রমাণ করে তাকে কৃপা করা মানে হরিনামের প্রতি নবম অপরাধ করা।

যদিও আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা চাঁদের মতো অকাতরে বিতরণ করতে চাই, কিন্তু আমাদের নিজেদের ক্ষমতাও বিবেচনা করা উচিত। আমরা অবশ্যই চাঁদের মতো ক্ষমতাধর নই। শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই হলেন চন্দ্র। আমাদের সেবা সেই চন্দ্রালোক বিশ্বব্যাপি বহন করা, তবে অনুকরণ করা উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রেম অকাতরে বিতরণে তাঁরা অচিন্ত্য শক্তির অধিকারী। আমাদের যতটুকু সম্ভব বৈষম্যহীন হতে চেষ্টা করতে হবে এবং ভয় ও ত্রুটিগুলো দূর করতে হবে, তবে যারা ভগবৎনিন্দুক, অপরাধী বা অবিশ্বাসী তাদের কাছে কখনই হরিনাম প্রচার করা উচিত নয়।

অন্যদের কাছে প্রচার করার পাশাপাশি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা নিজেদেরও গ্রহণ করা উচিত, যা আমাদের উপর বিকিরিত হচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, সূর্য উঠলে পেঁচার মতো ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। আমাদের এই সুযোগ ও কৃপার্শীবাদ গ্রহণ করা উচিত।

আমরা ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে এই কৃপা লাভ করতে পারি। যদি আমরা বেশি সময় ঘরের মধ্যে থাকি, তাহলে বাইরে বের হতে ভীত হবো। আমরা ইন্দ্রের মতো হয়ে যাব, ইন্দ্র একবার অভিশপ্ত হয়ে শূকর-যোনী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি জড়-জগতের মোহে স্বর্গে ফিরে না গিয়ে শূকর হয়ে খোয়াড়ে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। কৃপা গ্রহণে অবহেলাকে জয় করার জন্য ভক্তরাই আমাদের সাহায্য করবেন। সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করে সুখী করার জন্য ভক্তরা জোরপূর্বক বাইরে নিয়ে আসবেন। যদি আমরা পেঁচার সঙ্গ করি, তাহলে নিজেরাই নিজেদের এই সুযোগ হতে বঞ্চিত করব।

এভাবে আমরা পুনরায় চাঁদের দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করতে পারি। যদিও সর্বত্র কিরণ বিস্তারের ক্ষমতা চাঁদের রয়েছে, কিন্তু তবুও চাঁদের কিরণ থেকে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। প্রত্যেক স্থানেই ঘর রয়েছে যেখানে লুকানো যেতে পারে বা আমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করেও রাখতে পারি। সেক্ষেত্রে চাঁদ কী করতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভের পন্থা প্রদর্শন করেছেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা প্রাথমিক পদ্ধতি। অধিকাংশ ভক্তরাই হরিনাম জপ করে, কিন্তু তারা এখনও ভগবৎকৃপা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেনি। তাহলে কি কৃপা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে?

না, আমরা মূলত অমনোযোগের অন্ধকারে থেকে জপ করছি। '*চেতোদর্পণ-মার্জনম্*' হরিনাম জপ আমাদের চিত্তরূপ দর্পণের মার্জন করতে পারে। আমরা সঠিকভাবে জপ না করলে সেটা কৃপার ত্রুটি নয়। আমরা সঠিকভাবে জপ করতে পারি না মানে, আমরা এখনও পূর্ণ আলোতে পৌঁছাতে পারিনি। চাঁদ কিরণ বিতরণ করছে, আমাদের শুধু যত্ন সহকারে কিরণের সদ্ব্যবহার করতে হবে। চাঁদ অনেক উদার ও বিস্তৃত। সুতরাং কেন আমরা অবহেলা করছি?

[১] প্রবচন, মন্ট্রিয়েল, জুন ১২, ১৯৬৮।

[২] লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যায় ২০।

[৩] চৈ.চ আদি ৮/২০।

[৪] চৈ.চ আদি ৯/২৯।

[৫] চৈ.চ আদি ৯/৩০।

[৬] চৈ.চ আদি ৯/৩২।

[৭] চৈ.চ আদি ৯/৪১।

শ্লোক ১৫

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্ ।
নীচাদপ্যুত্তম্ জ্ঞানং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

বিষাদ– বিষ থেকে; ***অপি–*** এমন কি; ***অমৃতম–*** অমৃত; ***গ্রাহ্যম–*** গ্রহনীয়; ***অমেধ্যাৎ–*** অপবিত্রস্থান থেকে; ***অপি–*** ও; ***কাঞ্চনম্–*** স্বর্ণ; ***নিচাৎ–*** নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তির কাছ থেকে; ***অপি–*** ও; ***উত্তম্ম–*** সর্বশ্রেষ্ঠ; ***জ্ঞানম্–*** জ্ঞান; ***স্ত্রী-রত্নম্–*** স্ত্রীরত্ন; ***দুষ্কুলাৎ–*** নীচ পরিবার থেকে; ***অপি–*** ও।

অনুবাদ

বিষের পাত্র থেকে অমৃত, অপবিত্র স্থান থেকে স্বর্ণ, সবচেয়ে নীচ ব্যক্তির কাছ থেকেও জ্ঞান এবং নীচ বংশের পরিবার থেকেও গুণবতী পত্নী গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

অনেক সময় আমরা প্রাচীন প্রথা ভঙ্গ করতে পারি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই নিয়ম-নীতি মেনে চলেন, কিন্তু তাই বলে নিয়ম তাকে জীবনের সারবস্তু লাভে বঞ্চিত করে না। উদাহরণস্বরূপ, বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ শ্রেণির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, তবে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের কেউ যদি সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হন, তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রামানন্দ রায় শুদ্র বর্ণের হলেও, তার সাথে কৃষ্ণভাবনামৃতের সর্বোচ্চ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকেও নামাচার্যরূপে অভিষিক্ত করেছেন। মহাপ্রভু বলেছেন, "*কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শুদ্র কেনে নয়, যে-ই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয়।*" "যিনি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু, তা তিনি ব্রাহ্মণই হোন কিংবা সন্ন্যাসীই হোন অথবা শূদ্র হোন তাতে কিছু যায় আসে না।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "মহাপ্রভু সকলকে গুরু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাবে জগতে সকলেই দুঃখ পাচ্ছে। এটিই তাঁর আন্দোলন। তিনি চাইতেন ভারতবর্ষে সকলেই গুরু হোক এবং বর্হিবিশ্বে প্রচার করুক। কারণ সেখানে কৃষ্ণভাবনা নেই। তাই মহাপ্রভু বলেছেন : আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।"[২]

একইভাবে দেবাহুতি তাঁর পুত্র কপিলদেবের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা কপিলদেব ছিলেন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা। দেবতারা একবার বিশ্বরূপকে তাদের যজ্ঞের পুরোহিত হতে অনুরোধ করেছিলেন, যদিও বিশ্বরূপ তাদের চেয়ে ছোট ছিলেন। ভাগবতের এই অংশের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "দেবতারা দেবহুতিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন, তাতে সংকোচের কোনো কারণ নেই, কারণ বৈদিক জ্ঞানে তিনি যেহেতু প্রবীণ, তাই তারা পুরোহিত হতে পারে। তেমনই চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *'নীচাদ্ অপ্যুত্তমং জ্ঞানম্'*– নিম্নবর্ণের মানুষের কাছ থেকেও জ্ঞান লাভ করা যায়। সমাজের সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণেরা সকলের শিক্ষক, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শুদ্র পরিবারভুক্ত ব্যক্তিও যদি জ্ঞানী হন, তবে তাকে শিক্ষকরূপে বরণ করা যায়।"[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যবাসী কেউ যেন সাম্প্রদায়িকতাবশত কৃষ্ণভাবনামৃত ত্যাগ না করে এ জন্য এই যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি (প্রভুপাদ) ক্যালিফোর্নিয়া ধর্মতত্ত্ববিদ্যা ইউনিয়নের অধ্যাপক ড. স্টিলসন যুদার কাছে এই নীতি ব্যাখ্যা করেছিলেন। "ভারতের কেউ যখন উচ্চতর প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তখন বিদেশ যায়। যেখানেই জ্ঞান সহজলভ্য আমাদের সেখানে গিয়েই তা গ্রহণ করা উচিত। এটিই জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ। চাণক্য পণ্ডিত বলেন, "যদি বিষের পাত্রেও খুব স্বল্প মাত্রায় অমৃত থাকে তবে তা তুলে নাও। তাই কোনো ভালো জিনিস যদি অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে সহজলভ্য হয়, তা তোমার গ্রহণ করা উচিত। যদি তুমি সত্যি সত্যিই ভগবানের খোঁজ কর, বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কথা রয়েছে। তাহলে তুমি গ্রহণ করছ না কেন? অগ্রাহ্য করা তোমার উচিত কি? এটি ভালো লক্ষণ নয়।"[৪]

একই যুক্তিতে আমরা বলতে পারি, পরম সত্য অন্য কোনো ধর্মেও পাওয়া যেতে পারে। অনুপম উপহার গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, যে কেউ ভগবানের সাথে তার সম্পর্ক অনেকভাবে জানতে পারে, যেমন বাইবেল, বৈদিক শাস্ত্র কিংবা কোরান। তবে যেকোনোভাবেই হোক তা জানতে হবে। খ্রিস্টানকে হিন্দু কিংবা হিন্দুকে খ্রিস্টানে পরিণত করা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়, বরং সকলকে জানানো যে মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হলো তার সাথে ভগবানের সম্পর্ক নিরূপণ করা। কেউ যদি তা অনুশীলন করে থাকে, তাহলে তার অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া উচিত, অথবা সে তা শিখতে পারে। এক পদ্ধতিতে অতৃপ্ত হয়ে আরেক পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়।"[৫]

বৈদিক পদ্ধতিতে বিবাহ হয় জ্যোতিষ শাস্ত্র গণনা করে। যদি কেউ কোনো যোগ্য পত্নী খুজে পায়, তবে তার বাহ্যিক বা সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা না করে, তাকে গ্রহণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, রাজা পুরুরবা

উর্বশীকে পছন্দ করেছিলেন, যদিও উর্বশী ছিলেন রাজার চেয়েও উচ্চকুলজাত। উর্বশী রাজাকে বলেছিলেন, “যদিও আমি স্বর্গলোকের এবং আপনি পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হবো। আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে আমার কোনোরূপ আপত্তি নেই, কারণ আপনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।”[৬]

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন, “কোনো রমণী যখন উন্নত গুণসম্পন্ন পুরুষকে প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাকে পতিরূপে বরণ করতে পারেন। তেমনই কোনো পুরুষ যখন নিম্নকুলোদ্ভূত রমনী প্রাপ্ত হন যার সদ্গুণাবলী আছে, তাকে পত্নীরূপে বরণ করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন–*‘স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি’*। পুরুষ এবং স্ত্রী যদি সমানগুণ সমন্বিত হন, তাহলে তাদের মিলন উৎকৃষ্ট।”

এই শ্লোকটিকে ভক্তরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অন্যভাবেও ব্যবহার করতে পারেন। আমরা ভাবতে থাকি যে, আমরা নোংরা জায়গা থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারি এবং কুলের বিচার না করে সহধর্মিনী পছন্দ করতে পারি; কিন্তু আমরা এটা ভাবি না যে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ যে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মাঝেও কোনো স্বর্ণ দেখতে পেয়েছিলেন। তবে এর মানে এই নয় যে, আমরা স্বর্ণ বা গোল্ডেন, বরং আমরা সবাই চিন্ময় আত্মা এবং শ্রীল প্রভুপাদও জানতেন যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের দাস। এই শ্লোকটিও একই মনোভাব নিয়ে চাঁদের দয়ার মতো প্রদর্শিত হয়েছে। চাঁদের মতো এক ভক্ত পাশ্চাত্যে এসে কৃপা বিতরণ করছেন। তিনি কোনো যোগ্য প্রতিনিধি খুঁজে পাননি তার কৃপা প্রদান করার জন্য। আমাদের ভেতর তিনি সেই স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছেন বলেই আমাদের তুলে নিয়ে গেছেন।

আমাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই তাঁর স্বদেশী ভক্তদের কাছে সমালোচিত হতেন। তারা আমাদের কলুষিত, শুদ্রাধম ইত্যাদি ভাবতেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের তুলে এনে নিষ্কলুষ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যা করেছেন তার যথার্থতা এই শ্লোকে নির্ণীত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বা অনুসারীদের শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয় বরং তাঁর উপদেশগুলোও সঠিকভাবে পালন করা উচিত, যেন তাঁকে অসম্মান কিংবা আবার সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে না হয়।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে কলিযুগেও কি সেই রকম স্বর্ণ পাওয়া যায়? উদাহরণস্বরূপ এমন কেউ আছে কি যে নিম্নবর্ণের হয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন? অথবা কোনো উচ্চবর্ণ বা যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবার রয়েছে কি? শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *‘কলৌ শুদ্র সম্ভবাঃ’*– কলিযুগে প্রত্যেকেই শুদ্র যোনী প্রাপ্ত হয়। অতএব এই শ্লোক উন্নত সামাজিক অবস্থানের জন্য গর্বিত ব্যক্তিদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা যে, যেকোনো অবস্থানে থেকেও সাফল্য লাভ করা যায়। এ শ্লোকটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। নিচু জাতের কারও মধ্যে যদি এত মূল্যবান কিছু থাকে, তবে কেন তারা জাতিভেদ প্রথাকে আঁকড়ে ধরে আছে?

অবশ্য এই জাতিভেদ প্রথাই পূর্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম হিসেবে পালিত হতো। এর প্রভাব বর্তমান সময়ের চাইতে পূর্বে অর্থাৎ চাণক্য যখন তার এই নীতিগুলো বলেছিলেন তখন আরও বেশি ছিল। পাশ্চাত্যে কোনো বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নেই। বৈদিক সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করলে এ শ্লোকের পূর্ণ উপলব্ধি লাভ হয় আর পাশ্চাত্যের পরিভাষায় তার অর্থ হ্রাস পায়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ কীভাবে এগুলো ব্যবহার করেছেন তা আমরা জানতে চাই।

ভক্তরা এ শ্লোকগুলো তাদের পারমার্থিক জীবনে এভাবে ব্যবহার করতে পারে– নোংরা কোনো স্থানেও যদি জমকালো কিছুও পাওয়া যায়, তা কৃষ্ণভাবনামৃতের ঔজ্জ্বল্যের সাথে তুলনীয় হতে পারে। এখানে সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে যা-ই পাওয়া যাক না কেন, তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এখানে সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে ছিটে-ফোটা যা-ই পাওয়া যায়, তা একত্রে সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে ভক্তদের তা সংগ্রহ করা উচিত নয়।

আরেকটি দিক হচ্ছে যে, আমরা যদি ভাবি যে, বিষপাত্র থেকে অমৃত আহরণ করতে আমরা দক্ষ, তবে আমাদের অবশ্যই সৎ ও নিষ্কপট হতে হবে। আমরা বিষ থেকে অমৃত সংগ্রহ করার নামে বিষের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না। একজন ভক্তের এ শ্লোকের অর্থ খুব যত্নের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। তা হতে হবে অনেকটা শল্যচিকিৎসার ন্যায়। পারমার্থিক জীবনধারা হচ্ছে ক্ষুরধারের ন্যায়। খুব সর্তক ও সততার সাথে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরিবর্তে জীবনের সার অর্জন করার জন্য আমরা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করছি।

এই শ্লোকটি আমাদের সবুজ সংকেত দিচ্ছে : এগিয়ে যাও, অমৃত লাভ করো। নোংরা স্থান থেকে সোনা সংগ্রহের ন্যায় নিচু জাতির কাছ থেকেও উপযুক্ত পত্নী সংগ্রহ করো। কিন্তু তা আমাদের বাছবিচারহীন হতে অনুপ্রাণিত করে না। এসমস্ত কার্য সমাধান করতে আমাদের দক্ষ হতে হবে। যদি আমাদের বিন্দুমাত্রও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ থাকে, তবে তা হবে আমাদের অযোগ্যতা। এই শ্লোক প্রতারকদের জন্য নয়। এটা তাদের জন্যই, যারা অযথা নিয়ম-নীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে চায় না এবং যাদের হৃদয়ে প্রকৃত লক্ষ্য বিরাজমান।

[১] চৈ.চ মধ্য ৮/১২৮।

[২] প্রবচন, বোম্বে, নভেম্বর ৭, ১৯৭৪।

[৩] ভাঃ ৬/৭/৩৩।

[৪] প্রাতঃভ্রমণ, লস এঞ্জেলস্, জুন ২৫, ১৯৭৫।

[৫] অনুপম উপহার।

৬ ভাঃ ৯/১৪/২১।

শ্লোক ১৬

নখিনং চ নদীনাং চ শৃঙ্গীনাং শস্ত্রপাণিনং।
বিশ্বাসঃ নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥

নখিনং– নখ বিশিষ্ট প্রাণী; ***চ–*** এবং; ***নদীনাং–*** নদী; ***চ–*** আরও; ***শৃঙ্গীনাং–*** শিং বিশিষ্ট প্রাণী; ***শস্ত্র পাণিনং–*** অস্ত্রধারী ব্যক্তি; ***বিশ্বাসঃ–*** বিশ্বাস; ***ন-এব–*** অবশ্যই না; ***কর্তব্যঃ–*** স্থাপন করা/কর্তব্য; ***স্ত্রীষু–*** নারীদের; ***রাজকুলেষু–*** শাসক শ্রেণীর; ***চ–*** এবং।

অনুবাদ

নখযুক্ত প্রাণী, নদী, শিংওয়ালা জন্তু, অস্ত্রধারী ব্যক্তি, নারী অথবা রাজনীতিবিদকে কখনোই বিশ্বাস করতে নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি বার বার উদ্বৃত করেছিলেন। তিনি শ্লোকের দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন– নারী এবং রাজনীতিবিদ। এদের নদী, অস্ত্রধারী ব্যক্তি কিংবা নখযুক্ত প্রাণীর চেয়েও ভয়ংকর মনে করা হয়। এ মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ নারীর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিশ্ব প্রচারক হিসেবে তিনি পাশ্চাত্যবাসীর জৈবিক প্রবৃত্তি লক্ষ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের রক্ষা করার জন্য নারীদের ধূর্ত, ভয়ংকর এবং আকর্ষণীয় প্রকৃতির বলে ব্যক্ত করেছিলেন। এই উপদেশগুলো আমাদের ধীর হতে সাহায্য করবে। এর ফলে আমরা নিজেদের নিয়মনীতির ঊর্ধ্বে না ভাবার ক্ষেত্রে সতর্ক হই। নারীদের সাথে ব্যবহারের প্রতি সতর্ক হই। তাতে রাজনৈতিক নেতার ওপর আমাদের অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে। চাণক্যের শ্লোকগুলো এবং শ্রীল প্রভুপাদ একে কীভাবে কৃষ্ণভাবনায় ব্যবহার করেছেন, তার ওপর আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আমরা চাণক্যের নীতিগুলোর প্রতি আকৃষ্ট নই, বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন শুদ্ধভক্ত কীভাবে এর শিক্ষা দিচ্ছেন, সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। *বিশ্বাসঃ নৈব কর্তব্য, স্ত্রীষু রাজঃ কূলেষু চ–* অর্থাৎ একজন নারী কিংবা রাজনীতিবিদকে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয়। চাণক্য পণ্ডিত তুখোড় রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী একবার অপহৃত হয়েছিলেন। এ দুটি বিষয়ে তিনি খুব খারাপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাই এ উপদেশগুলো তিনি দিয়েছিলেন। চাণক্য

পণ্ডিত অভিজ্ঞ না হয়ে কিছুই লিখেননি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার সবগুলো শ্লোকই খুব গুরুত্বপূর্ণ।"[১]

চাণক্য পণ্ডিত এমন একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন যে তার নামে নয়াদিল্লির নাম হয় চাণক্যপুরী। দুর্ভাগ্যবশত, তিনিই বলেছেন রাজনৈতিক নেতাদের কখনো বিশ্বাস না করতে। এই নীতি অনুসারে নারী নেতৃত্বের তো কোনো প্রশ্নই আসে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, মহাভারতে এ ধরনের দৃষ্টান্তের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না.... অনেক মহীয়সী ও যোগ্য নারী ছিলেন। কিন্তু তারা কি কখনো রাষ্ট্রের দায়িত্বে ছিলেন?"[২]

মনুসংহিতা অনুসারে শিশু বা ছোট অবস্থায় পিতার আশ্রয়ে, যৌবনে পতির আশ্রয়ে এবং বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের আশ্রয়ে নারীরা নিরাপদ থাকে। এ পন্থা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই নিরাপত্তা বিধান করে এবং সমাজের শান্তি রক্ষা পায়। "স্ত্রীলোক, বিশেষ করে সুন্দরী যুবতী পুরুষদের সুপ্ত বাসনা জাগ্রত করে। তাই মনুসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নারীকে তার পিতার দ্বারা, পতির দ্বারা অথবা তার উপযুক্ত পুত্রের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া উচিত। এভাবে সুরক্ষিত না হলে নারীরা নির্যাতিত হবেন।"[৩]

সন্ন্যাসীদের জন্য মহিলাদের গান শোনাও ভয়ংকর। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন, "সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা, কিন্তু সন্ন্যাসী যদি স্ত্রী লোকের কণ্ঠ শ্রবণ করেন এবং সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং তখন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীর মুখ দর্শন করে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করা অথবা কণ্ঠ শ্রবণ করে তার সংগীতের প্রশংসা করা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে সূক্ষ্মস্তরের অধঃপতন। যদি নারীর শরীর আকর্ষণীয় হয়, মুখমণ্ডল সুন্দর হয় এবং কণ্ঠস্বর মধুর হয়, তাহলে সে পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই এক ফাঁদের মতো। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের কোনো নারী যখন পুরুষের সেবা করতে আসে, তখন তাকে তৃণাচ্ছাদিত একটি অন্ধকূপ বলে বিবেচনা করা উচিত। মাঠে এ ধরনের অনেক অন্ধকূপ থাকে এবং মানুষ না জেনে ঘাসের মধ্য দিয়ে সেই কূপে পতিত হয়।[৪]

শ্রীমদ্ভাগবতে কশ্যপ মুনি নারীর এক অপূর্ব চিত্র কল্পনা করেছেন। "নারীর মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাক্য অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ম, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে?"[৫]

জাগতিকভাবে স্ত্রীলোক ও রাজনীতিবিদদের সবচেয়ে স্বার্থপর ব্যক্তির উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কংস যখন দেখছিল তার স্বার্থ হানি

হচ্ছে, তখন বোনের প্রতি ভালোবাসা ত্যাগ করে তার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। "রাজনীতিবিদ অথবা নারীকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোনো জঘন্য কাজও করতে পারে।"[৬]

স্বর্গীয় অপ্সরা উর্বশী লক্ষ্য করেছিলেন যে, মহারাজ পুরুববা তার মোহে সম্পূর্ণভাবে প্রমত্ত। তাই উবর্শী তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "মহারাজ ধৈর্য অবলম্বন করুন। শৃগালের মতো ইন্দ্রিয়গুলো যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে ফেলে। পক্ষান্তরে, আপনার জেনে রাখা উচিত যে, রমনীর হৃদয় বৃকদের মতো। সুতরাং তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা উচিত নয়।"[৭] পুরুষদের সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষণ এবং নারীদের ধূর্ত স্বভাব বিবেচনাপূর্বক বৈদিক সিদ্ধান্ত হলো যে প্রথমে নারীদের সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, একটি ভালো জাতির জন্য অবশ্যই নারীদেরকে অনেক সতী হতে হবে। বৈদিক সভ্যতার এটিই মূল ভিত্তি। নারীদেরকে সতী রাখতে পিতার কিংবা পিতার অবর্তমানে বড় পুত্রের দায়িত্ব তাকে বিবাহ দেওয়া। কিন্ত যদি তাকে সুরক্ষা প্রদান না করা হয় তাহলে অবস্থা খুবই প্রতিকূল হবে।"[৮]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিপক্ষে এই প্রকার যুক্তি উপস্থাপন করে অর্জুন বলেছিলেন, এই যুদ্ধের কারণে সমাজ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে, পরিবারে অধর্ম ছড়িয়ে পড়বে এবং মহিলারা উৎসন্নে যাবে। তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "এই ধরনের সৎ জনগণ তখনই উৎপন্ন হয়, যখন সমাজের স্ত্রীলোকেরা সৎ চরিত্রবতী ও সত্যনিষ্ঠ হয়। শিশুদের মধ্যে যেমন অতি সহজেই বিপথগামী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও তেমন অতি সহজেই অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। তাই শিশু ও স্ত্রীলোক উভয়েরই পরিবারের প্রবীণদের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের একান্ত প্রয়োজন। .... বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন না করলে, স্বভাবতই স্ত্রীলোকেরা অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করে এবং তাদের ব্যভিচারের ফলে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তান সন্ততির জন্ম হয়। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন সমাজে ব্যভিচার প্রকট হয়ে ওঠে এবং অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ছেয়ে যায়, তখন মহামারী ও যুদ্ধ দেখা দিয়ে মানব সমাজকে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে।"[৯]

এই কথাগুলো তাদের প্রকৃতি অনুযায়ীই ক্ষনস্থায়ী ও বিতর্কিত। মাঝে মাঝে নারীদের সম্পর্কে এমন মন্তব্যের জন্য শ্রীল প্রভুপাদও প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। তিনি বলতেন যে, তিনি নিষ্পাপ এবং শুধু শাস্ত্রের উক্তিগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। এর মানে এই না যে, শ্রীল প্রভুপাদ কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন বা কোনো সিদ্ধান্ত দিতে চাচ্ছেন না। তার মনোভাব এই রকম যে, এই বিষয়টি কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের ব্যাপার নয়। যদিও

এগুলো আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু চাণক্য ও শ্রীল প্রভুপাদের মতামত অনুযায়ী তা-ই সত্য।

যাইহোক এটা প্রয়োগ করা কঠিন, যারা এই বিষয়ে দক্ষ এবং বিজ্ঞ তাদের এই বিষয়টি নির্বাহ করা উচিত। তবে অবশ্যই এই শ্লোকগুলোকে নারী নির্যাতনের অস্ত্র হিসেবে কিংবা অপমান করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেউ বলতে পারে নারীদের বিশ্বাস করো না, কিন্তু পুরুষদের কাম প্রবণ প্রবৃত্তির জন্যই তারা ভয়ংকর। যদি তাদের অপমান করা হয়, তবে পুরুষেরা পুনরায় তাদের ধূর্ততা ও শারীরিক সৌন্দর্যের শিকার হবেন। নারী কিংবা রাজনৈতিক নেতা যে ব্যক্তিই হোক না কেন, তাদের বিশ্বাস করতে নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "বিশেষ করে জাগতিক মহিলা ও রাজনৈতিক নেতাদের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। অবশ্যই মহিলা যখন কৃষ্ণভাবনামৃতে যোগদান করে, সেক্ষেত্রে ভিন্ন।"[১০]

শ্রীল প্রভুপাদের কথায় ভীত হওয়া উচিত নয় বরং দক্ষতার সাথে তা পালন করা উচিত। এসম্পর্কে ক্ষমা ভিক্ষা করা, অতিরিক্ত বকবকানি বা কোনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীল প্রভুপাদও চাণক্যকে কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকার করেছেন। ভগবদ্গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মূঢ় বলে অভিহিত করেছেন তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন– এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। তেমনি নারীদের বিশ্বাস করো না, এ ধরনের উক্তি বোঝানো খুব কঠিন ও বিতর্কিত– কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদও তাই বলেছেন। আমাদের তাদের কথার ভিত্তিতে চলা উচিত, এমনকি এতে কেউ যদি আমাদের পুরুষবাদী কিংবা তার চেয়ে খারাপও বলে তবুও।

এ ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দক্ষতার সাথে প্রচার করা উচিত। প্রচারের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা না বলাই ভালো। তবে কেউ যদি প্রসঙ্গ টেনে আনে, তবে শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধিতা করা উচিত নয়। সবকিছুই বুদ্ধিমত্ত্বার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

আসলে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এই শ্লোকটি শিখিয়েছেন যেন আমরা বাস্তবতা থেকে রক্ষা পাই। যদি কেউ এটি অবিশ্বাস করে, তবে সে নারীদের ভুলভাবে বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হয়ে দেখতে পারে। এগুলো আমাদের প্রচারের বিষয় নয় বরং অনুসরণের বিষয়। এতে আমরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারি।

নারীদের শূদ্র ও বৈশ্যের সাথে তুলনা করা হয় (*স্ত্রীয়ো বৈশ্য তথাঃ শূদ্রঃ*)। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃতে যোগদান করে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হয়,

তখন সে শূদ্র, বৈশ্য, নারী, পুরুষ কিছুই যায় আসে না, সবই সমান।[১১] তবে নারী কিংবা পুরুষ কৃষ্ণভাবনামৃতে উভয়েরই নিজেদের জাগতিক প্রবৃত্তি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। "কৃষ্ণভাবনাময় গৃহস্থদের অবশ্যই এইরূপ ধূর্ত শৃগালরূপী মহিলাদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। স্ত্রী যদি অনুগত হয় এবং তার স্বামীকে অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করে, তবে সেটা খুব ভালো পরিবার...অন্যথায় পরিবার ত্যাগ করে বনে গমন করা উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করা কর্তব্য।"[১২]

পূর্ববর্তী নবম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন একজন পুরুষ ও নারী বিবাহিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করে, লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সেই গৃহে অবস্থান করে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনসঙ্গী বেছে নেওয়া থেকেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তাহলে তাদের এই প্রকার অবৈধ সঙ্গের প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত। নারীদের দুর্বল চিত্তের কারণে প্রভুপাদ লিখেছেন, "সেজন্য স্ত্রীলোকদের নানা রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করার মাধ্যমে স্ত্রীলোকদের চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র ও নির্মল রাখা হয় এবং এভাবেই তাদের ব্যাভিচারী মনোবৃত্তিকে সংযত করা হয়।"[১৩] পুরুষ কিংবা মহিলা কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, তারা পতিত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "আমাদের মনকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। মনে করা উচিত নয় যে, আমরা এখন স্বাধীন। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত, স্বাধীনতা কোনো সাধারণ জিনিস নয় বরং আমরা যদি নিয়মকানুন অনুসরণ করি তাহলেই আমাদের স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।"[১৪]

মাঝে মাঝে ভক্তরা বলে যে, পাশ্চাত্যদেশীয় নারীরা পুরুষদের মতো বড় হয়েছে এবং তাদের চলাফেরায় স্বাধীনতা ছিল। তারা প্রতিযোগিতামুলক বিশ্বে টিকে থাকতে প্রস্তুত, ফলে বৈদিক নারীর চেয়ে তারা একটু বেশিই পুরুষ স্বভাবের। তারাও ক্রমান্বয়ে বিশ্বস্ত হচ্ছে ও তাদের নীচ প্রবৃত্তিগুলো পরিত্যাগ করছে।

এটা সম্ভবত সত্য যে, পুরুষদের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের নারীরাও টিকে থাকার সংগ্রামের মুখোমুখি হতে দক্ষ। শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় এসেছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন সেখানে নারীরা সম অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাই তিনি তা কৃষ্ণভাবনায়ও প্রয়োগ করলেন। তার মানে এই নয় যে, পাশ্চাত্যের নারীদের তাদের নারীসুলভ ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। নারীসুলভ মনোভাবই অগ্রাধিকারযোগ্য এবং পুরুষোচিত মনোভাবের চাইতে নারীসুলভ মনোভাবই স্বাভাবিক। বরং নারীদের তথাকথিত বিশ্বস্ততা বা

পুরুষদের সাথে পাল্লা দেওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলা থেকে বিরত রাখা উচিত। নারীদের সুরক্ষিত রাখার মানে এই নয় যে, তাদের গতি স্তব্ধ করে রাখা। পাশ্চাত্যের নারীরা বৈদিক আদর্শকে অদক্ষতা ও অপরিণততার মতো মনে করে। তারা ঘরে বসে থাকতে চায় না। তারা ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি এবং পুরুষরা যা কিছু করছে তা করতে পছন্দ করে। এটা ভুল।

সুরক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ভক্তিজীবনে তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে সক্ষম হয়। স্ত্রীলোকেরা যদি তাদের স্ত্রীসুলভ স্বভাব যেমন-লজ্জা, কোমলতা, ভালোবাসা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে যুক্ত না করে সঠিকভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যুক্ত করে তাহলে তা সমাজের জন্য উদ্দীপনাময় হবে।

উদাহরণস্বরূপ, কুমারীরা মঙ্গলময় পরিবেশ তৈরি করে। কোনো বৈদিক অনুষ্ঠানে যদি কুমারী, গাভী ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকে তাহলে তা মঙ্গলজনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্ত্রীলোকেরা যদি অবিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত না হতে চায়, তাহলে তাদের স্ত্রীসুলভ গুণাবলির দ্বারা ভক্তিযোগ অনুশীলন করা উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যদেশীয় নারীদের কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবশ্যই তাদের টি-শার্ট, জিন্স পড়ে পুরুষদের বসতে দিতে পছন্দ করতেন না। তবুও তিনি নোংরা জায়গা থেকে স্বর্ণ উত্তোলনের নীতি গ্রহন করছিলেন এবং তিনি বাস্তবিকই সফল হয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যাদের বিবাহিত হতে উৎসাহিত করতেন। কেউ আশ্চর্যান্বিত হতে পারে যে, স্ত্রীলোকের যদি বিশ্বাসযোগ্য না হবে তাহলে তিনি কেন তাদের বিবাহিত হতে উৎসাহিত করতেন। স্ত্রীলোকেরা সঠিকভাবে আচরণ করলে তারা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য।

চাণক্য পণ্ডিত বলেন যে, যদি পুরুষেরা শুধু তাদের স্ত্রী ছাড়া সকল স্ত্রীলোককে মায়ের মতো মনে করে, তাহলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই যথাযথভাবে আচরণ করবে এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে পারবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, "পুরুষও ভালো এবং স্ত্রীও ভালো, কিন্তু তারা একসাথে ভালো নয়।" কোনো স্ত্রীর সাথে যদি যৌনজীবনের উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক গড়ে উঠে, তবে সেই সম্পর্ক বিশ্বাসযোগ্য নয়। নারী যখন মা, তখন প্রত্যেকেই তাকে একজন সন্তানের মতোই বিশ্বাস করে। সর্বোপরি তিনি যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত, তখন তার স্বামীও তাকে সহজেই বিশ্বাস করতে পারে। জড়জগতে স্ত্রীলোকের বাস মানে দায়বদ্ধতা বা বিপজ্জনক, কিন্তু কোনো নারী যদি নিজেকে ভক্তিজীবনের প্রতি উৎসর্গীকৃত হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়।

চাণক্য কতগুলো ব্যক্তি বা বিষয়কে তার শ্লোকে তালিকাবদ্ধ করেছেন, যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা কাকে বিশ্বাস করতে পারি? প্রকৃতপক্ষে, একজন ভক্তকে কৃষ্ণ ও তার গুরুদেবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, পিতৃপরিচয় জানার একমাত্র উপায় হলো মাতাকে জিজ্ঞাসা করা। এই জ্ঞান লাভের আর কোনো উপায় নেই। এই কথা শুনে কোনো একজন প্রভুপাদকে বলেছিলেন, "দাঁড়ান স্বামীজী, যদি আপনার মা আপনাকে প্রতারিত করে তাহলে কি হবে?" প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, "এটা সম্ভব। তবে যদি আপনার মা আপনার সাথে প্রতারণা করে তাহলে সেটা আপনার দুর্ভাগ্য। নিজের প্রকৃত পিতৃপরিচয় জানবার আর কোনো উপায় নেই।" অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

যেমন একজন ভক্ত প্রশ্ন করতে পারে যে, কীভাবে নিজের গুরুদেবকে বিশ্বাস করবে? সর্বোপরি একজন গুরুদেবও তার শিষ্যের সাথে প্রতারণা করতে পারে। তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতে পারি যে, আমাদের গুরুদেব আমাদের সাথে প্রতারণা করবেন না? আমরা তা জানতে পারি না। আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করে নিতে হবে। আমরা সরাসরি কৃষ্ণের নিকট যেতে পারি না। কৃষ্ণের চরণকমল লাভের জন্য আমাদেরকে গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যদি প্রতারিত হই, তাহলে আমরা অন্য গুরুদেব গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু যাই হোক আমাদেরকে গুরুদেবের নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। গুরুদেবকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও প্রতারকরূপে প্রতিভাত হলেন এটা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু মনে রাখতে হবে কৃষ্ণ কখনই আমাদের সাথে প্রতারণা করবেন না।

চাণক্য পণ্ডিতের কিছু উপদেশ খুবই সরস ও কৌতুকপূর্ণ। এ কারনেই এগুলো মনে থাকে। আমাদের সতর্ক হতে সাহায্য করে। নদীকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয় মানে কি, নদীতে আমাদের স্নান করা বা পার হওয়া উচিত না বা নদীকে ঘৃণা করা উচিত? একইভাবে শিংযুক্ত সকল প্রাণীকেই কি ঘৃণা করা উচিত? তাহলে গরুর তো শিং আছে সেক্ষেত্রে কী হবে? তার মূল অভিপ্রায় হলো আমাদেরকে বিপদের সম্ভাবনা থেকে সতর্ক করা। গরু খুবই শান্ত প্রাণী। কিন্তু সেও যেকোনো মুহূর্তে বিপরীত আচরণ করতে পারে। আমরা কোনো অস্ত্রধারী ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারি, কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে, যেকোনো মুহূর্তে আমার প্রতি সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে।

চাণক্য পণ্ডিত আমাদের সকল নারীকে ঘৃণা করার উপদেশ দিচ্ছেন না বরং তিনি আমাদেরকে নারীদের বিপজ্জনক জাগতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি সতর্ক করছেন। নারীকে বিশ্বাস না করার অর্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকেও বিশ্বাস না করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসব্রত রক্ষার্থে রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন করেননি এবং বলেছিলেন, "যেহেতু আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাই আমার পক্ষে রাজাকে দর্শন করা কোনো স্ত্রীলোককে দর্শন করারই মতো। এদের উভয়ের দর্শনই বিষ ভক্ষণের মতো ভয়ঙ্কর।"[১৫] তার মানে রাজা কিংবা স্ত্রী আমাদের শত্রু নয়। এর মানে আমাদের সেসব বস্তুর দর্শনকে বোঝানো হচ্ছে, যদি সেগুলোকে আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হিসেবে দেখি, তবে তা আমাদের পারমার্থিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর।

আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারি, যারা তাদের স্বার্থ ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে বন্দুক দেখাবে না, হৃদয় ভাঙবে না বা প্রতারণা করবে না। অনেকেই আছেন, যাদের আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারি এবং আমরা তাদের সাথে ও পরম আনন্দের আধার কৃষ্ণের সাথে থাকতে পারি, তবেই আমরা সৌভাগ্যবান। কৃষ্ণ বলেছেন, "আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি।" তাই তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।

[১] প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ২৪, ১৯৭৬।
[২] সান্ধ্যকালীন দর্শন, হৃষিকেশ, মে ৯, ১৯৭৭।
[৩] ভাঃ ৮/৯/৯।
[৪] ভাঃ ৬/১৮/৪১ তাৎপর্য।
[৫] ভাঃ ৬/১/৪১।
[৬] ভাঃ ১০/১/৩৫।
[৭] ভাঃ ৯/১৪/৩৬।
[৮] প্রবচন, লন্ডন, জুলাই ২৮, ১৯৭৩।
[৯] ভগী. ১/৪০ তাৎপর্য।
[১০] প্রবচন, লন্ডন, জুলাই ২৮, ১৯৭৩।
[১১] ভাঃ ৯/১৪/৩৬ তাৎপর্য।
[১২] ভাঃ ৯/১৪/৩৬ তাৎপর্য।
[১৩] ভগী. ১/৪০।
[১৪] প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ২৪, ১৯৭৬।
[১৫] চৈ.চ মধ্য ১১/৭।

শ্লোক ১৭

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্য তথাগৃহদ্ ॥

মাতা– স্নেহময়ী মা; ***যস্য–*** যার; ***গৃহে–*** গৃহে; ***ন–*** না; ***অস্তি–*** থাকেন; ***ভার্যা–*** স্ত্রী; ***চ–*** এবং; ***অপ্রিয়-বাদিনী–*** যিনি কটুকথা বলেন সেই রকম স্ত্রী; ***অরণ্যম্–*** বন; ***তেন–*** তার দ্বারা; ***গন্তব্যম্–*** গন্তব্য; ***যথা–*** যেমন; ***অরণ্যম্–*** বন; ***তথা–*** তেমন; ***গৃহম্–*** গৃহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তির গৃহে স্নেহময়ী মা অথবা সুশীলা স্ত্রী কোনোটাই নেই, তার উচিত তৎক্ষণাৎ সেই শূন্য গৃহ পরিত্যাগ করে বনে গমন করা। এমন ব্যক্তির কাছে বনবাস গৃহে বাস করার চেয়ে কিছুমাত্র খারাপ নয়।

তাৎপর্য

এ শ্লোকে নেতিবাচক গৃহস্থ জীবনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তবে স্ত্রী যদি যথার্থভাবে প্রশিক্ষিত হয়, তবে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত এড়ানো যেতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "কীভাবে ভালো স্ত্রী বা ভালো মা হওয়া যায় সে বিষয়ে জীবনের শুরু থেকেই নারীদের প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত আছে; যেমন : কুন্তিদেবী এবং দ্রৌপদী। নারীরা কোমল হৃদয়ের। তাই যেকোনোরূপেই গড়ে তোলা সম্ভব।"[১] গৃহে নারীর প্রভাব এত বেশি যে তার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পরিবারকে শান্তিময় করে তোলে এবং নারী যদি গৃহের প্রতি উদাসীন হন, তবে গৃহকর্তার সেরূপ গৃহ ত্যাগ করা উচিত। "প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীই পুরুষের শক্তি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহান ব্যক্তির পেছনে রয়েছেন তার মাতা অথবা পত্নীর ভূমিকা। গৃহে যদি সুশীলা পত্নী ও স্নেহময়ী মাতা থাকে, তাহলে গৃহস্থ জীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই অবস্থায় সমস্ত কার্যকলাপ এবং সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম অত্যন্ত সুখদায়ক হয়।"[২]

বৈদিক মূল্যবোধের অভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ পীড়াগ্রস্ত। শ্রীল প্রভুপাদ আদর্শ ও সুখী ভারতীয় পরিবার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "কিন্তু তোমাদের দেশে এর বড় অভাব। তবুও এটাই সুখের পরিমাপক। তাই যদি কারও গৃহে মা না থাকেন এবং স্ত্রীও যদি সংসারের সাথে ভালোভাবে যুক্ত না থাকেন বা ভালোভাবে কথা না বলেন, তবে এর অর্থ দাঁড়ায়– তিনি তার স্বামীকে পছন্দ করেন না। সর্বোপরি তখন *অরণ্যং তেন গন্তব্য* অর্থাৎ– শীঘ্রই

গৃহকর্তার গৃহত্যাগপূর্বক অরণ্যে যাওয়া উচিত... কারণ এ অবস্থায় তার জন্য গৃহ কিংবা অরণ্য দুই-ই সমান।"[৩]

যে কেউ আশ্চর্য হবেন, বিবাহের সময় প্রতিজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পুরুষকে কেন গৃহ ত্যাগের উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই দম্পতিকে কী অসুস্থতা, কী সুস্থতা, কী সুখ, কী দুঃখ সকল অবস্থায় কি একসাথে থাকা উচিত নয়? তাহলে কেন চাণক্য পণ্ডিত গৃহের সমস্যা সমাধানের কথা না বলে গৃহত্যাগের উপদেশ করছেন?

এ ধরনের শ্লোক বিচারের ক্ষেত্রে ভক্তদের অবশ্যই সাবধান হওয়া উচিত। বিবাহের প্রাথমিক ব্যর্থতায় খামখেয়ালিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞার কথা এই শ্লোক নির্দের্শ করে না। এর মানে হলো গৃহের পরিস্থিতি যখন অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে, তখনই গৃহ পরিত্যাগের প্রশ্ন আসে। অবস্থার অবনতি এতই বেশি হতে হবে যে, তা শুধু স্বামী অথবা স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসাই নয়, তা নিরানন্দ হতাশাজনক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এধরনের পরিস্থিতিতে সংসার ত্যাগ জ্বলন্ত গৃহ ত্যাগের মতোই হয়।

অসুখী পরিবারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো বিবাহ বিচ্ছেদ, তা স্বামী কিংবা স্ত্রী যে কারো দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদান করেছিলেন। তিনি শিকাগোতে থাকাকালীন এক সংবাদ তাঁর চোখে পড়েছিল। সংবাদটি ছিল– এক অভিনেত্রী দুই সপ্তাহে দুইজন স্বামীর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটান। শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছিলেন, "যদি গৃহ শান্তিপূর্ণ না হয়, সবসময় মনে বিভ্রান্তি থাকে এবং সপ্তাহে দুইবার বিবাহ বিচ্ছেদ করে, তবে কীভাবে সেখানে শান্তি থাকতে পারে? এটা স্বাধীনতা নয়, বরং বিশৃঙ্খলা।"[৪]

স্ত্রী বিরুদ্ধ হলেও আমরা অন্তত মায়ের ভালোবাসা আশা করতে পারি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মায়ের ভালোবাসাও বিপন্ন হতে চলেছে। "মাতাও যদি বিশ্বাসযোগ্য না হন, তবে অন্যদের সম্বন্ধে কী আশা করতে পারি। একটি ছোট শিশু তার মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে, কেননা সে মনে করে 'আমি এখন নিরাপদ'। কিন্তু মা-ই এখন তার সন্তানকে হত্যা করছে।"[৫]

এ ধরনের অধঃপতন ও আনন্দহীন অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভাবনার আন্দোলনকে একমাত্র আশা হিসেবে দেখেছেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত যে শুধু স্বতন্ত্র আত্মাকেই নিত্য পরমানন্দ দান করে তা-ই নয়, তা সমগ্র পৃথিবীতে সভ্যজীবনের ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাকে ভুল বোঝা উচিত নয়। এটি নিছক ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা নয়।

চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকে ভালো স্ত্রী লাভে বঞ্চিত পুরুষের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নারীর জীবনেও এই দুর্ভাগ্য কীভাবে নেমে আসতে পারে, তা শ্রীমদ্ভাগবতমের একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, "পুত্রহীনা স্ত্রীকে তার গৃহে তার পতি অনাদর করে এবং সপত্নীরা তাকে দাসীর মতো অসম্মান করে। সেই প্রকার স্ত্রী তার পাপের জন্য সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।"[৬] এখানে "তার পাপের জন্য" কথাটি দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে গৃহে অশান্তির কারন পূর্বে কৃত কর্মফলের প্রতিক্রিয়া। শ্রীল প্রভুপাদ এর তাৎপর্যে লিখেছেন, "যে রমনীর পুত্র নেই, যার পতি তাকে অনাদর করে এবং যার সপত্নীরা তার প্রতি দাসীর মতো ব্যবহার করে তাকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে গৃহে থাকার থেকে বনে যাওয়াই শ্রেয়।"

নিরানন্দই কলিযুগের মানুষের সহজাত প্রবণতা এবং তা আসে তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে। ভক্তরা প্রায়ই বুঝে উঠতে পারেন না, কর্মফল তাদের সহ্য করা উচিত, না তা ভোগ করাকে এ জগৎ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নাকি আরো সুখকর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

যতক্ষণ আমরা জড় জগতে আছি, সবকিছু যে ঠিকভাবেই হবে, তা আশা করতে পারি না, তবে তার মানে এই নয় যে আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ব। যদি আমরা এই জীবনের জন্য মঙ্গল সাধন করতে অসমর্থ হই, তবে কীভাবে আমরা অপ্রাকৃত জগৎ লাভ করতে পারব? মঙ্গলের জন্যই আমাদের নানা অসুবিধাজনক কার্য সম্পাদনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি খুবই অসুখী হই, তবে আমরা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনেও ব্যর্থ হব।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো নারকীয় স্থানে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন খুবই কঠিন, কেননা সেখানে আমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং একইভাবে স্বর্গেও কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন খুব কঠিন, কারণ সেখানে সুখের পরিমাণ অনেক বেশি। পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ উভয়ই প্রায় সমান। কৃষ্ণভাবনা প্রচারের জন্য আমরা যদি দুঃখকে উপেক্ষা করতে পারি তাহলে আমাদের তাই করা উচিত। যদি আমাদের অসুখী অবস্থা আমাদের কৃষ্ণভাবনা থেকে দূরে রাখে, তবে তা থেকে আমাদের ভালো অবস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমরা এতো উন্নত স্তরের সাধু নই যে জাগতিক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারবো। এই শ্লোকের ভাবার্থ এটাই যে, যদিও জড়জগত অত্যন্ত দুঃখময়, তবু কোনো তীব্র দুর্ভোগ আমাদের বরণ করা উচিত নয়, যদি এর কোনো পরিবর্তনের আশা না থাকে এবং তাতে যদি আমাদের কৃষ্ণভাবনা রুদ্ধ হয়।.

আরেকটি বিষয় ইস্‌কনের ভক্তদের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে, আমাদের অনেকেরই স্নেহময়ী মা নেই– তা গুরুত্বপূর্ণ কিনা। আমাদের কি

সে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো উচিত? চাণক্য বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে লিখেছেন। এখন কলিযুগ, তাই এতো সহজে এ সুবিধাগুলো আমরা লাভ করতে পারব না। সেজন্য শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে আমরা তাদের কৃষ্ণভাবনামৃতে নিয়ে আসতে পারি। আমরা বেদকে মা হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারি। আমাদের স্নেহময়ী মা থাকা বা তাদের সাথে মানসিক সম্পর্ক থাকা আমাদের ভক্তিজীবনের জন্য একেবারে অপরিহার্য নয়। যদি আমাদের মা অভক্ত হন বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের বিরোধী হন, তবে আমরা সেই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করে নতুন মা হিসেবে বেদকে গ্রহণ করতে পারি।

এছাড়া 'বনে গমন করা' কথাটির অর্থ আমাদের বুঝতে হবে। এর মানে এমন নয় যে, আমাদের সরাসরি কোনো বনে গিয়ে থাকা উচিত– তাছাড়াও বর্তমানে এমন একটিও বন খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সর্তক করেছেন যে, যদি আমরা বসবাসের জন্য বনে গমন করি, তবে আমরাও বানরের মতো হয়ে যাব, অনেক বান্ধবী থাকবে আর নগ্ন অবস্থায় চারপাশে ভ্রমণ করবো। বনে গমন করা মানে জাগতিক অবস্থার পরিবর্তন করা। এর প্রকৃত তাৎপর্য সংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করা। আমাদের জন্য এ কথাটির অর্থ হলো, কোনো ধামে বা মন্দিরে বাস করা অথবা শুধু সংসার ত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের উপযোগী কোনো অনুকুল স্থানে বাস করা।

বনে গমনের প্রকৃত তাৎপর্য– *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং* অর্থাৎ ভক্তসঙ্গে নববিধা ভক্তিযোগ অনুশীলনে নিয়োজিত থাকা। যদি আমরা শোচনীয় পরিস্থির জন্য গৃহ থেকে বিতারিত হই, তবে আমরা তাকে আন্তরিকভাবে পারমার্থিক জীবন গ্রহণের আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যেন পুনরায় এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার না হই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিল। তার সুন্দরী ও সুশীলা পত্নী এবং প্রীতিময়ী মা ছিলেন। সুপত্নী যেমন সংসারের আশীর্বাদ তেমনি তারা গৃহের প্রতি আসক্তিও তৈরি করে। চাণক্য বনে গমনকে দুর্ভাগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভিন্ন উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি গৃহে পূর্ণরূপে সুখী ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রচার করার জন্য গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। প্রভুপাদ এ ব্যাপারে লিখেছেন, "গৃহে যদি স্নেহশীল মাতা ও সুশীলা পত্নী থাকে, তা হলে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকতার জন্যই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করেছিলেন।"[৭]

শ্রীমদ্ভাগবতমের চতুর্থ স্কন্ধে এরকম আরেকটি বর্ণনা রয়েছে : "রাজা পুরঞ্জন বললেন—আমি বুঝতে পারছি না আমার গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পূর্বের মতো আমাকে আর কেন আকর্ষণ করছে না। আমার মনে হয় যে, গৃহে যদি মাতা ও পতিপরায়ণা পত্নী না থাকে, তা হলে সেই গৃহ চক্রবিহীন রথের মতো। কোন্ মূর্খ সেই অচল রথে উপবেশন করবে? এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন মাতা বা মা শব্দটি এখানে প্রতীকি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত মাতা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি এবং প্রকৃত পত্নী হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবানের সেবায় তাঁর পতিকে সহায়তা করেন। সুখী গৃহের জন্য এই দুটি বস্তু অত্যন্ত আবশ্যক।"[৮]

এই শ্লোকের ওপর শ্রীল প্রভুপাদের আলোচনা, গৃহের উপর গৃহিনীর প্রভাবের তারতম্য অনুসারে সাংসারিক জীবনের উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। সুযোগ্যা পত্নীর অভাবে সংসার জীবন প্রতিপালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, গৃহের প্রকৃত সুখ কৃষ্ণকেন্দ্রিক হয়। "মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, তাই পত্নীর অবশ্য কর্তব্য পতির পারমার্থিক কার্যকলাপে সাহায্য করা।"[৯]

১ প্রবচন, বৃন্দাবন, অক্টোবর ৩, ১৯৭৬।
২ ভাঃ ৪/২৬/১৫ তাৎপর্য।
৩ প্রবচন, হনলুলু, মে ৯, ১৯৭৬।
৪ কক্ষে আলোচনা, ফিলাডেলফিয়া, জুলাই ১৩, ১৯৭৫।
৫ প্রাতঃভ্রমণ, ডেনেভার, জুন ২৮, ১৯৭৫।
৬ ভাঃ ৬/১৪/৪০।
৭ ভাঃ ৪/২৬/১৫ তাৎপর্য।
৮ ভাঃ ৪/২৬/১৫ শ্লোক এবং তাৎপর্য।
৯ ভাঃ ৯/৪/২৯ তাৎপর্য।

নক্ষত্র ভূষণম্ চন্দ্রঃ নারীনাম ভূষণম পতি।
পৃথিবী ভূষণম রাজাঃ বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম ॥

নক্ষত্র– নক্ষত্রপুঞ্জ; ***ভূষণম্–*** অলংকার; ***চন্দ্র–*** চাঁদ; ***নারীণাম–*** নারী; ***ভূষণম্–*** অলংকার; ***পতিঃ–*** স্বামী; ***পৃথিবী–*** পৃথিবী; ***ভূষণম্–*** অলংকার; ***রাজা–*** রাজা; ***বিদ্যা–*** জ্ঞান/বিদ্য; ***সর্বস্য–*** সকলের জন্য; ***ভূষণম–*** অলংকার।

অনুবাদ

চাঁদ নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, সুশাসক পৃথিবীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং পতি পত্নীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিদ্যা সবার এবং সমস্ত জিনিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

তাৎপর্য্য

চাণক্য পণ্ডিত শুধু নৈতিক জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন না, তিনি অলংকার ব্যবহারেও পারদর্শী ছিলেন। এখানে এক রাশি উদাহরণ দিয়ে তিনি আমাদের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছেন। রচয়িতার সৌন্দর্যবোধই এই শ্লোকের মূল বিষয়। তবুও যে সমস্ত উদাহরণ সেদিকে নিয়ে যায়, তা গভীর জ্ঞান সমন্বিত উপদেশে পরিপূর্ণ। এভাবে এ শ্লোকগুলো পরিপূর্ণতা বিধান করে। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ ভেনিস সমুদ্র সৈকতে প্রাতঃভ্রমণকালে বললেন যে, ঢেউয়ের কারণে সমুদ্রকে সুন্দর দেখাচ্ছে। তখন তিনি এ শ্লোকটি উল্লেখ করেন। "সকল সৌন্দর্য্যের পেছনে কিছু গুণ রয়েছে। যেমনটা চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন ***নারীনাম ভূষণম পতিঃ*** একজন নারীর সৌন্দর্য তার দৈহিক সৌন্দর্য নয়, বরং যখন তার স্বামী থাকে, তখন সে সুন্দরী হয়। কথাটি কত বিজ্ঞানসম্মত। তোমাদের দেশের স্বামী হীন এসব নারীগুলো শোকগ্রস্থ, অসুখী। তাদের স্বামীর নির্দিষ্টতা নেই। তাই নয় কি?.......সেজন্যই, আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় সমাজে আমি বিবাহের প্রচলন করেছি। এখন দেখো আমাদের সমাজের নারীরা তাদের সন্তানদের নিয়ে কতই না সুখে আছে।"[১]

আবার লস্‌এঞ্জেন্‌লসে, শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতীয় প্রবচনে এই শ্লোকটি উপস্থাপন করে কৃষ্ণভাবনামৃতের পরিপূর্ণতার সাথে এর সাদৃশ্যতা টেনেছেন। সেই ভাগবতীয় প্রবচনটি ছিল কুন্তিদেবীর প্রার্থনা থেকে নেওয়া একটি শ্লোকের ওপর : "হে গদাধর (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীচরণ দ্বারা অঙ্কিত হয়ে সুশোভিত হয়েছে। কিন্তু তুমি আমাদের রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না।"[২]

সেই প্রবচনে ও তাৎপর্যে প্রভুপাদ উল্লেখ করেন যে, সব কিছুকেই সুন্দর লাগে যখন কেউ তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকে। চাঁদ থাকার জন্যই আকাশকে এতো সুন্দর লাগে, এমনকি চাঁদ যদি তার প্রভা বিকিরণ নাও করে তবুও। যে কোনো রাজ্যকে সুন্দর লাগে যখন তা সুশাসক কর্তৃক সজ্জিত হয়, কারণ প্রজারা তখন সুখে থাকে। স্ত্রী সুন্দর হন সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ফলে এবং কুৎসিত পুরুষ সুন্দর হন তাঁর পাণ্ডিত্যের ফলে।

জ্ঞানী ব্যক্তির সৌন্দর্য তাঁর জ্ঞান থেকে জাত ক্ষমাশীলতা। প্রভুপাদ তাঁর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে বর্ণনা করেছেন যে, সমাজের প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের একটি নির্দিষ্ট গুণাবলী রয়েছে যার মাধ্যমে সেটা সুন্দর হয়। "ব্রাহ্মণ সুন্দর হন ক্ষমাগুণের ফলে, ক্ষত্রিয় সুন্দর হন বীরত্বে এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতার ফলে, বৈশ্য সুন্দর হন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের উন্নতি সাধন ও গোরক্ষার ফলে এবং শুদ্র সুন্দর হন বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁর প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করার ফলে।"[৩]

কুন্তিদেবীর মন্তব্য এই সাদৃশ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়, সবকিছুই সুন্দর যতক্ষণ কৃষ্ণ সেখানে বর্তমান থাকেন। পরিশেষে বলা যায় যে, সুশাসক, সুন্দরী স্ত্রী এবং প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ব্যক্তি সুন্দর হন, যতক্ষণ তারা কৃষ্ণকেন্দ্রিক হন। কৃষ্ণভাবনাহীন কোনোকিছুরই শ্রী থাকতে পারে না। তাই কুন্তিদেবী বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাণ্ডব এবং আমাদের রাজ্য হস্তিনাপুর সুন্দর হবে। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে সমস্ত বিশ্বই শূন্য।

এই শ্লোকটি পরস্পর সম্পর্কিত দুটো বস্তুর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য সম্পর্কিত হলেও আমি একে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যক্ত করতাম। এই শ্লোকটি প্রকৃত সৌন্দর্যের কথা বলে। আর প্রকৃত সৌন্দর্য একটি সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

প্রকৃত সৌন্দর্য ভোটাভোটির মাধ্যমে নির্ণীত হয় না। কৃত্রিমতা ও কপটতায়পূর্ণ জ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তিকে শ্রীমান করে না। অবশ্যই সেই জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমা ও অন্যান্য গুণসমূহের সমন্বয় থাকতে হয় যা প্রকাশ করবে যে, জ্ঞান তার হৃদয়ের গভীর মূলে প্রবেশ করেছে। একইভাবে একজন নারী দৈহিকভাবে আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু সেটা তার ত্বকের সৌন্দর্য। কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তার সতীত্ব ও পতির সাথে থাকা সুসম্পর্কের মাধ্যমে। স্বামীর জন্য তার হৃদয়ে লালিত ভালোবাসাটুকুই হচ্ছে তার গুণ। চাণক্য আরো বলেছেন যে, কেউ মা হলে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত সৌন্দর্য কখনো ভাসাভাসা হয় না।

এটা সত্য যে, অনেক লোক প্রকৃত সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন করতে পারে না, তাদের নিজস্ব কৃত্রিমতার কারণে। এই শ্লোকটি সৌন্দর্যের প্রকৃত অর্থকে নির্দেশ করে অর্থাৎ তা কেবল দৈহিক সৌন্দর্যকে না বুঝিয়ে গুণসমূহকে বোঝায়।

প্রকৃত সৌন্দর্যের গভীর উপলব্ধি হচ্ছে, সবকিছুকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দর্শন করা। তখন সারা পৃথিবী খুব সুন্দর হয়। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কই সবকিছুকে শ্রীযুক্ত করে। সেগুলোর মধ্যে–পর্বত, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নদী, সমুদ্র, বন-জঙ্গল, সবকিছুই সুন্দর কারণ তা কৃষ্ণের শক্তি। তাঁর শক্তি দর্শন করে আমরা কৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। জড়-জগত হচ্ছে চিন্ময় জগতে ভগবানের শৌর্যবীর্যের এক ক্ষুদ্র প্রকাশ।

কেউ যদি কৃষ্ণের সৃষ্টির সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন না করে, তা নির্বিশেষবাদ, নাস্তিকতা বা শূণ্যবাদের লক্ষণ হতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "ভগবানের আইন অন্ধ বা আকস্মিক নয়, যেমনটা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে। প্রকৃতির আইনের পেছনে ভগবানের পরিকল্পনা রয়েছে, ঠিক যেমন রাষ্ট্রের আইনের পেছনে আইন প্রণয়ণকারী রয়েছেন। আইনের পেছনে কোনো আইন প্রনয়ণকারীকে দেখি কিনা তা কোনো ব্যপার নয় তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আইনপ্রণয়নকারী রয়েছেন। কোনো পরিচালক ছাড়া কোনো বস্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে না। সেজন্য প্রকৃতির আইনের পেছনে আমাদেরকে অবশ্যই ভগবানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে।"[৪]

আমরা অনেকেই নিশ্চিতভাবে জানি এবং সমর্থন করি যে, প্রকৃতি সত্যিই আনিন্দ্য সুন্দর, তবে এর পেছনে মহান ঈশ্বরের অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করি না। আর এদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সর্বেশ্বরবাদ দর্শনেরই পরিপুষ্টি বলে ধরে নেয়া যায়। এদের অনেকেই আবার মানবতাবাদী ও কেউবা শূণ্যবাদী, যারা প্রকৃতির সবকিছুতেই আপাত অর্থহীনতা ও নৃসংতাই শুধু খুঁজে পান। অনেক দার্শনিক আবার জড়া প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অলীক বলে মনে করেন, যা আমাদের পাগল করে।

কৃষ্ণভাবনা অন্বেষণকারী ব্যক্তিগণ প্রকৃতির সৌন্দর্য ও অপরূপ সুষমায় মুগ্ধ হয়েও এর স্রষ্টাকে অস্বীকার করেন না। একজন নবীন ভক্ত হয়তো সমুদ্র বা বনের সৌন্দর্যকে মায়ার প্রতিভূ ভাবতে পারেন। যদি আমরা একে কৃষ্ণের শক্তি বলে ভাবি, তবে এই বস্তু নিশ্চয়ই মায়া নাও হতে পারে।

একইভাবে, ভক্তেরা ইস্‌কনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অনুভব করতে পারেন। ইস্‌কনের এই দর্শনের পেছনে রয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা। ইস্‌কনের ভক্তরা বিশ্বাস করেন, যেহেতু আমাদের কখনো ভাবা উচিত নয় যে

শ্রীল প্রভুপাদ যেহেতু নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন, তাই এর সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর আমরা যখন শ্রীল প্রভুপাদ ও কৃষ্ণকে স্মরণ করি তখন ইস্‌কনকে ভালো লাগে, পক্ষান্তরে তাদের ভুলে গেলেই সব কঠিন বলে মনে হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন, "আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করি, তবে সব কাজই সহজসাধ্য হয়ে যায়, এমনকি যে কাজটি করা অনেক দুঃসাধ্য বলে মনে হয়, তা সহজেই সমাধা করা যায়। যদি কেউ তা না করে, তবে সেটি সহজ বলে মনে হলেও তা করা অনেক কষ্টসাধ্য হবে।"[৫] আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে ইস্‌কনের কেন্দ্র ও একে তার সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ সব সময় প্রত্যাশা করেছেন যেন আমরা আদর্শবাদী হই, তা প্রতিপালন করি এবং যে কোনো বাধাকে তপস্যায় রূপান্তরিত করতে পারি। আমরা যদি তা প্রতিপালন করি, আমাদের জীবন হবে সার্থক এবং আনন্দে পরিপূর্ণ।

ইস্‌কন প্রতিভাবানদের সংঘ, এর প্রচার ক্ষেত্রগুলো প্রতিভার দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং প্রচার পথের বাঁধাসমূহ প্রতিভার দ্বারাই সম্যকভাবে পরাভূত। অনেক অভক্ত রয়েছেন যারা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত, তারা শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে ধন্য হতে পারে। আমরা সাফল্যের জন্য উদ্দিষ্ট একটি লক্ষের শুরুর দিকে রয়েছি। তাই আমাদের সৌভাগ্যকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এ ধরনের পবিত্র ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছেন। আর এটিই ইস্‌কনের সৌন্দর্য। এই জড় জগতেও থাকতে পারে এমন নেতিবাচক মনোভাব লালন করার দরকার নেই। ইস্‌কন শেষ হয়ে যায়নি। এসব বিবৃতি শুনলেই বোঝা যাবে যে, বিবৃতিকারীরা আর ইস্‌কনের সৌন্দর্য দেখতে চায় না। আমরা এখনো ইতিবাচক হলে দেখতে পাব এবং শ্রীল প্রভুপাদকে সবকিছুর কেন্দ্রে রাখার প্রচেষ্টা করতে পারব। তবেই ইস্‌কন সুন্দর হবে এবং ইস্‌কনের সাথে সম্পর্ক রেখে আমরাও সুন্দর হব।

•

১ প্রাতঃভ্রমন, লস্ এঞ্জেলস্, এপ্রিল ৩০, ১৯৭৩।

২ প্রবচন, লস্ এঞ্জেলস্, মে ১, ১৯৭৩।

৩ ভাঃ ৯/১৫/৪০ তাৎপর্য।

৪ লাইট অব ভাগবত, ৩, তাৎপর্য।

৫ চৈ.চ আদি ১৪/১।

শ্লোক ১৯

দাম্পত্যে কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া।
অজাযুদ্ধে মুনি-শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘদম্ভকে ॥

দাম্পত্যে– বৈবাহিক সম্পর্কে; ***কলহে–*** যখন ঝগড়া হয়; ***চ–*** এবং; ***এব–*** অবশ্যই; ***বহ্বারম্ভে–*** আরম্ভের সময়; ***লঘু-ক্রিয়া–*** হাল্কা হয়; ***অজাযুদ্ধে–*** দু'টি ছাগলের মধ্যে যুদ্ধে; ***মুনি-শ্রাদ্ধে–*** মুনিদের শ্রাদ্ধে; ***প্রভাতে–*** সূর্যোদয়ের সময়; ***মেঘদম্ভকে–*** মেঘ গর্জন।

অনুবাদ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়, কিন্তু দ্রুতই তারা তা ভুলে যায়। খুব হালকাভাবেই এদের গ্রহণ করা উচিত ঠিক ছাগলের সাথে ছাগলের যুদ্ধের মতো, বনবাসী সাধুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কিংবা সূর্যোদয়ে মেঘের গর্জনের মতো।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত পুনরায় তিনটি উদাহরণ ব্যবহার করে আমাদের সামনে চতুর্থ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। নীতিগুলো প্রনয়ণে এটাই তার দক্ষতা। আমরা তার সাথে একমত যে, তিনটি বিষয়ই গুরুত্বহীন। আমরা এ ব্যাপারেও সম্মত যে, স্বামী-স্ত্রীর কলহও একইভাবে গুরুত্বহীন।

এই শ্লোকটি কয়েক বার পড়ে এবং শ্রীল প্রভুপাদ যে এই শ্লোকটি সম্বন্ধে বলতেন এবং লিখতেন তা শুনে আমরা এই সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দিতে পারব না যে, তিনি ছিলেন বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘোর বিরোধী। কিছু দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে– দুইটি ছাগল ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু যদি একটু 'হুট' শব্দ করা হয়, তাহলে তারা দৌড়ে পালাবে। সকালের আকাশে নাটকীয়ভাবে মেঘের গর্জন হতে পারে, কিন্তু একটু হালকা বৃষ্টি হলেই সূর্য প্রকাশিত হয়। বনবাসী সাধুরাও অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, কিন্তু তারা তা করেন কেবল ফল-মূল দ্বারা। স্বামী আর স্ত্রী ঝগড়া করে, কিন্তু এতে তাদের কী ফল লাভ হয়? কলহ কোনো ফল প্রদান করে না, কিন্তু এই কলহ কেন তিক্ততা এবং বিচ্ছেদের মাধ্যমে শেষ হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর একজন অতিথিকে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন মন্দিরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন :

প্রভুপাদ : "বিবাহ-বিচ্ছেদকে অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়...তাদের আরো কিছু সময় ঝগড়া করতে দাও, তারা নিজেরাই ঝগড়া বন্ধ করে দিবে। কিন্তু এখন যদি স্বামী ও স্ত্রী ঝগড়া করে এবং তারা যদি আইনজীবীদের কাছে যায়, তাহলে তাদের কোর্টে যেতে হয়। এভাবেই চলছে। সুতরাং প্রথম ক্রটি হলো

কীভাবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তার কোনো উপায় তাদের জানা নেই। সেখানে যা প্রয়োজন, তা হলো বৈদিক সভ্যতা।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজিত বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে যৌবন কাল থেকে স্বামী-স্ত্রী সারা জীবনের জন্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যুবক ও যুবতীরা এভাবে তাদের মানসিকতার ধীরে ধীরে উন্নয়ন ঘটাবে– "সে (যুবতী) আমার স্ত্রী" সে (যুবক) আমার স্বামী।" যুবক ও যুবতীর মনের দর্শনে বিবাহের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। প্রভুপাদ বলতেন, "তাদের মধ্যে ভালোবাসা এত সুদৃঢ় ছিল যে, তারা স্বপ্নেও ভাবতো না যে, 'আমাকে আমার স্বামীকে ত্যাগ করতে হবে'। অথবা 'আমাকে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে' ... তাদের ভালবাসা এতটাই যে, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে। এমনকি গান্ধীজিও তার জীবনে একদিন তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন: "বের হয়ে যাও, আমি তোমাকে চাই না।" তখন গান্ধীজির স্ত্রী (কস্তুরী বাই) রাস্তায় কাঁদতে থাকেন। "আমি এখন কোথায় যাব? আপনি আমাকে বের করে দিয়েছেন? তারপর গান্ধী বললেন, "চলে এসো"...তারপর সবকিছুই ঠিক হয়ে গেল।"[২]

শ্রীল প্রভুপাদও যে তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতেন, তাও তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু "আমার স্ত্রী আমাকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে নিয়ে কখনও চিন্তা করতো না, ঠিক যেমনটি আমিও আমার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলাকে নিয়ে ভাবতাম না। যদিও আমরা ঝগড়া করতাম, তারপরও সেখানে এমন কিছুই ছিল না। ঝগড়া করা স্বাভাবিক, এটা ভালবাসার ঝগড়া।" তাই চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, "ঝগড়াকে গ্রাহ্য করো না। একে কঠিনভাবে গ্রহণ করো না।"[৩]

ইস্‌কনের দুর্বল অবস্থার জন্য প্রভুপাদ চিন্তিত ছিলেন। এক সময় প্রভুপাদ এক দীক্ষা ও বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রবচন দেওয়ার সময় এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন অনুষ্ঠানে সকলেই উপস্থিত থাকে :

প্রভুপাদ : কখনও কখনও প্রচণ্ড গর্জন হতে পারে। কিন্তু ফলাফল খুবই সামান্য, হতে পারে কিছু বৃষ্টি। অনুরূপভাবে, স্বামী ও স্ত্রী ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু আপনি যদি তাদের এই কলহকে ততটা গুরুত্ব না দেন, তাহলে দেখবেন যে তাদের মীমাংসা হয়ে গেছে। এটাই হলো উপায়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে স্বাধীনতার নামে কেবলমাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণে অনেক পরিবারের সদস্যরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই, বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনো অস্তিত্ব নেই। একবার আবদ্ধ হলে, জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই তা আর বিচ্ছেদ হবে না। এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠতা। তাই, আমি মনে করি, তোমরা সকলেই এই প্রতিজ্ঞা করবে। তোমরা সকলেই হ্যাঁ বলো?

ভক্ত : হ্যাঁ।

প্রভুপাদ : হ্যাঁ। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে। এখন তোমরা পরিবর্তন হও এবং তাদের পরামর্শ দাও। প্রথমে মেনে নাও যে, "আমি তাঁর ভার গ্রহণ করলাম। কেন তা ভুলে যাবে? তাহলে কেন সেটা করছ না? আমি তোমাদের বললাম। তাহলে তোমরা তা করছো না কেন? কর।[৪]

কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করার বিশ বছর পরেও ইস্‌কনে এই বিবাহ-বিচ্ছেদ এখনও দেখা যায়। তাই আমি যখন এই শ্লোকের তাৎপর্য লিখছিলাম, তখন আমি প্রভুপাদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিনি। অনেকগুলো বিবাহের ক্ষেত্রে কেন বিবাহ-বিচ্ছেদ-যে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, তার পিছনে যুক্তি দেখানো খুব সোজা। একটি ঘটনায় শ্রীল প্রভুপাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক ভক্তকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আবার বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেবক শ্রুতকীর্তি প্রভু তাঁর কাজ দেখে হতবাক হয়েছিলেন এবং তার নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার সুযোগের প্রতিক্ষা করছিলেন। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীল প্রভুপাদের গাত্রমর্দন করার সময় তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন : "শ্রীল প্রভুপাদ, এই ভক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলছিল?"

শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন যে, সে তা করতে পারে। "হ্যাঁ, আমি জানি," শ্রুতকীর্তি প্রভু বললেন। "কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি সবসময় বলেন যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ বৈদিক সমাজের বিরুদ্ধাচারণ। সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে না।"

শ্রীল প্রভুপাদ বললেন তোমাদের সমাজে তো তা গ্রহণ করা হয়েছে।

"কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে," শ্রুতকীর্তি প্রভু বললেন, "তারা তো আমিষও আহার করছে, নেশাও করছে, তাহলে কেন এগুলোও গ্রহণ করা হচ্ছে না।?"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর উত্তরে বললেন যে, তিনি অনুমতি দিক বা না দিক শিষ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অটল। প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বললেন, যদি তিনি তাঁর শিষ্যকে তা করতে না বলতেন, তাহলেও সে যেকোনো উপায়ে তা করত। তখন আরো বেশি অপরাধ হতো। প্রভুপাদ বললেন যে, তিনি সেই শিষ্যকে অনুমতি দিয়েছেন কেননা তিনি জানতেন যে, সেই ব্যক্তি যেকোনোভাবে সেই কাজ করত। এখন তার অপরাধ এত গুরুতর হবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অনঢ়। ইস্‌কনের ভক্তবৃন্দ এখনও এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ। তারা বিবাহ-বিচ্ছেদকে বিচার করে না আর এভাবে তারা প্রভুপাদের নীতিকে দ্বিধাবিভক্ত করছে। তবুও তারা প্রায়ই বুঝতে পারে না যে, কেনো বিবাহ-বিচ্ছেদ অপরিহার্য। অন্তত আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে,

বিবাহের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা। পরবর্তীতে শ্রীল প্রভুপাদ বিবাহের ক্ষেত্রে একবারেই উদাসিন হন। পূর্বে তিনি ইসকন মন্দিরে হোম-যজ্ঞাদি করার মধ্যমে নিজে স্বয়ং বিবাহ কার্য সম্পাদন করতেন। অনেকগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে শ্রীল প্রভুপাদ বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা বন্ধ করে দেন। আমি মনে করি, এ সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে শ্রীল প্রভুপাদ বিবাহ করার বিরূদ্ধে চললেন। তাই আমি চিঠি লিখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানের বিপক্ষে না। কিন্তু নব-দম্পতিদের দায়িত্ব নিতে হবে। ইসকন নেতৃত্ববৃন্দেরও দায়িত্ব নিতে হবে এবং মন্দিরে বিবাহ অনুষ্ঠান করবে না এবং মানানসই বিচারের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান না হয়ে, যদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং মানুষ হিসেবে ভক্তদের যত্নবান হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার এত বেশি হবে না।

চাণক্য পণ্ডিতের কথা অনুসারে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক খুব খারাপ হয়, তাহলে তার ফলে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হতে বাধ্য, তখন সেই ব্যক্তিকে বনে যাওয়া উচিত। এখানে পুনর্বিবাহের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারেনা। বিবাহ কার্যে শ্রীল প্রভুপাদের উদাসীনতা পুনর্বিবাহকে অনুমোদনের বিষয় নির্দেশ করে না। বৈদিক সভ্যতায় স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকা সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে। যদি কোনো দম্পত্তি একত্রে থাকতে না পারে, তাহলে নারী ও পুরুষকে উদাসীন ভাবে বাস করা উচিত। এটা বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো নয়। যেখানে স্বামী বা স্ত্রী অথবা উভয়ই নতুনকোন সঙ্গী খুজঁতে পারে। তাছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ দুঃখজনক। ঐ দুঃখ তোমাকে আরো বৈরাগ্যপূর্ণ অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীকে উল্লেখ করতে পারি যে, যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে। সাধারণত আমরা মাতাজীদের কুমারীত্ব রক্ষা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও সহ্য করার ক্ষেত্রে মাতাজিদের প্রশিক্ষিত করার গুরুত্ব সম্বন্ধে শুনি। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, দক্ষ স্বামী হওয়ার জন্য প্রভুপাদকেও প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ কমাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, স্ত্রীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুরুষ বিবাহ কার্যে সম্মত হয়। যদি সে অবৈধ যৌনক্রিয়ায় বাধ্য করে, তাহলে কীভাবে তাকে রক্ষা করবে? সুতরাং পুরুষকে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত করতে হবে। তাকে তাঁর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে অন্য নারীদের সঙ্গে যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে না দেখা যায়। বেদে বলা আছে যে, স্বামী যদি অধঃপতিত হয়, তবে স্ত্রীর তার সেবা করার দরকার নেই। আমরা স্বীকার করি যে, স্ত্রীর দায়িত্বভার বজায় রাখার ক্ষেত্রে এবং বিচ্ছেদ বন্ধ করতে পুরুষেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ ব্যবস্থা এই শ্লোকের

অনুসিদ্ধান্তকে পালন করবে না এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়াকে তত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবেন না। গ্রামীন এলাকার দৃশ্যকে আমরা কল্পনা করতে পারি।

একজন বৃদ্ধ দম্পত্তি কুঁড়েঘরের বাইরে বসে আছেন। তাদের প্রতিবেশীদের এক নব-দম্পত্তির মধ্যে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। প্রতিবেশী সব শুনল; তারা বাইরে বসে তাদের মাথা নাড়ল, উহ্ ওরা আবার ঝগড়া করছে। তারা একে এত গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। তাদের একজন আরেকজনকে অভিযুক্ত করে বলছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বৃদ্ধ-দম্পতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি কখনো পিছনে যাব না, আহা তুমি আজ রাত আমাদের কুটিরে থাকতে পার। আগামীকাল সব ঠিক হয়ে যাবে। তারা একে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। পাশ্চাত্য সমাজে বন্ধু-বান্ধবেরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়াকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেয়। এমনকি তারা বিবাহ-বিচ্ছেদকে সমর্থন করে এবং যদি স্বামী-স্ত্রী তাদের সমস্যা সমাধান করতে না চায়, তাহলে তারা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য উৎসাহিত করে। যেহেতু প্রভুপাদ বলেছিলেন একইভাবে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু তাদের এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করার দরকার নেই। তাহলে তারা অল্পেই সমস্যা সৃষ্টি করবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য উৎসাহিত না করার ক্ষেত্রে ভক্তদের সতর্ক হতে হবে। প্রায়ই দেখা যায়, খারাপ বিবাহ অনেক সময় শেষে ভালো হয়। আমি বলি যে, দম্পতির মধ্যকার ঝগড়াকে বন্ধু-বান্ধবেরা এত গুরুত্বের সাথে নিবে না কিন্তু এটা সত্য যে, নবদম্পতিকে শিক্ষিত হতে হবে এবং সমর্থন দিতে হবে যে, তাদের মধ্যকার বিবাহ-বন্ধন যেন অটুট থাকে। বৈধ ইন্দ্রিয় তর্পনের একটি মাধ্যম হিসেবে যেন বিবাহকে গ্রহণ করা না হয়। সুতরাং নৈতিকতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। যা করতে হবে তা হচ্ছে এই বইয়ের পরিধির ঊর্দ্ধে, কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, কোনো বিবাহই পরিপূর্ণরূপে ঝামেলামুক্ত নয়। সুতরাং, দম্পতিকে সহ্যক্ষমতা বাড়াতে হবে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। কৃষ্ণকে কেন্দ্রেরেখে বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করলে সুখী হতে পারবে।

১ কক্ষে আলোচনা, মেলবোর্ন, মে ২১, ১৯৭৫।
২ প্রাতঃভ্রমন, নাইরোবি, নভেম্বর ২, ১৯৭৫।
৩ প্রাতঃভ্রমণ, বোম্বে, মার্চ ২৭, ১৯৭৪।
৪ প্রবচন, সিডনি, এপ্রিল ২, ১৯৭২।

শ্লোক ২০

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্যতে ॥

সর্পঃ– সাপ; ***ক্রূরঃ***– ভয়ঙ্কর; ***খলঃ***– খল ব্যক্তি; ***ক্রূরঃ***– হিংস্র; ***সর্পাৎ***– ***সাপ*** থেকে; ***ক্রূরতরঃ***– অধিকতর হিংস্র; ***খলঃ***– খল ব্যক্তি; ***মন্ত্রৌষধি***– মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা; ***বশঃ***– সংযত; ***সর্পঃ***– সাপ; ***খলঃ***– দুষ্ট ব্যক্তি; ***কেন***– কিসের দ্বারা; ***নিবার্যতে***– নিবারিত হয়।

অনুবাদ

দু'ধরনের হিংসুক প্রাণী আছে; যথাঃ সাপ এবং সাপের ন্যায় ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট মানুষ। এ দুইয়ের মধ্যে সাঁপের মতো ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট মানুষ অধিক ভয়ানক। কারণ মন্ত্রের দ্বারা সাপকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও ক্রূর স্বভাবের মানুষকে বশীভূত করা যায় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মনুষ্য জাতির হিংসা এবং তা কীভাবে কাউকে প্রভাবিত করে তাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়, তার কুৎসিত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। হিংসুক ব্যক্তি সবচেয়ে মহৎ ও সাধু ব্যক্তিরও সমালোচনা করতে পারে। এই শ্লোক পড়ে আমি ঈর্ষার শিকার না হওয়ার কথা ভাবছি। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি দয়া করে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন এবং আমার সকল অনর্থ বিশেষত ঈর্ষাকে ধ্বংস করুন। আমি আন্তরিকভাবেই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে চাই এবং এই রোগ থেকে মুক্তি চাই।

সাঁপের উদাহরণ দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ক্রূর ও মাৎসর্যপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রথমে দুঃখ ভোগ করে। দাবানল হলে বনের সকল প্রাণীই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বুকে ভর দিয়ে ভূমির শুকনো পাতার মধ্য দিয়ে চলার কারণে সাপই সবার আগে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। "একইভাবে পৃথিবীতে যখন কোনো চরম বিপর্যয় হয়, সাঁপের ন্যায় ক্রূর ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"[১]

সাপ এমন হিংস্র প্রাণী, যা কোনো কারণ ছাড়াই অন্য প্রাণীদের দংশন করে। "সাপকে কেন এত নির্দয় বলা হয়? কারণ তারা অযথাই কামড়ায়। যদি তোমার প্রতি কোনো অপরাধ হয়, আর তুমি আমাকে কামড়াও, তবে সঙ্গত কারণেই তা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই, তবুও তুমি আমাকে দংশন করছো, তা মেনে নেওয়া যায় না। বৃশ্চিক আর সাপ

কোনো কারণ ছাড়াই কামড়ায়।”[২] কারো সাপের শত্রু হওয়ার দরকার নেই, সাপ প্রকৃতিগতভাবেই সকলের শত্রু।

কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ এই সর্পজাতির চেয়েও ভয়ানক। মনুষ্যজাতির চেতনা উন্নত। যদি সে তার চেতনাকে ঈর্ষা ও হিংসাত্মক কর্মে নিয়োজিত করে, তবে তার হৃদয় পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যদিও ভারতবর্ষে সাপুড়েরা মন্ত্র বা বীণের মাধ্যমে সাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু একজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় নেই। “মন্ত্র, ঘুষ বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।”[৩]

এমনকি ভক্তরাও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের হাত থেকে রেহাই পায় না। অভক্তরা প্রায়ই নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করে। “হতে পারে, কেউ অনেক শিক্ষিত। তা খুব ভালো। কিন্তু আমাদের কাছে, কৃষ্ণভাবনাহীন কেউ খুব বেশি মূল্যায়ন পাবার যোগ্য নয়। তিনি সাধারণ ব্যক্তি হলেও ভয়ানক।”[৪]

শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্যের আরেকটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, “যদি আপনি একজন মূর্খকে সদুপদেশ দেন, তবে সে ক্রুদ্ধ হবে।” শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্পর্কে যিশুখ্রিস্টের উদাহরণ দিতেন। “যিশুখ্রিস্ট কিছু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি রোমান বিচারক তার দোষ অস্বীকার করেছিলেন– তার কোনো দোষ নেই। কিন্তু তারা সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার অব্যাহত রেখে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।”[৫]

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে অভক্তদের বিষধর সাঁপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। “আবার যে গৃহস্থের গৃহে ভগবদ্ভক্তের চরণ পড়ে না, যেখানে ভক্তের পদধৌত করার জন্য কোনো জল থাকে না, সেই গৃহ সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হলেও তা বিষধর সর্পসংকুল বৃক্ষের মতো।”[৬]

শ্রীল প্রভুপাদকেও সাধু হিংসার কবলে পরতে হয়েছিল। “আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করছি। তাই আমাদের দোষ কোথায়? আমরা শুধু সবাইকে শেখানোর চেষ্টা করছি– কোনো অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ নয়, নেশা, তাস, পাশা, জুয়া এমনকি মাংসাহারও নয়, কিন্তু তারা একে অন্যভাবে নিচ্ছে। তারা বলছে, “খুব মারাত্মক” কোনো দোষ নেই, তবুও তারা দোষ অন্বেষণ করে আমাদের উদ্বেগ দিচ্ছে।”

ভক্তের একটি ভূষণ হচ্ছে, ঈর্ষার সম্মুখীন হলেও সে সহ্য করতে পারে। ভক্ত সর্বদাই সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল এবং সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। সে জন্য প্রচারকেরা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে।

ভক্তরা অহিংসনীতি দৃঢ়ভাবে পালন করে। তারা একটি পিঁপড়েকেও মারতে

চান না। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছিলেন যে, যখন তার গুরুমহারাজ একটি সাপকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি খুব হতবাক হয়েছিলেন।

"অনেক আগে, প্রায় ১৯৩৩ সালে চৈতন্য মঠে আমার সামনে হঠাৎ একটি সাপ এসে পড়ে। আমি তখন স্নান করছিলাম। তাই প্রত্যেকেই ভাবছিল কী করা যায়। গুরুমহারাজ ছিলেন উপর তলায়। তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন, "মেরে ফেল।" তাই সাপটিকে তখন মেরে ফেলা হয়েছিল। সে সময় আমি ছিলাম একজন নবীন ভক্ত। তাই আমি ভাবছিলাম এটি কেমন হলো? গুরুমহারাজ সাপটিকে মেরে ফেলতে বললেন! আমি কিছুটা হতবাক হয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকটি দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম '*মোদেত সাধুরপি অপি বৃশ্চিক্ সর্প-হত্যা।*' অর্থাৎ বৃশ্চিক-সর্প আদি প্রাণীর প্রতি কোনোরূপ দয়া দেখানো উচিত নয়।"[৮]

শ্রীল প্রভুপাদ এখানে যে শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন, সেটি শ্রীমদ্ভাগবতমের সপ্তম স্কন্ধে ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করার সময় প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন। "হে ভগবান নৃসিংহদেব, আপনি কৃপাপূর্বক আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তি যেমন সাপ অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমগ্র জগৎও তেমনি, এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে।"[৯]

ভগবদ্ভক্তগণ অত্যন্ত দয়ালু। সে জন্য তারা ঈর্ষাপরায়ণদের ব্যাপারেও চিন্তা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি তার নিজের জন্য প্রার্থনা করেননি, তিনি স্নিগ্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ, দুর্মতি– সকল প্রকার জীবের জন্যই প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি সর্বদাই তার পিতা হিরণ্যকশিপুর মতো দুষ্কৃতকারীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। এটিই বৈষ্ণবদের স্বভাব, তিনি সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত-ধর্ম পরম নির্মৎসর ব্যক্তিদের জন্য। সে জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন, " সকল খল ব্যক্তিরাও অনুকুল হোক।"[১০]

কৃষ্ণের কৃপায় ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিও ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে উদারভাবে অন্যদের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে। "তাই ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, যাতে তিনি আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত– '*বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহঃ* ' হে নৃসিংহদেব, আপনি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে অবস্থান করে, হৃদয়ের অসৎ প্রবৃত্তি সংহার করুন।

আমার মন সর্বতোভাবে নির্মল হোক, যাতে আমি প্রশান্তচিত্তে ভগবানের আরাধনা করতে পারি এবং সারা জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারি।"[১১]

প্রহ্লাদ মহারাজ এ রকম কৃপা প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। যদিও তার পিতা হিরণ্যকশিপু তাকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার বা হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তার পিতার মতো সবচেয়ে আসুরিক ব্যক্তিসহ সকলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

কোনো মানুষকে আমরা তার হৃদয়ে ঈর্ষার পরিমাণ বিচার করেই যাচাই করতে পারি। ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে কেউ ঈর্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে। যদিও চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঈর্ষা-নামক ভয়ানক রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো ঔষধ বা মন্ত্র নেই, কিন্তু তিনি হয়তো মহামন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে জানতেনই না। "মন্ত্রশক্তি বলে সর্পাঘাতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবিত হতে পারে। গ্রামে এখনও সাপুড়ে দেখা যায়। আমাদের মায়াপুরে এখনও একজন মুসলিম ভদ্রলোক রয়েছেন, যিনি কি না সাপে কাটা মানুষকে মন্ত্রের দ্বারা বাঁচাতে পারে। তাই আমাদের এই দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকর কর্ম হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, যাতে অন্যরাও তা শ্রবণ করতে পারে।"[১২]

এই শ্লোক এবং এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের পন্থা অধ্যয়ন করে আমরা হিংসাকে বড় একটি সমস্যারূপে দেখতে পাই। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করাই এর একমাত্র প্রতিকার। আমাদের এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অনুশীলন করা এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলজনক কাজ হিসেবে এটি সকলের কাছে বিতরণ করা উচিত।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "একজন ব্যক্তি যদি খুবই হিংসুক হয়, তাহলে সে কীভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র গ্রহণ করতে পারবে?" ভক্তরা হরিনাম সংকীর্তন, গ্রন্থ বিতরণ ও আরও বিভিন্ন কৌশলে সকলের মাঝে অকাতরে প্রচার করেন। যদি বিষাক্ত সাপ সামনে তেড়ে আসে সেক্ষেত্রে ভক্তরা নিশ্চয় তার কাছে প্রচার করবে না, তাকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। প্রচারকগণ সাধারণত সরল মানুষের কাছেই প্রচার করেন, কিন্তু তারা যদি নির্বিশেষভাবে সকলের কাছে প্রচার করে, তাহলে হিংসুক ব্যক্তিরাও এই দিব্যনাম না শুনে থাকতে পারবে না এবং তখন তাদের চিত্তও নির্মল হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে সমগ্র সমাজ উপকৃত হবে। কিন্তু তখনও বিষধর সাপের মতো ব্যক্তিরা কৃপা লাভের সুযোগ গ্রহণ করবে না। চাণক্য পণ্ডিতের আরেকটি শ্লোক রয়েছে যেখানে ঐ রকম হিংসুক ব্যক্তির কাছে সৎ পরামর্শ দেওয়ার দিতে করা হয়েছে।

আমাদের সাথে যদি এ রকম কারও দেখা হয়, তাহলে আমাদেরকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। একজন ভক্ত সবসময় ধৈর্যশীল ও কৃপালু। '*তিতিক্ষব কারুণিকা*।' বৈষ্ণবের ধৈর্য্যের উদাহরণ হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদ যিশু খ্রিস্টের প্রার্থনা উল্লেখ করতেন : "পিতা তাদের ক্ষমা করে দিন, তারা কী করছে তারা তা জানে না।" তার অনেক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কেউ তাকে হত্যা করতে এলেও তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেন না।

একজন হিংসাত্মক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ, ভক্তকে তার কর্মফল হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত। কেউ যদি আমাদের হিংসা করে তবে ধরে নিতে হবে যে, সেই ব্যক্তি আমাদের কর্মফল প্রদানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। আবার সেই ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ভক্ত কিংবা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আঘাত হানার চেষ্টা করে, তবে আমাদেরকে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

কেউ যদি ইস্‌কনকে আঘাত বা অবমূল্যায়ন করে, সেক্ষেত্রে ভক্তরা গণমাধ্যম কিংবা ব্যক্তিগতভাবে প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারে। এভাবে ভক্তদের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ এই আন্দোলনের নিন্দাকারীদের প্রায়ই হিংসুক বলে আখ্যায়িত করতেন। ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলতেন, "এই আন্দোলনের সমালোচনাকারীরা অবশ্যই দোষী।" এমনকি তাদের দাবিগুলো সঠিক হলেও, আমরা একে 'কেবল পরশ্রীকাতরতা' বলেই বিবেচনা করতাম। ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, আমাদের বিপক্ষে সমালোচনা হিংসাবশত হলেও, তাদের সমালোচনার কিছু সত্যতাও রয়েছে। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, স্বর্ণ নোংরা জায়গায় পড়ে থাকলেও তা তুলে নেওয়া উচিত।

ভগবানের প্রতি হিংসা থেকেই মূলত আমাদের হিংসার সৃষ্টি। আমরা সকলেই চিন্ময় আত্মা এবং আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি রয়েছে। আমাদের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য হলো কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহারের কারণে হিংসুক হয়ে যাই এবং পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের স্থান দখল করতে চাই। এই হিংসা থেকেই অন্যান্য হিংসার সূত্রপাত হয়।

ভগবদ্গীতায় ভবকূপে পতিত হওয়ার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ধ্যান করি, তখন তা লাভ করতে গিয়ে আমাদের কাম বাসনার সৃষ্টি হয়। এই কামই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহারের কারণ। কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধের কারণে

বুদ্ধি বিমোহিত হয় এবং স্মৃতি ধ্বংস হয়। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যখন বদ্ধ জীবদের জন্য ষড়রিপু সৃষ্টি করেছিলেন : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য তখনই আমাদের বাসনা শুরু হয়।

অসৎসঙ্গ থেকে হিংসার উদ্রেক হয়। অসৎসঙ্গ মানে জাগতিক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, যারা কর্ম অনুসারে লাভ করা বস্তু নিয়ে সন্তুষ্ট না হতে শিক্ষা দেয়। যা আছে তা নিয়েই যদি আমরা সন্তুষ্ট না হই, তবে আমরা অন্যদের জিনিসের প্রতি লালায়িত হব। এই অনুভূতি এতটাই তীব্র যে, এমনকি সেই বস্তুর অধিকারীকে পর্যন্ত ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

ভক্তদের হিংসার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা উচিত। আমরা যদি কৃষ্ণভাবনামৃতে সন্তুষ্ট না হই এবং ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করি, তবে আমাদের ঈর্ষার উদয় হয়। অনিবার্য কারণেই এই পৃথিবীতে আমাদের যা আছে, অন্যদের তা থেকে আরও বেশি কিছু থাকবে। আমরা যদি করুণার পরিবর্তে ঈর্ষার বশবর্তী হই তবে আমাদের যা কিছু আছে (কৃষ্ণভাবনামৃতের উপহার) তা অন্যদের না দিয়ে, অন্যদের যা কিছু আছে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হব।

এই জড় জগতে যারা বিষয় সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক আসক্ত এবং সেসবের ভারে নুয়ে গেছে, তাদের দেখে একজন শুদ্ধ ভক্ত কখনই ঈর্ষান্বিত হন না। হিংসা করা শিশুসুলভ আচরণ, তাই বৈষ্ণবের মনে এর স্থান দেওয়া উচিত নয়।

একজন ভক্ত কেন অন্যজনকে হিংসা করে? তা যদি সত্য হয়, তবে কৃষ্ণের প্রতিও ঈর্ষা সৃষ্টি হয়। এ জড় জগতে সকল বদ্ধ জীবের হৃদয়ে কিছুটা হলেও ঈর্ষা রয়েছে। একজন ভক্ত প্রায়ই অন্য ভক্তের ঈর্ষার বিষয় হন। "একজন ঈর্ষাপরায়ণ ভক্ত ভাবেন যে কেন আরেকজন ভক্ত এতটা কৃষ্ণভাবনাময়? কোনো ভক্ত কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হলেও আমি কিছু মনে করি না, কিন্তু এই ভক্ত আমাকে উন্মাদ করে দিচ্ছে।" অন্যদের কাছে আমরা যখন আমাদের চেয়ে বেশি কিছু থাকতে দেখি তখনই ঈর্ষান্বিত হই।

তার মানে আমাদের নিজেদের মনোভাব এখনো শুদ্ধ হয়নি। আমরা এখনও নাম, যশ, খ্যাতির জন্য অভিনয় করছি মাত্র। জড় বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা থেকে মুক্ত হতে আমরা পারমার্থিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও আমরা সেই জড় বিষয়ের জন্য প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছি, যার জন্য আমাদের এই জড়জগতে প্রেরণ করা হয়েছিল। জড় জগতে নিজের উন্নতি লাভ অন্যের মূল্য দিয়েই করতে হয়। ধর্মবাদীদের ফাঁদ– বেশি না খাওয়া, কঠোর তপস্যা, কৃষ্ণ কথা বলা এগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে পারমার্থিক আন্দোলনে আমাদের জড় বাসনার উদয় হয়। প্রকৃত উন্নতি হোক বা না হোক, আমরা মনে করি যে, যদি এসব নিয়ম-কানুন মেনে

চলি, তাহলে ভক্তরা আমাদের পছন্দ করবে। কিন্তু যখন আমরা দেখি অন্য ভক্তরা ভক্তি জীবনে উন্নতি করছে তখন আমাদের মনে হয়, " প্রকৃতপক্ষে কেউই উন্নতি লাভ করছে না, আমি-ই সবচেয়ে ভালো করছি।" প্রকৃত কৃষ্ণভাবনা লক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, কোনো বাহ্য আচরণের দ্বারা নয়। তখনই আমাদের ঈর্ষার আবির্ভাব ঘটে। এটি মূলত জড় বাসনা ও নিজেদের ব্যর্থতা থেকেই সৃষ্টি হয়।

তাই ভক্তদের উচিত ঈর্ষার পরিবর্তে সততা ও দীনতার চর্চা করা। কোনো ভক্তের উন্নত অবস্থা থেকে তাকে টেনে নিচে নামানোর মনোভাবের চেয়ে, বিনীতভাবে যা চর্চা করছে তা আমাদেরও করা উচিৎ। এমন বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা আমরা বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করতে পারব এবং ভক্ত হিসেবে উন্নতি লাভ করতে শিখব।

মজার ব্যাপার হলো, ভক্তদের হৃদয়ে যে ঈর্ষার উদয় হয়, তার বেশিরভাগই মূলত অন্য ভক্তদের দেখে। একজন ভক্তের ছেঁড়া বস্ত্র দেখে কীভাবে আরেকজন অভক্ত ঈর্ষান্বিত হতে পারে? যাই হোক, এও সত্য যে ভক্তদের সুখে অভক্তরা ঈর্ষান্বিত হতে পারে। কারণ সে ভগবানকে বিশ্বাস করে না, তাই সে বুঝতে পারে না কীভাবে পারমার্থিক জীবনে সুখ লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ একজন ভারতীয় ধনী ব্যক্তির সত্য কাহিনী বলেছিলেন। সেই লোকটি একদিন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে দেউড়িতে বসে বিমর্ষভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তখন স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে? তুমি অসুখী কেন? তোমার সবকিছুই আছে– সম্পদ, ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়-সুখ সব।" ঠিক তখন, একজন বৃদ্ধ সাধু ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে হাঁটছিলেন। ধনী লোকটি বললেন, "আমি তার মতো হতে চাই।" ধনী লোকটি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু পারে না, তারা ঈর্ষার মাধ্যমে তাদের হতাশা প্রকাশ করে। সেই লোকটি সাধুকেও অপমান করতে পারেঃ "এখান থেকে চলে যাও, তুমি কোনো কিছুর জন্যও ভালো নও।"

অনুরূপভাবে, ভক্তরা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার কারণেও মানুষ তাদের দেখে মাঝে মাঝে ঈর্ষা করে। তাই তারা ভক্তদের ফাঁকিবাজ বলে। ভক্তরা অবশ্যই অভক্তদের অবৈধ কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তসঙ্গে যোগদান করতে আহ্বান করে। এতে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়। কীভাবে তারা জীবনের মূল ভিত্তিগুলো এত সহজে ত্যাগ করতে পারবে? তারা হতাশাগ্রস্ত ও ঈর্ষান্বিত থাকতেই পছন্দ করে।

যারা শ্রীল প্রভুপাদকে দেখতে এসেছিলেন, তিনি তাদের অনেকেরই ঈর্ষামূলক সমস্যা সমাধান করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন প্যারিসে প্রবচন দিচ্ছিলেন, তখন শ্রোতারা বলেছিল, "নিচে নেমে আসুন, নিচে নেমে আসুন। আপনি কেন বিশাল আসনে বসে আছেন?" তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, জনসমক্ষে প্রবচন দেওয়ার সময় তার ব্যাস আসনে বসা উচিত হবে না।

অন্য একদিন, শিকাগোতে একজন রিপোর্টার তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। তিনি এবং ঐ রিপোর্টার একই মেঝের উপর বসেছিলেন, যদিও প্রভুপাদের ব্যাসাসনটি তার পিছনে ছিল। রিপোর্টার যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, সেই আসনটি কার জন্য রাখা। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, "এটি আমার জন্যই রাখা হয়েছে, কিন্তু আমি যদি এই আসনের উপর বসি, তাহলে আপনি ঈর্ষান্বিত হবেন।"[১৩] শ্রীল প্রভুপাদ তাদের ঈর্ষান্বিত করতে চাননি। যদিও তিনি বলেছিলেন, তিনি কী করতে চেয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় এক সাক্ষাৎকারের সময় সভাকক্ষটি বিবাদে মুখর হয়েছিল। ঠিক তখন তিনি তার শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি আর জনসমক্ষে প্রবচন দিবেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চাননি। যদিও অবশেষে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কারো মতামতের পরোয়া করেন না। তিনি বলেছিলেন, তিনি ঈর্ষান্বিত গুরুভাইদের এবং ভারতীয় ঈর্ষান্বিত জাত ব্রাহ্মণদের পরোয়া করেন না। শ্রীল প্রভুপাদ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই কৃষ্ণভাবনামৃতের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান করতেন। "কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে কী লাভ, রাস্তার গাড়ি তো চলবেই।" তিনি সর্বদাই জানাতেন যে, অন্যদের ঈর্ষা সত্ত্বেও কৃষ্ণ আমাদের সুরক্ষা করবেন।

১ প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ৩০,১৯৭৬।
২ প্রবচন, বোম্বে, নভেম্বর ২১, ১৯৭৪।
৩ প্রবচন, মায়াপুর, ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৭৪।
৪ কক্ষে আলোচনা, বোম্বে, সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৭৩।
৫ প্রবচন, মন্ট্রিয়েল, আগস্ট ২২, ১৯৬৮।
৬ ভাঃ 4/২২/১১।
৭ প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ৩০, ১৯৭৬।
৮ প্রবচন, মায়াপুর, ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৭৬।
৯ ভাঃ ৭/৯/১৪।
১০ ভাঃ ৫/১৮/৯ তাৎপর্য।
১১ ভাঃ ৫/১৮/৯ তাৎপর্য।
১২ প্রবচন, বোম্বে, ডিসেম্বর ২৯, ১৯৭৪।
১৩ সাক্ষাৎকার, শিকাগো, জুলাই ১৯৭৫।

শ্লোক ২১

আয়ুষঃ ক্ষণ একোহপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ।
স চেন্নিরর্থকং নীতঃ কা নু হানিস্ততোহধিকা ॥

আয়ুষঃ– কারোর সমগ্র জীবন কাল; ***ক্ষণঃ–*** এক মুহূর্ত; ***একঃ–*** এক; ***অপি–*** এমনকি; ***ন–*** না; ***লভ্যঃ–*** লাভ করা; ***স্বর্ণ–*** স্বর্ণ; ***কোটিভিঃ–*** কোটি সংখ্যক; ***স–*** এই (মুহূর্ত); ***চেৎ–*** যদি; ***নিরর্থকং–*** অনর্থক; ***নীতঃ–*** সম্পন্ন হওয়া; ***ক–*** কি; ***নু–*** বস্তুত; ***হানি–*** ক্ষতি হয়; ***ততো–*** তার চেয়ে; ***অধিকা–*** অনেক বেশি।

অনুবাদ

জীবনের একটিমাত্র মুহূর্তও যদি বৃথা ব্যয় হয়, তবে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট করার চেয়ে বেশি ক্ষতি আর কী হতে পারে?

তাৎপর্য

অযথা সময় নষ্ট করার ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা এ শ্লোকটি হৃদয় স্পর্শ করার মতো। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই এ শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই প্রবচনের সঠিক সময় ও তারিখ উল্লেখ করে বলতেন, এই তারিখের এই সময় আর কখনই আসবে না। "ঘণ্টা বা দিনের কথাতো বলাই বাহুল্য, চাণক্য পণ্ডিত তার জীবনের প্রতি মুহূর্তের হিসেব রাখতেন। যেমন– ১৯৬৮ সালের ১৫ মার্চ, সময় ৭:৩৫। আর ১৯৬৮ সালের এই ১৫ মার্চের ৭:৩৫ মিনিট কাল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখনই ৭:৩৬ মিনিট হবে তখন আর কোনোভাবেই ১৯৬৮ সালের ১৫ মার্চের ৭:৩৫ সময়টি ফিরিয়ে আনা যাবে না। এমনকি যদি আপনি লক্ষ লক্ষ ডলারের বিনিময়েও চান, তবুও যা হারিয়েছে তা চিরতরেই হারিয়েছে। যদি আপনি এই মূল্যবান সময় নষ্ট করেন, তাহলে চিন্তা করুন আপনি কতটা হারিয়েছেন।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যবসার নীতি 'সময়ই অর্থ' কথাটি উল্লেখ করতে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, জাগতিক দৃষ্টিতে এটি একটি ভালো নীতি। কিন্তু পারমার্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদের আরও নির্ভুল ও দৃঢ় হতে হবে (*অব্যর্থকালত্ব*)।[২] নীতিশাস্ত্রের অনেক উদ্ধৃতির মতো এই নীতিটিও আমাদের অনেকেরই জানা। শুনতে অল্প মনে হলেও, তার মূল্য উপলব্ধি করতে পারলে যেকোনোভাবেই হোক তা আমাদের জাগিয়ে তুলবে। চাণক্য এখানে সময়ের আর্থিক মূল্যের কথা বলতে গিয়ে– লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার সাথে তুলনা করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, "ভারতে আমার এক বন্ধুর বয়স তখন ৫৪ বছর হয়েছিল। কিন্তু সে প্রায় মৃত্যুমুখে

পতিত হতে যাচ্ছিল। তাই সে ডাক্তারকে মিনতি জানিয়ে বলল, 'দয়া করে, আমার আয়ু আরও চার বছর বাড়িয়ে দিন, আমাকে অনেক কিছু করতে হবে।' দেখুন কেমন পাগল। সে জানে না, চার বছর কেন ডাক্তার তার আয়ু চার মিনিটও বাড়াতে পারবে না। আপনি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে আপনার আয়ু বাড়াতে পারবেন না। চার বছরের কী কথা, চার সেকেন্ডও বাড়াতে পারবেন না। আমাদের জীবন যে কত মূল্যবান তা বোঝার চেষ্টা করুন।"[৩]

মাঝে মাঝে ভক্তরা মনে করে, দীক্ষার সময় তাদের কর্মফল গুরুদেবকে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়। ভগবদ্গীতায় পাঁচটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যার একটি হচ্ছে কাল এবং অন্যটি কর্ম। এই পাঁচটির মধ্যে কেবল কর্মই পরিবর্তনযোগ্য। যাই হোক, আমাদের কর্ম পরিবর্তন হলে আমাদের জীবনকাল বর্ধিত হতে পারে। কিন্তু এটা ভক্তিজীবনের মূল লক্ষ্য নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বেই কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া, তা সে যখনই আসুক না কেন।

গুরুদেব বা কৃষ্ণ আমাদের জীবনকাল পরিবর্তন করবেন না, বরং সময়ের প্রতি আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তারা শেখান যে আমরা সময় প্রাপ্ত হয়েছি, কৃষ্ণকে অর্পণ করার জন্য। তারা আরও শিক্ষা দেন যে, জড় জগতে থাকা অবস্থায়ও আমরা কালের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। এমন নয় যে, একজন ভক্ত জীবনের ছয়টি পর্যায়: জন্ম, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার, সন্তানপালন, ক্ষয় এবং মৃত্যু এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

ভক্তের জন্য জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সাথে ব্যক্তিগত ভাবের আদান-প্রদান। কৃষ্ণ চাইলে আমাদের আয়ু বর্ধিত করতে পারেন অথবা হ্রাসও করতে পারেন। তার সিদ্ধান্তের ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। এমন নয় যে আমরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে আমাদের রক্ষা করতে পারি, যেখানে মৃত্যুর প্রভাব খুব কম। যদি কৃষ্ণ কাউকে হত্যা করতে চান, তবে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না; আবার যদি তিনি কাউকে রক্ষা করতে চান, তবে কেউই তাকে মারতে পারে না। কৃষ্ণ সরাসরিই আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেন। তাই কখন মৃত্যু আসবে, এ ব্যাপারে ভক্তদের কোনো চিন্তা করতে হয় না। মৃত্যু তাই ভক্তদের জন্য কোনো অনিশ্চিত বিষয় বা কোনো কর্মফল নয়। তা কোনো অবিচার বা কোনো শূন্য বা অস্তিত্বের কোনো পরিসমাপ্তি নয়। কাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দেরি হওয়ার পূর্বেই যেন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করি।

সুতরাং আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে যে সময় নষ্ট না করা বলতে কী বোঝায়। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কাজে নিমগ্ন থাকা এবং 'পরিপূর্ণভাবে' বা 'জীবন একবারই, তাই যত পার ভোগ করে নাও'– এমন দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি

ভিন্ন ধরনের। এই শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করতে হলে, মানবজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে তা শিখতে হবে।

প্রহ্লাদ মহারাজ তার সহপাঠীদের শিক্ষাদানের সময়, সর্বোচ্চ একশত বছরকাল এই মানবজীবনকে নষ্ট না করার কথা বলেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে প্রহ্লাদ মহারাজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, "বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও হিসাব-নিকাশ করতে অত্যন্ত পটু, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে জ্ঞানের অভাবে তারা কীভাবে তাদের মূল্যবান জীবনের অপব্যবহার করছে, তবুও তারা সংসার জীবনের নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না।"[৪]

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব দেবহুতিকে বলেছেন, "মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাব জানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের দ্বারা পরিচালিত হলেও তার অসীম বিক্রম সম্পর্কে জানতে পারে না।"[৫] আপাত মনে হতে পারে যে আমরা সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরাজিত হচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা কখনই এমন নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মাধ্যমে সূর্য আমাদের জীবনকাল হরণ করে। আমাদের জীবনকালও সীমিত, ঠিক যেভাবে কোষ্ঠীতে লেখা রয়েছে। এমনকি একজন বিখ্যাত দার্শনিক বা বিজ্ঞানীও তার জীবনকাল বর্ধিত করতে সক্ষম নয়। যে সময় তার মরণকাল আসবে, তাকে অবশ্যই মরতে হবে।

যদি এ বিষয়ে কাউকে তর্কে আহ্বান করা হয়, তবে তাকে অবশ্যই এই সত্যে উপনীত হতে হবে। কিন্তু কলিযুগ এতই দুর্ভাগা যে বহু প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের সফলতার দ্বারপ্রান্তে আসা সত্ত্বেও মানুষ তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য তথা পারমার্থিক অগ্রগতির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, "অত্যন্ত আসক্ত (গৃহমেধী) বুঝতে পারে না যে শুধু সংসার প্রতিপালনের জন্য তাদের বহু মূল্যবান সময় তারা অপচয় করছে। তারা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমেও ব্যর্থ হয়। পরম সত্য উপলব্ধিতে সক্ষম জীবনটি আড়ালেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"[৬] জন্মান্তরের বা প্রকৃতির নিয়মানুসারে যদি আপনি মনুষ্য জীবনকে হেলায় নষ্ট করেন, তবে পরবর্তী জন্মে আপনি কুকুরের দেহ পাবেন। এই ভয়াবহ পরিণতির কথা না জেনে অথবা বহু মূল্যবান সময়ের প্রকৃত উপযোগ না জেনে সকলেই তা নষ্ট করে, এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্তেও। "মনুষ্য শরীরের একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে এবং এটা খুব মূল্যবান কিন্তু তারা খেলাধুলা, সাঁতার কাটা এবং সার্ফিংয়ের মতো অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করছে। বিশেষতঃ পশ্চিমা দেশগুলোতে। মানুষ কত সময় ব্যয় করছে, আমি শুধু দেখি আর হাসি। বৃদ্ধ মানুষেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে আছে, কেবল একটি মাছ ধরার জন্য। দেখুন কেমন তাদের সভ্যতা।"[৭]

শুধু বৃদ্ধরাই নয়, সম্ভাবনাময় যুবকেরাও সময় নষ্ট করে। প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "এর অর্থ শুধু আর্থিক উন্নতির জন্য তুমি তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছো। এটা সম্ভব নয়। তুমি যদি কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই দুঃখ পেতে পার, তবে প্রচেষ্টা ছাড়া সুখও পাবে। কেননা এটাই নির্ধারিত।"[৮] তাই এ জগতের সমস্ত প্রচেষ্টাই হচ্ছে বরফের মধ্যে গাড়ির চাকার ঘূর্ণনের ন্যায়।

যোগীরা কাল সম্বন্ধে কিছুটা অবগত। তাই তারা হঠযোগের মাধ্যমে তাদের আয়ু বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করে। "হঠযোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে সময় বাঁচানো।"[৯] এজন্য যোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। জীবনকাল শ্বাস গ্রহণের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে, দিনের সংখ্যার ওপর নয়। যোগীরা তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘায়িত করে তাদের জীবনকাল বর্ধিত করে। কিন্তু তারা অমর হতে পারে না। সময়ের অপব্যবহার বন্ধ করতে হলে কাউকে প্রথমেই এর মূল্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। "কেন আমরা আমাদের মূল্যবান অলংকার খুব সতর্কতার সঙ্গে রাখি? কারণ আমরা জানি, যদি আমি এই রত্নটি হারিয়ে ফেলি, তবে আমার আর্থিক ক্ষতি হবে।"[১০] বদ্ধ জীবাত্মার মনুষ্য শরীর পেতে বহু বহু জন্ম অপেক্ষা করতে হবে। মনুষ্য শরীর অত্যন্ত দুর্লভ ও মূল্যবান।

সময় অপব্যবহারের সমাধান হলো কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করা, কিন্তু সেটিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। সাধারণত সকলেই মনে করে যে বৃদ্ধ হলে পারমার্থিক জীবন অনুশীলন করবে। এটা মায়া বা বিভ্রান্তি। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "*ধর্মম্ ভাগবতম্*। কৃষ্ণভাবনাময় বা ভগবৎভাবনাময় হওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের এমনকি এক মুহূর্তও নষ্ট করা ঠিক হবে না। এক্ষুনি শুরু করতে হবে।"[১১] কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের কৃষ্ণচেতনাবিহীন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করাও বিপজ্জনক। আমরা মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারি না, কিন্তু তার পূর্বে আমাদের অবশ্যই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া প্রয়োজন। তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। সেজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, শক্তি-সামর্থ্য থাকতেই আমাদের কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন শুরু করা উচিত। মনুষ্য জীবনকালের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেই পূর্ণরূপে কৃষ্ণচেতনাময় হওয়ার মাধ্যমে কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, "আমার গুরুমহারাজ প্রায়ই বলতেন, "আপনি আরেকটি জন্মের জন্য অপেক্ষা করবেন কেন? এই জীবনেই কৃষ্ণভাবনাময় হোন।"[১২]

ভক্তরা প্রায়ই প্রশ্ন করে, আমরা মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করতে পারি না, তবে শরীরের যত্ন নেওয়া সময়ের অপচয় নয় কি? সমস্যাটি হচ্ছে যদি আমরা শরীরের যত্ন না নিই, তবে আমরা সক্রিয়ভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত

হতে পারি না। যখন আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হব, তখন আমরা আরো বেশি ভগবৎসেবা করতে পারব। অবশ্য অতিরিক্ত শরীরচর্চা করে কৃষ্ণকে ভুলে গেলে সবকিছুই অকেজো হয়ে যাবে। শরীরের যত্ন নেওয়া ও মৃত্যুর অপরিহার্যতা স্বীকার করা পরস্পরবিরোধী নয়। যেহেতু শরীরের যত্ন নেওয়ার কারণ হচ্ছে আরও বেশি করে ভগবানের সেবা করা।

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তেরা প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করেন, কেননা তারা জানেন যে নির্ধারিত সময়ের সাথে অতিরিক্ত সময় যোগ করা যাবে না বা সময় একবার চলে গেলে তা ফিরিয়েও আনা যাবে না। কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি করতে হলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমরা যখন ভক্তিযোগ অনুশীলন করার চেষ্টা করি, তখন আমরা অনেক সময় পাই, কেননা তখন আর আমরা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বৃথা সময় নষ্ট করি না।

তবুও ভক্তিজীবনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ না থাকায় ভক্তদের মধ্যেও সময় নষ্ট করার প্রবণতা দেখা যায়। এর একটি মাধ্যম হলো প্রজল্প করা। শ্রীল প্রভুপাদ প্রজল্পকে ব্যঙের ডাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যা কিনা সর্পকে আহ্বান জানায়, তাকে গ্রাস করা জন্য। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রজল্পকে বেশ্যার সাথে তুলনা করেছেন, যা মনকে কৃষ্ণবিমুখী করে। যদি আমরা এমতাবস্থায় পতিত হই যেখানে অন্যরা প্রজল্পে ব্যস্ত, তখন আমরা সেখান থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে আরও দৃঢ়ভাবে মনকে কৃষ্ণভাবনাময় করতে পারি। আমরা কত বোকা যে, জীবনের উদ্দেশ্য জানার পরেও আমরা আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছি।

আমি একবার শ্রীল প্রভুপাদকে এ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। মায়াপুরে হাঁটার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "প্রভুপাদ, একদিকে আপনি বলছেন যে, কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে ধারাবাহিক পন্থা, কিন্তু আপনি এও বলছেন যে, আমাদের এ ব্যাপারে খুব তৎপর হওয়া উচিত এবং এই জীবনেই আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় হতে হবে।"

শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেছিলেন যে, "কখনই কারো মনে করা উচিত নয় যে সে পরিপক্ব হয়েছে। তার মনে রাখা উচিত তাকে পারমার্থিক উন্নতিতে বহুদূর যেতে হবে এবং এ জন্য তার খুব স্বল্প সময় রয়েছে। আমি প্রভুপাদের উত্তরে অভিভূত হয়েছিলাম এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, এরকম মনে করাটা কতটা বোকামি যে আমি এতই উন্নত হয়েছি, আমি এখনই বৈকুণ্ঠে গমন করতে পারি।

সবকিছুর ন্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের পন্থা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *'কীর্ত্তনীয় সদা হরি'*। তোমার জীবন হরিনাম করার জন্য। তাই তোমার উচিত সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনাম জপ করা। এটাই হচ্ছে সময়ের সঠিক ব্যবহার।"[১৩]

আর কৃষ্ণভাবনায় ক্রমোন্নতির ব্যাপারটি কী? আমরা খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করে হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় *'কীর্তনীয় সদা হরি'* অনুশীলন করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ভক্তকে প্রথম ত্রিশ বা চল্লিশ বছর গৃহস্থ আশ্রমে থাকতে হয়। একদিক থেকে গৃহস্থ জীবনে সময় নষ্ট করাটা অপরিহার্য, কিন্তু এরও দরকার আছে। কেননা আমরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ এবং কঠোরভাবে কৃষ্ণ সাধনায় নিমগ্ন হতে পারি না।

আমাদের প্রবণতাগুলোকে যতদূর সম্ভব কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করা উচিত এবং যতদূর সম্ভব বৈরাগ্য অনুশীলন করা উচিত। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যে, আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি। গৃহস্থ আশ্রমের দোহাই দিয়ে আমরা যেন মূর্খের ন্যায় অহেতুক কর্মে মগ্ন না হই। সবচেয়ে ভালো হয় শ্রীল রূপ গোস্বামীর নির্দেশ অনুশীলন করা; *উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ধৈর্যাৎ*– উৎসাহ (সময় নষ্ট নয়), ধৈর্য (আমাদের হয়তো কিছু সময় নষ্ট করার মতো ঘটনা সহ্য করতে হতে পারে, যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাবনার গুরুত্ব অনুভবের অনুশীলন করছি) এবং দৃঢ়তার সহিত কৃষ্ণভাবনার চর্চা করা। শ্রীল প্রভুপাদ এ ব্যাপারে একজন মহিলার উদাহরণ দিয়েছেন, যিনি বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান লাভ করতে চান। তার উৎসাহকে স্বাগত, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তান লাভ করতে পারেন না। তিনি যদি একজন পত্নীর ন্যায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন, তবে নিশ্চিতভাবেই গর্ভবতী হবেন এবং গর্ভধারণের পর সন্তান জন্ম দিবেন। যদি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন সঠিক হয়, তবে আমাদের এই পদ্ধতির উপর বিশ্বাস থাকা উচিত এবং ভক্তের ন্যায় স্বাভাবিক জীবনযাপনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, গৃহস্থ ভক্তদের মাঝ বয়সে সন্তানাদি পালন ও আর্থিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তারা মাঝে মাঝেই বলে যে যখন তারা আরো বয়স্ক হবে এবং সন্তানেরা আরো বড় হবে, তখন তারা বেশি করে সাধনা করতে পারবে। যদি তা সত্য হয় যে, তারা তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কঠোর সাধনা করতে পারছে না, তবে তাদের ন্যূনতম সাধনা অনুশীলন করা উচিত। এক ভক্ত আমাকে বলেছিল, সে তার সন্তানদের ভালোবাসা দিতে চায়, তারা যেন কোনো অপূর্ণতা অনুভব না করে। তাই সে আর ষোলমালা জপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কেননা সে তার সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিতে পারে না। কে নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, যখন সে বৃদ্ধ হবে, তখন সে পুনরায় জপ করতে সক্ষম হবে?

আমরা যদি অন্যদেরও সাহায্য করতে চাই, প্রথমে আমাদের নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করতে হবে। আমি আরেকটি ঘটনার কথা মনে করতে পারছি। এক ভক্ত গ্রন্থ পড়তে খুব ভালোবাসতো, কিন্তু চাকুরির জন্য তার

পড়াশোনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। যখন সে চাকরি থেকে অবসর নিল, তখন তার চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে এল। সে আর পড়তে পারল না। এটাই কালের প্রভাব। আমাদের বোধোদয়ের পূর্বেই পুরো জীবন চলে যাবে। আমাদের জীবনের পরবর্তী ধাপে আমরা যে আরো বেশি জপ করতে, শ্রবণ করতে বা প্রার্থনা করতে পারবো, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। একজন ভক্তের ক্ষেত্রে জড় জগৎকে তার সাধনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না দেওয়ার সংগ্রাম তেমন জাগতিক নয়। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মতো সর্বদা কৃষ্ণস্মরণের ন্যায় আমাদেরও সর্বদা কৃষ্ণস্মরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

কৃষ্ণভাবনার উন্নত স্তরে সময়ের যথাযথ উপযোগিতা নিশ্চিত করা ভাব স্তরের লক্ষণ। একজন ভক্ত হয়তো প্রচার বা ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে তার সময়ের যথাযথ ব্যবহার করছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে ভাব স্তরে রয়েছে। ভাব স্তরটি ভালো সময় ব্যবস্থাপনার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। যদিও কৃষ্ণ সেবায় সময়ের সদ্ব্যবহার, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতির একটি লক্ষণ। কিন্তু ভাব হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় আবেগের বৈশিষ্ট্য। যে ভক্ত তার এক মুহূর্তও জড় উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা এবং সবসময় কৃষ্ণভাবনা উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যয় করার চিন্তায় উদ্বিগ্ন; তার বাসনা ও কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। যখন কোনো ভক্ত সময়ের ব্যাপারে উদাসীন হয়, সে প্রচারের দুর্লভ সুযোগ অথবা জপ, প্রার্থনা বা কৃষ্ণস্মরণের দুর্লভ সুযোগ নষ্ট করে। "শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের উচিত তার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করার ব্যাপারে সদা উদ্বিগ্ন থাকা। *অব্যর্থ কালত্বম*। ভক্তের সর্বদা খেয়াল রাখা কর্তব্য, যেন তার সময় অযথা ব্যয় না হয়। তাহলে সে উন্নতি করবে। আলসে হবেন না।"[১৪]

১ প্রবচন, সানফ্রান্সিসকো, মার্চ ১৫, ১৯৬৮।
২ প্রবচন, মায়াপুর, এপ্রিল ৮, ১৯৭৫।
৩ প্রবচন, নিউইয়র্ক, জুলাই ২৬, ১৯৭১।
৪ ভাঃ ৭/৬/১৪।
৫ ভাঃ ৩/৩০/১।
৬ ভাঃ ৭/৬/১৪।
৭ প্রবচন, লস্ এঞ্জেলস, জানুয়ারি ৩, ১৯৭৪।
৮ প্রবচন, বৃন্দাবন, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৫।
৯ প্রবচন, হাওয়াই, জানুয়ারি ২০, ১৯৭৪।
১০ প্রবচন, লস্ এঞ্জেলস, জানুয়ারি ৩, ১৯৭৪।
১১ প্রবচন, সানফ্রান্সিসকো, মার্চ ১ , ১৯৬৮।
১২ প্রবচন, বৃন্দাবন, ডিসেম্বর ৭, ১৯৭৫।
১৩ প্রবচন, বৃন্দাবন, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৫।
১৪ প্রবচন, মায়াপুর, এপ্রিল ৮, ১৯৭৫।

শ্লোক ২২

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
স-সর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

দুষ্টা– দুষ্ট বা প্রবঞ্চক; ***ভার্যা–*** স্ত্রী; ***শঠম্–*** প্রতারক; ***মিত্রম্–*** বন্ধু; ***ভৃত্যঃ–*** ভৃত্য; ***চ–*** এবং; ***উত্তর-দায়কঃ–*** উত্তর দানকারী; ***স-সর্পে–*** সাপের সঙ্গে; ***চ–*** এবং; ***গৃহে–*** গৃহে; ***বাসঃ–*** বাস; ***মৃত্যুঃ–*** মৃত্যু; ***এব–*** নিশ্চিতরূপে; ***ন–*** না; ***সংশয়ঃ–*** সন্দেহ।

অনুবাদ

যার স্ত্রী অসতী, বন্ধু প্রতারক এবং ভৃত্য অবাধ্য, গৃহে তার সাপের বাস, অতএব মৃত্যু তার অনিবার্য।

তাৎপর্য

যে সমস্যাগুলোর কথা চাণক্য পণ্ডিত এখানে উল্লেখ করেছেন, তা শুধু পীড়াদায়কই নয়, মৃত্যুর কারণও বটে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "এমন অনেক উদাহরণ আছে– স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে তার নিজপুত্রকে পর্যন্ত হত্যা করেছে।"[১] একইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বেশ্যাকে বিয়ে করে অজামিল তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই সব ব্যয় করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ 'কুলটা পত্নী' শব্দটির সাথে আমাদের মনের তুলনা করেছেন। "আমাদের মনও তেমন *পুংশ্চলী*, কুলটা পত্নী।"[২] তিনি এ শ্লোকটির তাৎপর্য করেছেন এভাবে :

"অতএব যদি কারো পত্নী দুষ্টা, বন্ধু প্রতারক এবং ভৃত্যরা যদি অবাধ্য হয়ে তর্ক করে ..... মালিক বললেন, "কেন তুমি এটি করলে না।" ভৃত্য উত্তর করল, ওহ্ আমি এটা ... " কোনো তর্ক নয়। ভৃত্যের কর্তব্য নীরব থাকা। তবে সে বিশ্বস্ত সেবক। মাঝে মাঝে প্রভু হয়তো রাগান্বিতও হতে পারেন। কিন্তু ভৃত্যের কর্তব্য নীরব থাকা। তবে প্রভু দয়ালু হবে। কিন্তু যদি সে মালিকের সাথে তর্ক করে তবে খুব খারাপ। দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কং, সসর্পে চ গৃহে বাসো। আর যদি তুমি এমন একটি গৃহে থাকো যেখানে সাপ রয়েছে। যদি এই চারটি বা এদের কোনোটি সেখানে থাকে, তবে '*মৃত্যুরেব ন সংশয়*'– আপনার মরণ সুনিশ্চিত।"[৩]

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, বন্ধু যদি প্রতারক হতে পারে, তবে কীভাবে আমি সকল বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসী হওয়া মনোভাব এড়াতে পারি? প্রকৃত বন্ধু কে, কীভাবেই বা প্রকৃত বন্ধুকে খুঁজে পাব? ভক্তের প্রকৃত বন্ধু

কৃষ্ণভাবনাময় বন্ধু, যিনি জানেন, আমরা কৃষ্ণসেবার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করছি। কৃষ্ণকে বন্ধুত্বের কেন্দ্রে রাখা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, কৃষ্ণ যে আমাদের প্রকৃত বন্ধু, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যে কেউ আমাদের বন্ধু হতে পারে। *সুহৃদং সর্বভুতানাম্*। কেউ কৃষ্ণের মতো আমাদের সাহায্য করতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণই যে প্রকৃত বন্ধু তা অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরাও তাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারি।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক ও কবিদের রচিত অনেক বিখ্যাত অনুভূতি রয়েছে, যার কয়েকটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, বন্ধুরা যেন আমাদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে, আমরা তা পছন্দ করি। সমমনা বন্ধুকে আমরা পছন্দ করি। আমরা তাদের যেমন যত্ন নিই, তারাও আমাদের প্রতি তেমন যত্নশীল হোক, আমরা তা চাই। প্রকৃত বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা পূর্ণ। একমাত্র চিন্ময় জগতেই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী।

একইভাবে যদি কোনো ভৃত্য বিনয়ী না হয়, তবে সে সুখহীন, বিপজ্জনক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। 'ভৃত্য' শব্দটি আমাদের নিজ জীবনের ক্ষেত্রে খারাপ বলে মনে হয়। এর অর্থ কী? 'খানসামা'। কারো ভৃত্য থাকা উচিত কি? তা কি শোষণ নয়? ভক্তরা গুরু-কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ভৃত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন।

বেদ অনুসারে শূদ্ররাই সেবক শ্রেণীর। যদিও যেকোনো সমাজে প্রত্যেকেই একে অন্যের সেবা করছে, তবুও পুরো সমাজের জন্য এক শ্রেণীর সেবক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শূদ্ররা প্রায়ই ক্ষত্রিয়দের সেবায় যুক্ত থাকে। কিন্তু, শূদ্রের ধর্ম হচ্ছে আনুগত্য।

আধ্যাত্মিক জগতে দাস তিনিই, যিনি গুরুর সেবা করছেন। যদি আমরা নিজেদের গুরুদাস বলে পরিচয় দিতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের বশ্যতা গুণটি থাকা চাই। কখনোই গুরুদেবের মুখের ওপর কোনো কথা বলা উচিত নয়।

বিশেষত কলিযুগে আনুগত্য গুণটির এমনিতেই বড় অভাব, তবে তা অর্জন করে নিতে হয়। যদি শিষ্য গুরুর অবাধ্য হয়, তবে গুরুদেব শিষ্যকে ত্যাগ না করলেও পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষতি সাধিত হবে। গুরুর প্রতি অবাধ্য হওয়াই গুরু ত্যাগের একটা ইঙ্গিত হতে পারে।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হচ্ছে স্বাধীন। আলাদা কোনো শক্তি এ সম্পর্ককে একত্রিত রাখছে না। এটা সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত। যদি সেবক বিনয়ের সঙ্গে সেবা করতে গিয়ে অবহেলা করে, তবে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক টিকবে না। শিষ্যের কর্তব্য গুরুকে সম্মান করা, যাতে তিনি নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

একইভাবে, কুলটা স্ত্রী সে, যে স্বামীকে শ্রদ্ধা করে না। শ্রদ্ধা ছাড়া সম্পর্ক টিকতে পারে না। এ ধরনের স্ত্রী বৈবাহিক প্রতিজ্ঞার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল নয়। তারা পরপুরুষের সাথেও চলে যেতে পারে। সে ধরনের পরিস্থিতি স্বামীর জন্য মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক। সেজন্য চাণক্য বলেছেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি নিশ্চিত মারা যাবেন। মৃত্যু বলতে দৈহিক মৃত্যু অথবা লজ্জায় মৃত্যু দুটোই হতে পারে।

গুরুদেবের ক্ষেত্রে, যদি শিষ্য তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তিনি মারা যান না। তবে সম্পর্কটা মারা যায়, তাই শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যু। দৈন্যবশত, এমন ক্ষেত্রে গুরু সাধারণত লজ্জা বা শোক প্রকাশ করেন। একবার যখন সন্ন্যাসী-শিষ্য তার পত্নীর কাছে ফিরে গিয়েছিল, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কান্না করতে করতে বলেছিলেন যে, 'আমি এই আত্মাটিকে রক্ষা করতে পারলাম না।' যখন শ্রীল প্রভুপাদের এক শিষ্য প্রভুপাদের দেখাশোনা ও নির্দেশনা সত্ত্বেও পুনরায় পতিত হয়েছিল, প্রভুপাদ তখন তাকে বলেছিলেন, তুমি বারবার আমাকে কৃষ্ণের কাছে লজ্জিত করছ।

১ প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ২৬, ১৯৭৬।

২ প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ২৬, ১৯৭৬।

৩ প্রবচন, সানফ্রান্সিসকো, জুলাই ১৬, ১৯৭৫।

শ্লোক– ২৩

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশা শূন্যং তু অবান্ধবঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥

অপুত্রস্য– পুত্রহীন ব্যক্তির; ***গৃহম্–*** গৃহ; ***শূন্যম্–*** শূন্য; ***দিকঃ–*** সমস্ত দিক; ***শূন্যম্–*** শূন্য; ***তু–*** কিন্তু; ***অবান্ধবঃ–*** আত্মীয়বর্গ হীন; ***মূর্খস্য–*** মূর্খ ব্যক্তি; ***হৃদয়ং–*** হৃদয়; ***শূন্যম্–*** শূন্য; ***সর্ব-শূন্য–*** সকল শূন্যের সমষ্টি, ***দরিদ্রতঃ–*** দারিদ্র্য।

অনুবাদ

সন্তানহীন গৃহ শূন্য, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ ছাড়া ব্যক্তির দশদিক শূন্য, মূর্খ ব্যক্তির হৃদয় শূন্য আর এসব শূন্যতার সম্মিলিত রূপই হলো দরিদ্রতা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে যখন কেউ দাম্পত্য জীবন শুরু করে, তখন খাদ্য ও সন্তান উৎপাদনের জন্য তার গৃহ ও ভূমি প্রয়োজন হয়। "স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের জীবনের ভিত্তি। এটিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে 'আমি এবং আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।" [১]

সংসার জীবনের প্রত্যাশিত পরিণাম সন্তান। সন্ন্যাসীও গৃহে থাকতে পারেন, কিন্তু তা তাকে গৃহস্থ বানাতে পারবে না। শ্রীল প্রভুপাদ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "আমরাও একটি বাড়িতে বাস করি, কিন্তু আমরা গৃহস্থ নই। শাস্ত্রে রয়েছে, '*ন গৃহম্ ইতি আহু*'– বাড়িটিই গৃহ নয়। সেখানে অবশ্যই পত্নী থাকতে হবে এবং আরেকটি বিষয় যা চাণক্য উল্লেখ করেছেন, *পুত্র-হীনম্ গৃহম্ শূন্যম্*– আপনার স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু কোনো সন্তান নেই, তার অর্থ আপনার গৃহ শূন্য।"[২]

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে মহারাজ চিত্রকেতু তার কোনো পুত্র না থাকায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন। "এক কোটি বন্ধ্যা পত্নীর পতি চিত্রকেতু রূপবান, উদার এবং তরুণ ছিলেন। তার অতি উচ্চকুলে জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো পুত্র না থাকায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন।"[৩] শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "গৃহস্থের যদি পুত্র না থাকে, তাহলে গৃহ মরুভূমি-সদৃশ।"

বৈদিক ঋষিরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, সংসারজীবনের প্রতি আকর্ষণ হলো মায়া। "ভ্রান্ত জড়বাদীরা জানে না যে এই বিশেষ শরীরটি অস্থায়ী, আর এই দেহের সাথে সম্পর্কিত গৃহ, ভূমি ও সম্পদের আকর্ষণ সবই অস্থায়ী। কেবল অজ্ঞতার বশেই আমরা সবকিছুকে চিরস্থায়ী মনে করি।"[৪] এমনকি কারো পত্নী, গৃহ এবং সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও তাকে শরীর পরিবর্তন করতে হয়। তাই জীবিত অবস্থায় সে যাই সংগ্রহ করুক না কেন, মৃত্যুর সময় তার কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে নেওয়া হবে। "তোমার গৃহ, তোমার বাড়ি, তোমার জমি, তোমার স্ত্রী, তোমার সন্তান, তোমার বান্ধব, তোমার যশ– সবকিছু কেড়ে নেওয়া হবে। তখন তোমাকে আরেক জীবন শুরু করতে হবে। *তথা দেহান্তর প্রাপ্তি*।"[৫]

শুধু মোহের বশেই কেউ পুত্র কামনা করে না। বৈদিক অনুশাসন মানার জন্যও তা জরুরি। কেননা পুত্র তার পিতার আত্মাকে মুক্ত করতে পারে। এটাই বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য– পুত্র গয়ায় গিয়ে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। এ কথা স্মরণ করেই অঙ্গের মতো রাজারাও পুত্র কামনায় প্রার্থনা করেছিলেন। যখন তারা বিবাহের পরেও পুত্র লাভে ব্যর্থ হলেন, তখন তারা নিজেদের অভিশপ্ত মনে করেছিলেন। যখন মহারাজ অঙ্গ রাজপুরোহিতদের কাছে গিয়ে পুত্রসন্তান লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তারা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে রাজন! এই জীবনে আপনার কোনো পাপ নেই। এমনকি আপনার মনেও কোনো পাপ নেই। কিন্তু পূর্ব জীবনে আপনি পাপ করেছিলেন। যার ফলে অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও, আপনার কোনো পুত্রসন্তান নেই।"[৬] তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন–

"বিবাহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্রসন্তান লাভ করা, কারণ পিতা তথা পূর্বপুরুষদের নারকীয় বদ্ধ জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্য পুত্রসন্তানের প্রয়োজন হয়। চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন, *পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্* – পুত্রহীন দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত জঘন্য। রাজা অঙ্গ এই জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বকৃত পাপকর্মের কারণে, তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতএব বুঝতে হবে যে, কেউ যদি অপুত্রক হয়, তার কারণ তার পূর্বকৃত পাপ।"[৭]

উপরের ঘটনাটি ভক্তদের কতটা বিদ্ধ করে? ভক্তদের কি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা উচিত? অর্জুন বলেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলে কুলের ঐতিহ্য নষ্ট হবে এবং সেই কুলে পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়া লোপ পাওয়ার ফলে তাদের পিতৃপুরুষেরা অধোগামী হবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন,

আত্মাদের প্রতি পিণ্ডদান ও জল উৎসর্গ করা প্রয়োজন। এই উৎসর্গ সম্পন্ন করা হয় বিষ্ণুকে পূজা করার মাধ্যমে। কারণ বিষ্ণুকে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ সেবন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। অনেক সময় পিতৃপুরুষেরা নানা রকমের পাপের ফল ভোগ করতে থাকে এবং অনেক

সময় তাদের কেউ কেউ জড় দেহ পর্যন্ত ধারণ করতে পারে না। সূক্ষ্ম দেহে প্রেতাত্মারূপে থাকতে বাধ্য করা হয়। যখন বংশের কেউ তার পিতৃপুরুষদের ভগবৎ-প্রসাদ উৎসর্গ করে পিণ্ডদান করে, তখন তাদের আত্মা ভূতের দেহ অথবা অন্যান্য দুঃখময় জীবন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। পিতৃপুরুষের আত্মার সদ্গতির জন্য এই পিণ্ডদান করাটা বংশানুক্রমিক রীতি। তবে যে সমস্ত লোক ভক্তিযোগ সাধন করেন, তাদের এই অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই। ভক্তিযোগ সাধন করার মাধ্যমে ভক্ত শত-সহস্র পূর্বপুরুষের আত্মার মুক্তি সাধন করতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এরপর শ্রীমদ্ভাগবতের ১১/৫/৪১ শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন *দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃনাং*, যদি আমরা মুক্তি দানকারী মুকুন্দের চরণ-কমলে শরণ নিই, তবে আমাদের সকল ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের কখনই ভগবৎসেবা সম্পাদন করার সৌভাগ্য থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদানের সময় আমাদের নেই, যেহেতু আমরা কৃষ্ণসেবায় খুব ব্যস্ত। ভগবৎসেবা এত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যে সকল ধরনের যজ্ঞ ও কর্মের ফল এতে নিহিত আছে।

এই শ্লোকে চাণক্য পণ্ডিত কতগুলো উদ্দেশ্যহীন বা শূন্য বস্তুর তালিকা করেছেন। যেমন– পুত্রছাড়া গৃহ শূন্য। ইস্‌কন ভক্তরা প্রায়ই এ লাইনটি দেখে অবাক হয়। "আমি শ্রীল প্রভুপাদকে বলতে শুনেছি যে সন্তান ছাড়া বিবাহ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই হয়। এর মানে কী?"

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের জন্য এটি বলেননি। এর অর্থ এই নয় যে, সন্তান ছাড়া বিবাহ ভালো নয়। তিনি বৈরাগ্যময় বিবাহকেও উৎসাহিত করেছেন। যেখানে স্বামী-স্ত্রী কোনো সন্তান নেওয়ার পরিবর্তে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হবে।

আরেকটি প্রশ্ন হলো, নিঃসন্তান দম্পতি কী করবে? যদি দুজনই ভক্তিজীবন অনুসরণ করে, তবে সে গৃহ শূন্য নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে তা বাণপ্রস্থ জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্ববহ। গৃহস্থ জীবনের জন্য যৌনজীবন অত্যাবশ্যকীয় নয়।

১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমাদের বিবাহ সম্পন্ন করিয়েছিলেন, আমি চিঠিতে জানতে চেয়েছিলাম যে, কীভাবে সন্তান নিতে হবে? তিনি আমাকে বলেছিলেন, সন্তান নেওয়া নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেছিলেন যে, যদি আমরা যৌনতাকে উপেক্ষা করতে পারি, তবে তা আরও ভালো। পরবর্তীকালে আমি আবারও চিঠির মাধ্যমে তার নিকট জানতে চেয়েছিলাম, আমরা সন্তান নিতে পারব কি না? আমার সহধর্মিণী অসুস্থ ছিলেন। তাই প্রভুপাদ বলেছিলেন, "সন্তান না নিলে আরও ভালো। তবে সন্তান নেওয়ার চেয়ে নিজেরাই সন্তান হয়ে যাওয়া আরও ভালো। তোমরা সরাসরি কৃষ্ণের সন্তান হয়ে যাও।"[৭]

তিনি বলেননি যে, যদি সন্তান না থাকে, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হবে। বরং তিনি শিখিয়েছিলেন যে, সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া যৌনজীবন অধঃপতনেরই নামান্তর। সে ধরনের বিবাহ মানে মিথ্যাচারিতা। তা উন্নত ভক্তের জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রাথমিক নির্দেশ হিসেবে তারা এর গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারবে না।

এই শ্লোকের মতো আরও অনেক শ্লোক আছে, যার পারমার্থিক ব্যাখ্যা চাণক্য করেননি। তিনি শুধু জাগতিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, জাগতিক বিষয়ের জন্য চাণক্য একজন কর্তৃপক্ষ।

শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে সংসার জীবনের সাথে মিল রেখে ভগবদ্ভক্তির তিনটি পর্যায়– সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতেন। প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে *সম্বন্ধ*– বর ও কনের মধ্যে সম্বন্ধ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে *অভিধেয়*– বিবাহিত জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে এবং অবশেষে *প্রয়োজন*– সন্তান লাভ করে। চাণক্য বলেছেন, যদি সংসারজীবনে প্রবেশ করেও কারও সন্তান লাভ না হয়, তবে সে গৃহ শূন্য। এর অর্থ কি এই যে, যদি আমরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে না পারি, তবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ব্যর্থ? না তা নয়, কেননা আজ বা কাল একজন ভক্ত অবশ্যই প্রয়োজন স্তরে প্রবেশ করবে। ভক্তিজীবনের কোনো কিছুই বিফলে যাবে না। ভগবৎসেবার কোনো ক্ষয় বা ব্যয় নেই। এমনকি আমরা যদি জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও মাত্র ৫০% কৃষ্ণভাবনাময় হই। জড় কর্মের ক্ষেত্রে অবশ্য তা বলা যাবে না। মৃত্যুর মাধ্যমে জড় কর্মের ফল চুরি হয়ে যায়। তখন বদ্ধ আত্মার পুনর্জন্মের মাধ্যমে আবার তা শুরু হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ না করছি, ততক্ষণ আমাদের ভক্তিজীবন অসম্পূর্ণ থাকছে। কিন্তু কখনই মনে করা উচিত নয় যে তা শূন্য।

আরও দুটি উদাহরণ (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ ছাড়া দশদিক শূন্য ও মূর্খের হৃদয় শূন্য) দেওয়ার পর তিনি বললেন, দরিদ্রতা সকল শূন্যতার সামগ্রিক রূপ। এর অর্থ, আপনার প্রথম তিনটি জিনিস যদি থেকেও থাকে, তবুও অর্থ না থাকলে কোনো কিছুই কাজে আসবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ এক ভাগবত প্রবচনে চাণক্য শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "যদি আপনি দরিদ্র হন, তবে সবকিছুই শূন্য। আপনার বিদ্যা শূন্য, গৃহ শূন্য ও বন্ধুত্ব শূন্য। কেননা কেউ আপনার কোনো খবর নিবে না।"[৮] চাণক্যের শ্লোকগুলো ছিল সম্পদের গাণিতিক হিসাব। সংসার, বন্ধু ও জ্ঞান ছাড়া কারো কোনো সম্পদ নেই। এমনকি এসব থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো অর্থ না থাকে, তবে তার সবকিছুই শূন্য।

প্রকৃত দরিদ্রতা কী? জাগতিক দৃষ্টিতে আপনার কোনো অর্থ না থাকলে আপনি সুখী হতে পারবেন না। কিন্তু পারমার্থিক জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধ্যাত্মবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে পারমার্থিক উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে দারিদ্র্য বরণ করে নেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নারদমুনি দারিদ্র্যের প্রশংসা করেছেন, যখন তিনি কুবেরের দুই পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। অধ্যাত্মবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাভাব কোনো শূন্যতা নয়। প্রকৃত দারিদ্র্য হচ্ছে আত্মজ্ঞানের অভাব। মৃত্যুর সময় আমাদের পারমার্থিক সম্পদগুলো রেখে সকল জড়সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে। "যদি কেউ সমগ্র বিশ্বের ঐশ্বর্যও লাভ করে, কিন্তু চিরন্তন আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে, তাতে কী লাভ?"

পারমার্থিক দরিদ্রতা বলতেও একটা বস্তু আছে। খ্রিস্টানরাও নিজেদের পরম দৈন্য প্রকাশ করতে এ শব্দগুলো বলে থাকে। যা দ্বারা একজন ভক্ত নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, তার কোনো গুণ নেই। সেই অবস্থায় ভক্ত কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করে। আবার এটির বিপরীত অর্থও করা যেতে পারে। কাউকে আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল বলে গণ্য করা যেতে পারে, যদি সে তার ভক্তিজীবনের কনিষ্ঠ অবস্থা সম্পর্কে দুঃখবোধ না করে।

যখন আমরা একজন অধ্যাত্মবাদীর অবস্থা বিবেচনা করি এবং তারা কীভাবে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন সেই চিন্তা করি, তখন আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবব– এ শ্লোকটি কত মূল্যবান। আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, চাণক্যের শ্লোকগুলো জাগতিক নৈতিকতার ভিত্তিতে রচিত এবং তা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের সোপান হিসেবে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারব যে, কেউ যদি খুব গরিব হয়, তবে সে অভাবের দরুণ অর্থ উপার্জনে এত ক্লান্ত হবে যে জীবনের অর্থ বিশ্লেষণ ও আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে না। এ শ্লোকটিতে বিষয়ী ব্যক্তির উভয়সংকটের কথা আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু উন্নত ভক্ত কখনও প্রাথমিক নির্দেশনা হিসেবে এর অবমূল্যায়ন করবে না। এটা আমাদের শেখায় যে জড়-জীবন কতটা বন্ধনজনক এবং সব ধরনের সম্পদ অর্জন করা কত কঠিন। অবশেষে ভক্তরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, জাগতিক জীবনে বৈরাগ্যই ভালো পন্থা, যেখানে জীবনের উন্নততর নীতিগুলোর প্রয়োগ করা যায়।

১ ভাঃ ৫/৫/৮।
২ প্রবচন, লন্ডন, জুলাই ২৪, ১৯৭৩।
৩ ভাঃ ৬/১৪/১২।
৪ ভাঃ ৩/৩০/৩।
৫ প্রবচন, বোম্বে, নভেম্বর ১০, ১৯৭৪।
৬ ভাঃ ৪/১৩/৩১।
৭ পত্র, অক্টোবর ৯, ১৯৬৮।
৮ প্রবচন, মায়াপুর, অক্টোবর ৬, ১৯৭৪।

শ্লোক ২৪

বিদ্যত্বম্ চ নৃপত্যম্ চ নৈব তুল্যম্ কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ॥

বিদ্যত্বম্– পাণ্ডিত্য; ***চ***– এবং; ***নৃপত্যম্***– রাজনৈতিক ক্ষমতা; ***চ***– এবং; ***নৈব***– কখনোই না; ***তুল্যম্***– সাম্য; ***কদাচন***– কখনো; ***স্বদেশে***– স্বীয় বা নিজ দেশে; ***পূজ্যতে***– শ্রদ্ধা বা পূজা লাভ করেন; ***রাজা***– রাজা; ***বিদ্বান***– পণ্ডিত; ***সর্বত্র***– সকল স্থানে; ***পূজ্যতে***– পূজা লাভ করেন।

অনুবাদ

বিদ্যা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। রাজা শুধু তার নিজ রাজ্যে সম্মানিত হন, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মানিত হন।

তাৎপর্য

ইস্‌কন ডালাস গুরুকুলে প্রবচন দেওয়ার সময় আমি শ্রীল প্রভুপাদের মুখে এই শ্লোকটি উল্লেখ করতে শুনি। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকগুলো খুবই প্রামাণিক। আমি মনে করি, চাণক্য পণ্ডিতের এ শ্লোকগুলোর সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত।"[১] আমরা আশা করি, শ্রীল প্রভুপাদের উদ্ধৃতিসহ চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকের এই সংস্করণ তার অনুরোধ পূর্ণ করবে।

উদ্ধৃত শ্লোকে চাণক্য পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেছেন, বিদ্বান ব্যক্তি একজন রাজনীতিবিদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে তুলনার কোনো প্রশ্নই নেই। "সেখানেই তুলনা করা যায়, যেখানে সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সহজে বোঝাতে পারি, 'আপনার মুখখানা দেখতে চাঁদের মতো'। যদি আপনার মুখ চাঁদের সাথে সাদৃশ্য হয়, তবে আমরা এ কথা বলতে পারি। সাদৃশ্য বলতে বোঝায়, যেখানে কোনো বিষয়ে মিল রয়েছে। বেশি সাদৃশ্য, বেশি মিল। চাণক্য পণ্ডিত বলেন, বিদ্বান এবং ধনী ব্যক্তির মধ্যে কোনো তুলনা হয় না। *স্বদেশে পূজতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে।* ধন বা রাজা তার নিজ দেশে সম্মানিত হতে পারেন, কিন্তু বিদ্বান বা জ্ঞানী পণ্ডিত সারা পৃথিবীতে সম্মানিত হন। একজন সর্বত্র পূজিত হন, আরেকজন শুধু তার নিজ গ্রামে সম্মানিত হন, তবে কীভাবে তাদের তুলনা হতে পারে?"[২]

সাধু তার নিজ দেশ ছাড়াও সর্বত্র সম্মানিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। একজন গৃহস্থ ও টোল শিক্ষক হিসেবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার নিজ শিক্ষার্থীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন, যখন তিনি পরমানন্দে গোপীনাম উচ্চারণ করছিলেন। "তার এই ক্রোধ দর্শন করে, সাধারণ এক নাস্তিক স্মার্ত ব্রাহ্মণ সেই মূর্খ পড়ুয়া মহাপ্রভুকে ভুল বুঝেছিল। তাই সে অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুকে আঘাত করতে

উদ্ধত হয়েছিল। এ ঘটনার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, যাতে মানুষ তাঁকে একজন সাধারণ গৃহস্থ বলে মনে করে তার প্রতি অপরাধ না করে, কেন না ভারতবর্ষে স্বাভাবিকভাবেই সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।"[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যবাসীদের দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে তারা যোগ্যতাসম্পন্ন, তখন তিনি তাদের ব্রাহ্মণদীক্ষা এবং পরে সন্ন্যাস দীক্ষাও প্রদান করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, প্রকৃত বৈদিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত মানুষেরা ইস্‌কনের সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের সম্মান করবে। যখন জাত-সচেতন হিন্দুরা তার শিষ্যদের ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী হিসেবে গ্রহণ করতেন না, তখন শ্রীল প্রভুপাদ নিজে তার শিষ্যদের সমর্থন প্রদান করতেন।

দুর্ভাগ্যবশত জাতি-ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে না। তারা এতই দাম্ভিক যে এমনকি ভারতীয় সন্ন্যাসীদেরও প্রণাম করে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আশা করেছিলেন, জাতি ব্রাহ্মণেরাও একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে সম্মান করবে। তবুও তারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক বা যথার্থ সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করুক বা না করুক, তাতে কিছু যায়, আসে না, কেননা শাস্ত্রে এই ধরনের অবাধ্য জাতি ব্রাহ্মণদের দণ্ডবিধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে– *দেবপ্রতিমাং দৃষ্টা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥* – "যে পরমেশ্বর ভগবান, মন্দিরে বিগ্রহ অথবা একজন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে প্রণতি নিবেদন করে না, তাকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"[৪]

এটা অবশ্য সত্য যে, ভক্তরা সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত হন না। তারা শুধু জাতসর্বস্ব হিন্দুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হননি, তারা জড়বাদী এবং অন্যান্য ধর্মবাদীদের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু ভক্তরা চিন্ময় জগতে এবং এই জগতের কার্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ দেবতাদের দ্বারাও সম্মানিত হন। এসব মহাত্মাদের সংখ্যাই অধিক। শ্রীগুরুবন্দনায় আমরা গাই যে, গুরুদেব ত্রিজগতেই প্রশংসিত হন। যদিও বাইরের জগতে কী ঘটছে এ সম্পর্কে আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতাই রয়েছে, তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সে সমস্ত উচ্চ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যক্ষ করছেন এবং আমাদের অবহেলা করবেন না। এটা কলিযুগ। সবকিছুই বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ।

আমরা এও বুঝতে পারছি, বিদ্বান ব্যক্তিরা অন্য বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে সম্মানিত হন, মূর্খদের দ্বারা নন। শুকদেব গোস্বামী সর্বত্র বিচরণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ না বুঝে তাকে উত্ত্যক্ত করত। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজের সাথে দেখা হলে তিনি তাকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করেন।

তেমনি, ইস্‌কন ভক্তরা যদিও মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষের দ্বারা ভুল

বোঝাবুঝি ও হয়রানির শিকার হন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জন্য তারা ওই ধরনের গুণ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হন। এখন যেকোনো জায়গায় এই ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুশীলন ও আদৃত হচ্ছে– বিশেষত ইতালি, আয়ারল্যান্ড, পশ্চিমে ইউরোপ এবং ভারতেও ভক্তদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

একজন রাজা এবং বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যে আরেকটি পার্থক্য লক্ষ করা যায়– রাজা সম্মান অর্জন করেন তার শক্তি বা ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বারা। অন্যদিকে বিদ্বান ব্যক্তি সম্মান অর্জন করেন তার সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের জন্য। বিদ্বান ব্যক্তির আচরণ সর্বজনীন, পক্ষান্তরে রাজার আচরণ আঞ্চলিক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। এ কারণে বিদ্বান ব্যক্তি রাজার চেয়ে অধিক মূল্যবান। যদি কোনো ব্যক্তি সত্যিই বিদ্বান হন, তিনি সকলকে এমন কিছু দিতে পারবেন, যা একজন রাজনীতিবিদ দিতে পারেন না– যা মানুষকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারবে। তিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি দান করতে পারেন। তার আনুগত্যে, রাজাও জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, হতে পারেন 'রাজর্ষি'।

বিদ্বান ব্যক্তির গুণ হলো, তিনি অন্যদের কাছে সম্মান আশা করেন না। আমরা কেশব কাশ্মীরী সম্পর্কে জানি যে তিনি সবদিক থেকে জয় লাভ করে গর্বস্ফিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পেশাদারি তার্কিক। অনেক পুরস্কার লাভ করেছিলেন এবং অনেক ব্যক্তি কর্তৃক খেতাব অর্জন করেছিলেন। নিজেকে যিনি পণ্ডিত ভাবেন, তিনি আসলে পণ্ডিত নন। বিদ্যা উপলব্ধি অর্জনে সহায়তা করে এবং বিনয়ী করে তোলে। জনপ্রিয় হওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হলো অনর্থ। ভগবানকে আমাদের হৃদয়ে বসানোর পূর্বে, এই অনর্থকে অপসারণ করতে হবে। এ শ্লোকটি পড়ে মনে করা উচিত নয় যে, আমরাও জ্ঞানী এবং আমরা সম্মান পাওয়ার দাবিদার। আমরা কোনো রাজার চেয়েও উত্তম। এটা আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়, বরং উচিত বিদ্বান ব্যক্তির সেবা করার মানসিকতা তৈরি করা।

পণ্ডিত ব্যক্তি কে? অনেকেই রবিশঙ্কর এবং বিভিন্ন রাজনীতিবিদ পণ্ডিতদের কথা বলেন। কীভাবে একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে চিনতে হয়, শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্পর্কে আমাদের একটি কৌতুক বলেছিলেন:

"আপনি কি বুদ্ধিমান?"

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমাকে আমার পকেটটি দেখতে দিন।"

"আপনি পকেট দেখছেন কেন?"

"যদি আমার পকেটে টাকা থাকে, তবেই আমি বুদ্ধিমান।"

১ প্রবচন, দিল্লি, মে ২১, ১৯৭৩।

২ প্রবচন, দিল্লি, মে ২১, ১৯৭৩।

৩ চৈ.চ আদি ১৭/২৫০ তাৎপর্য।

৪ চৈ.চ আদি ১৭/২৬৫ তাৎপর্য।

শ্লোক ২৫

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্ব-শাট-পটাবৃতঃ।
তাবৎ চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥

দূরতঃ– দূর থেকে; ***শোভতে–*** দেখতে খুব ভালো; ***মূর্খঃ–*** একটি মূর্খ; ***লম্ব-শাট-পটাবৃতঃ–*** লম্বমান বস্ত্রাবৃত; ***তাবৎ–*** ততক্ষণ; ***চ–*** এবং; ***শোভতে–*** দেখতে খুব ভালো; ***মূর্খঃ–*** একটি মুর্খ; ***যাবৎ–*** যতক্ষণ; ***কিঞ্চিৎ–*** কিঞ্চিৎ পরিমাণ; ***ন–*** না; ***ভাষতে–*** কথা বলে।

অনুবাদ

দূর থেকে কোনো সুন্দর লম্বমান পোশাক পরিহিত মূর্খ ব্যক্তিকে ততক্ষণই ভালো দেখায়, যতক্ষণ সে কথা না বলে।

তাৎপর্য

এ নীতি অনুসরণ করে মাঝে মাঝে জ্ঞানী ও যোগীরা নীরবতা পালনের ব্রত গ্রহণ করেন প্রজল্প এড়ানোর জন্য। মনকে মূর্খতা থেকে পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে কেউ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে সক্ষম হয়। ভগবান কপিলদেবের পিতা কর্দম মুনি, তাই এ নীতি গ্রহণ করে সন্ন্যাস নিয়ে বনে গমন করেছিলেন। "সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য এবং সর্বতোভাবে তার শরণ গ্রহণ করার জন্য কর্দম মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। নিঃসঙ্গ হয়ে একজন সন্ন্যাসীরূপে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন, অগ্নি এবং আশ্রয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে মৌনতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

"মৌন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নীরবতা'। নীরব না হলে ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করা যায় না। এমন নয় যে, মূর্খ হওয়ার ফলে অথবা ভালোভাবে কথা বলতে না পারার ফলে, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হবে। পক্ষান্তরে, নীরব থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে তাঁকে বিরক্ত না করতে পারে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মূর্খ যতক্ষণ কিছু না বলে, ততক্ষণ তাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কথা বলাই আসল পরীক্ষা। নির্বিশেষবাদী স্বামীর যে তথাকথিত মৌনব্রত, তা সূচিত করে যে, তার কিছুই বলার নেই; সে কেবল ভিক্ষা করতে চায়। কিন্তু কর্দম মুনি যে মৌন অবলম্বন করেছিলেন, তা তেমন ছিল না। তিনি অর্থহীন প্রজল্প থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মৌন অবলম্বন করেছিলেন।"

শুকদেব গোস্বামী এমনভাবে তার জীবনকে পরিচালনা করতেন, যেন তিনি মূর্খ, কিন্তু কথা বলার মাধ্যমে তিনি তার জ্ঞানই প্রকাশ করতেন। শ্রীল

প্রভুপাদ উল্লেখ করেন, "চোখ দিয়ে সাধুকে চেনা যায় না, তাঁকে চিনতে হয় তার মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোনো সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তার কাছে যাওয়া উচিত তার মুখের কথা শোনার জন্য।"[২]

অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে জড়ভরতের, যিনি বোবা ও প্রতিবন্ধী সেজে তার মহিমা আবৃত করে রেখেছিলেন। কিন্তু রাজা রহুগণের সাথে কথা বলার সময় তিনি নিজেকে সর্বোচ্চ পরমার্থবাদী হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তিনি কীভাবে কথা বলবেন, তার ভাষা কীরকম হবে, কীভাবে তিনি বসবেন, কীভাবে হাঁটবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি কীভাবে কথা বলেন; কারণ, কথার মধ্য দিয়েই সবচেয়ে গভীরভাবে মানুষের অন্তরের ভাবের প্রকাশ হয়। প্রবাদে আছে, মূর্খ যতক্ষণ তার মুখ না খুলছে, ততক্ষণ তার মূর্খতা প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে ভালো পোশাকে সজ্জিত মূর্খ যতক্ষণ তার মুখ না খুলছে, তাকে চেনার উপায় নেই। কিন্তু যখনই সে মুখ খোলে তার পরিচয় প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া আর কোনো কথাই বলেন না।"[৩]

মৌনতার প্রকৃত সার্থকতা প্রজল্প থেকে বিরত এবং ভগবানের লীলাবর্ণনে নিযুক্ত থাকার মধ্যে। এভাবেই জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য ভগবান সম্পর্কে সর্বদা কীর্তন ও শ্রবণ করা উচিত।

ভক্তরা মাঝে মাঝে এ নিয়ে ভয় পেয়ে থাকেন। তারা স্বাভাবিকভাবে অন্তর থেকে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা বলতে চান, কৃত্রিমভাবে নয়। এমনকি আমরা কৃত্রিমভাবে বলা কৃষ্ণকথাও এড়ানোর চেষ্টা করি। আমরা কখনোই উপলব্ধিহীন কোনো কিছু করি না। শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস রেখে কথা বলতে হলে দৃঢ়তার প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় যদি আমরা তেমন গভীরভাবে কৃষ্ণের লীলাকথা বর্ণনা করতে না পারি, তবুও কৃষ্ণ তা মূল্যায়ন করেন। প্রবচন দেওয়ার মাধ্যমে, বন্ধুমহলে কৃষ্ণকথা বলার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আমাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তবে আমাদের অবশ্যই উপলব্ধির স্তর থেকেই কথা বলতে হবে। এভাবেই প্রথম থেকে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃষ্ণকথা বলতে হবে এবং কৃত্রিম বলে মনে হয় এমন তাত্ত্বিক কথা এড়িয়ে চলতে হবে। শ্রোতাদের সম্মুখে কথা বলতে গিয়ে আমরা কোনো বিষয়ে আমাদের উপলব্ধির অভাব প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু পরবর্তীকালে অবশ্যই নিজস্ব উপলব্ধি খুঁজে বের করে তা বলতে হবে।

ভক্তরা অন্য আরেকজন ভক্তের অন্তরের উপলব্ধি শ্রবণ করতে পছন্দ করে, এমনকি যদি সেটা তেমন উন্নত নাও হয়। মাঝে মাঝে নবীন ভক্তরাও সুন্দরভাবে

তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। আমার মনে পড়ে, ব্যাসপূজা উৎসবে একজন ভক্ত কীভাবে তার মনের অনুভুতি প্রকাশ করেছিল। সে তেমন সুশিক্ষিত ছিল না এবং বলেছিল, "আমি শুধু এই বলতে চাই যে, আমার গুরুদেব না থাকলে আমি এখন মদের দোকানে পড়ে থাকতাম।" তার আন্তরিক উপলব্ধি সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। সংক্ষেপে সত্য কথা বলাই প্রকৃত বাগ্মীতা।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, যখন আমরা কৃষ্ণকথা বলি, তখন আমাদের জড়বিষয়ের চিন্তা পরিহার করতে হবে। পরোক্ষভাবে তা কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত হলে সেটা কৃষ্ণকথা নয় কি? ভক্ত হিসেবে মাঝে মাঝে আমরা আমাদের সেবা বা সমস্যা সম্পর্কে বলি, এটা কি কৃষ্ণকথা, নাকি প্রজল্পের তালিকায় পড়ে? যেকোনো ধরনের কথা, যদি তা কৃষ্ণ সম্পর্কিত বা কৃষ্ণসেবা সংক্রান্ত হয়– তবে তা পারমার্থিক। কৃষ্ণসেবা সংক্রান্ত যেকোনো কথাই কৃষ্ণকথা। উদাহরণস্বরূপঃ আমরা যদি একটি ভক্তগোষ্ঠী তৈরি করি যারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হরিনাম করবে এবং প্রবচন প্রদান করবে, তবে সেটা করতে গিয়ে আমাদের অনেক কথা বলতে হবে। কে মৃদঙ্গ নিয়ে আসবে? আপনি কি অনুষ্ঠানটির প্রচারণা করেছিলেন? গাড়িগুলো কি প্রস্তুত? এসব কথা ছাড়া আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারব না। আর এর সবই কৃষ্ণকথায় পর্যবসিত। প্রায়োগিক অর্থে, এটি কৃষ্ণকথা বলার মতো তত উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু অন্যদিকে বিচার করলে, কৃষ্ণকথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটি অত্যাবশ্যক। হরিনাম করা, প্রবচন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি কৃষ্ণকথা বলতে হবে।

যে কেউ তার নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে উপদেষ্টা শ্রেণীর ভক্তদের সাথে কথা বলতে পারেন, এটা পরিপূর্ণ কৃষ্ণকথার ঘাটতি বলেই বিবেচিত হবে, কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। তবে তা বিরামহীন চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যদি আমরা মানসিক বা শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ নাও থাকি, কিংবা কৃষ্ণকথার আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত নাও হয়, তবু যতদুর সম্ভব আমাদের কৃষ্ণকথা চালিয়ে যাওয়া উচিত। সেজন্য যতদূর সম্ভব আমাদের কৃষ্ণকথা ব্যক্ত করা উচিত। তা জাগতিকভাবে মৌন করে অথবা মায়া ভঙ্গ করে, কিন্তু অবশেষে মুক্তি নিয়ে আসে।

১ ভাঃ ৩/২৪/৪২।
২ ভাঃ ১/৪/৬ তাৎপর্য।
৩ ভ.গী. ২/৫৪।

শ্লোক ২৬

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে তদ্বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

একেন– একটি; ***অপি–*** ও; ***সুবৃক্ষেণ–*** ভালো বৃক্ষ; ***পুষ্পিতেন–*** পুষ্পিত; ***সুগন্ধিনা–*** সুগন্ধযুক্ত; ***বাস্যতে–*** সুবাসিত করে; ***তৎ–*** সেই; ***বনম্–*** বন; ***সর্বম্–*** সমগ্র; ***সু-পুত্রেণ–*** সু পুত্রের দ্বারা; ***কুলম্–*** কুল; ***যথা–*** যেমন।

অনুবাদ

একটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষের পুষ্প যেমন এর সুবাস দ্বারা সমগ্র বনকে সুবাসিত করে, তেমনি একজন সুপুত্রও সমস্ত পরিবারের মহিমা বৃদ্ধি করে।

তাৎপর্য

এ শ্লোকটি অন্য একটি শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যথা : 'একটামাত্র চাঁদই সমস্ত আকাশ আলোকিত করতে পারে।' শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু প্রচেতাগণের কঠোর তপস্যা প্রত্যক্ষ করে তৃপ্ত হয়ে তাঁদের সুসন্তান লাভ করার জন্য আশির্বাদ প্রদান করেছিলেন, "যারা কোনো অংশে ব্রহ্মার চেয়ে কম হবে না।" শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন, "মহা-রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলেন যে, বাগানে কিংবা বনে যদি একটা ভালো গাছ থাকে, তাহলে তার ফুলের সুগন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হয়ে উঠবে। তেমনই, বংশের মধ্যে একটি সুসন্তান সারা পৃথিবীতে সমগ্র বংশকে বিখ্যাত করে তোলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে যদুবংশ জগদ্বিখ্যাত হয়েছে।"[১]

এর বিপরীতটাও কিন্তু সত্য। একটি গাছে আগুন লাগলে তা সমস্ত বনকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। যশ বা দুর্নামের প্রভাব খুব সহজেই ছড়ায়। একটি অংশ নষ্ট আপেল সমগ্র আপেলের ঝুড়িটিকে নষ্ট করতে পারে। অন্যদিকে একজন শুদ্ধ ভক্ত, তার চৌদ্দ কুল উদ্ধার করতে পারে।

অবশ্য, জড় জাগতিকভাবে আমাদের পরিবারের যশ অন্বেষণ করা উচিত নয়। শ্রীল প্রভুপাদ এধরনের মানসিকতা নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করার নিরর্থকতা তুলে ধরেছেন। অনেকে ভাবতে পারে, আমরা চলে যাওয়ার পরও আমাদের পরিবার তার সুফল ভোগ করতে পারবে। কিন্তু পরে আমরা কোথায় যাব, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। যদি আমরা কৃষ্ণভাবনাময় হই, তাহলে আমাদের পরিবার সবচেয়ে সঠিক কারণে যশস্বী হবে। এভাবে একটি ভক্ত পরিবার সারা বিশ্বের আশীর্বাদের কারণ হবে। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রকৃত যশ বা খ্যাতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন,

তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, প্রকৃত খ্যাতি বা যশ হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত হওয়া। এছাড়া আর যা কিছু যশ বলে পরিচিত, তা প্রকৃতপক্ষে চপলতা বা অখ্যাতিও বলা যেতে পারে।

গৎবাধা ভক্তিমূলক সেবায় সুসন্তান লাভ করা যায় না। আমরা ভাগবতমে পড়েছি কীভাবে একটি পরিবারেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্ম হয়েছিল। তারা সবাই সুসন্তান ছিল। মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি, কর্মের দ্বারা কোনো সন্তান হয়তো শক্তিশালী ও প্রতিরক্ষাপরায়ণ হতে পারে এবং আরেকজন সন্তান ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ : ব্রহ্মার অনেক পুত্র ছিল, তার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন সমগ্র মানবজাতির পিতা এবং তিনি অনেক সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুপুত্র। চতুষ্কুমারেরা সন্তান উৎপাদন করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারাও সুসন্তান ছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার জন্য নারদমুনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, তিনি ও সুসন্তান ছিলেন। এক প্রকৃতির বিচার করে সুসন্তানের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

তদ্রূপ ইস্‌কনে শ্রীল প্রভুপাদের অনেক সুসন্তান আছে। কেউ ব্রহ্মচারী গ্রন্থ বিতরণকারী, কেউ ভালো গৃহস্থ, কেউ শান্ত, দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন পূজারী। শ্রীল প্রভুপাদের ম্যানেজারও আছেন এবং সাধারণ সেবকও আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য তারা সবাই সুসন্তান। একজন কুপুত্র প্রতিজ্ঞা করে এবং পরবর্তীকালে তা ভঙ্গ করার মাধ্যমে তার গুরুদেবকে হতাশ করে দেয়।

ইস্‌কন হচ্ছে একটি পারমার্থিক পরিবার। যদি একজনও শুদ্ধ ভক্ত হয়, তাহলে কি আমরা সবাই মুক্ত হয়ে যাব? না, শ্রীল প্রভুপাদ সব সময় এই ধারণাটি নিয়ে কৌতুক করতেন। তিনি এই ধারণাটিকে নিরীশ্বরবাদী ধারণা হিসেবে উল্লেখ করতেন। যদি মূলত এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব বিরাজমান থাকে, তবে আমরা সবাই ব্রহ্ম। যদি জীব মায়া থেকে মুক্ত হয়, তাহলে সে ব্যক্তিও ব্রহ্ম হয়ে যায়। কেন প্রত্যেকটা জীব তার সাথে লীন হয়ে যায় না? কারণ, আমরা সকলেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আত্মোপলব্ধিও আলাদাভাবে আসে। তাই, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবেই কৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্পর্কিত হতে হবে।

অপরপক্ষে যদি প্রত্যেক ভক্ত উন্নত হন, তাহলে তিনি অন্য ভক্তকে উন্নত হওয়ার জন্য সাহায্য করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদ উভয়েই বলেছেন, তারা তাদের কর্মকে সার্থক করতে পারেন যদি একটিমাত্রও শুদ্ধ ভক্ত হয়। একজন শুদ্ধ ভক্ত সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনেন।

১ ভা: ৪/৩০/১২ তাৎপর্য।

শ্লোক ২৭

উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশ্যন্তি মুখে মৃগঃ ॥

উদ্যমেন– প্রচেষ্টা দ্বারা; ***হি–*** অবশ্যই; ***সিদ্ধন্তি–*** লাভ করে; ***কার্যাণি–*** ক্রিয়াসমূহ; ***ন–*** না; ***মনোরথৈঃ–*** ইচ্ছা করে বা স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে; ***ন–*** না; ***হি–*** অবশ্যই; ***সুপ্তস্য–*** ঘুমন্ত; ***সিংহস্য–*** সিংহ; ***প্রবিশ্যন্তি–*** প্রবেশ করে; ***মুখে–*** মুখের মধ্যে; ***মৃগঃ–*** বন্যপশু।

অনুবাদ

শুধু ইচ্ছা করার মাধ্যমে কার্যসিদ্ধ হয় না, হয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আহার হিসেবে কোনো ঘুমন্ত সিংহের মুখে বনের প্রাণীরা আপনা-আপনিই প্রবেশ করে না।

তাৎপর্য

জড় জগতে অর্থাৎ এই অবিদ্যাময় জগতে সকলকেই কর্ম করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, "প্রবাদ আছে যে, সিংহ সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। হিতোপদেশে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, *ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য*.... সিংহ যদি চিন্তা করে, "আমি সিংহ। আমাকে ঘুমাতে দাও। আমার মুখের ভিতর খাবার এমনিতেই আসবে।' না, এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনি যে কেউ হন না কেন আপনাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে।"[১] একবার প্রাতঃভ্রমণে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি উল্লেখ করে বলেছিলেন, "যদি সিংহ চিন্তা করে, আমি ঘুমাব আর প্রাণীগুলো এমনিতেই আমার মুখে প্রবেশ করবে। প্রাণীরা তো আসবেই, তবে এসে বলবে, "হ্যাঁ প্রভু, আপনি ঘুমান, আমরা আপনার মুখে প্রস্রাব করছি।"[২] তিনি বিষ্ণুপুরাণ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "জড় জগতে অবস্থান করা খুবই কঠিন, কর্ম না করে কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না।"[৩]

বৈদিক সংস্কৃতিতে বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে কর্মের বিভাজন হয়। মানুষের ব্যক্তিগত কর্তব্যই তার স্বধর্ম বলে পরিচিত। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ বা শূদ্র হিসেবে কর্ম সম্পাদন করে থাকে। আধুনিক সভ্যতায় অধিকাংশ জনগণকে কারখানায় কাজ করতে হয়। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতিতে মানুষের পেশা শ্রেণীভুক্ত হতো, তার মানসিক ও শারীরিক স্বভাব অনুসারে। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, "প্রত্যেককেই তার নিজস্ব অবস্থানে স্থির থাকতে হবে। এটাই যথার্থ সামাজিক প্রথা। ভাগবতে বলা হচ্ছে, *ত্যক্তা স্বধর্ম*– পারমার্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা জড় ও চেতন দুটোর সমন্বয়েই

আছি। যতক্ষণ আমাদের দেহ আছে, ততক্ষণ পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু যখন আমরা কৃষ্ণভাবনাময় হই, তখন আর তেমন থাকি না।"[৪] কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত যদিও বাহ্যিকভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হিসেবে অনেক কার্য সম্পাদন করে, কিন্তু তার লক্ষ্য কৃষ্ণসেবা করা।

সকলকেই কার্য করতে হয়। "সেজন্য সবাইকে অবশ্যই একটা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কর্ম সম্পাদন করতে হবে, যাতে সমগ্র সমাজের মানুষ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণভাবনার পথে অগ্রসর হতে পারে।"[৫]

কর্মীরা কর্ম নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তারা ভাবে কৃষ্ণভক্তরা কর্ম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাদের এই ভুল ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, "কপট লোকেরা বলে যে কৃষ্ণভাবনামৃত জনগণকে কর্ম ত্যাগ করার শিক্ষা দিচ্ছে। না, এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ নয়। আমরা কাউকে অলস হতে দিই না। প্রত্যেককে কর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে। এটাই কৃষ্ণের আদেশ। অর্জুন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি অহিংসাপরায়ণ ভদ্রলোক হতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ কিন্তু তা অনুমোদন করেননি। তাই এটা ভাবা উচিত নয় যে কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিরা সাধারণত অলস হয় এবং হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ করে। আপনাকে শুধু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। জড় জাগতিক জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে কীভাবে ইন্দ্রিয় তর্পণ করা যায়, সে ব্যবস্থা করা। কৃষ্ণভাবনামৃত মানে সেই মনোবল ও উদ্যম নিয়েই কর্ম করা, কিন্তু কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা। এটাই পারমার্থিক জীবন, অলস হওয়া নয়।"[৬]

শুধু ভক্তরাই নয়, সকলেই জড় জগতের কঠিন পরিশ্রম থেকে মুক্ত হতে চায়। শ্রীল প্রভুপাদ তাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচনে একবার উল্লেখ করেছিলেন, *ধর্মস্য হ্যপবর্গস্য*। তিনি ব্যাকরণগতভাবে পবর্গ শব্দটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। "সংস্কৃত ব্যাকরণে পাঁচটি বর্গ আছে। এর মধ্যে প বর্গ – প, ফ, ব, ভ এবং ম পাঁচটি বর্ণ। 'প' মানে কঠোর পরিশ্রম, 'ফ' মানে ফেনা। আমরা যখন কঠোর পরিশ্রম করি, তখন আমাদের মুখ থেকে ফেনা নির্গত হয়। 'ব' মানে ব্যর্থতা বা হতাশা। এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও জড় জগৎ হতাশায় পরিপূর্ণ। 'ভ' মানে ভয়। যদিও আমি কঠোর পরিশ্রম করছি, তবুও আমাদের মনে ভয় কাজ করে। কারণ ভবিষ্যতে কী ঘটবে আমরা তা জানি না। আমরা নিশ্চিত নই যে, আমরা যা করছি তা যথার্থ কি না। প, ফ, ব, ভ এবং ম। 'ম' মানে মৃত্যু। দিবারাত্রি এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও মৃত্যু অনিবার্য।"[৭]

'প'-বর্গের বিপরীত *অপবর্গ* অর্থাৎ মুক্তি। মুক্তি আমাদের সকল প্রকার কঠোর পরিশ্রম, হতাশা, ভয় এবং মৃত্যু থেকে নিস্কৃতি দেয়। এই জগতে কেউ মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এমনকিও সিংহকেও তার শিকারধরার

জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাই, আমাদের এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, *'ন তস্য কার্যম্ করণম্ চ বিদ্যতে'* তার কোনো কিছু করার নেই। যেহেতু আমরা চিন্ময় আত্মা, প্রকৃত স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই আমাদেরও করার কিছু নেই। আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণেই জড় কর্মে লিপ্ত হই। শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করে আমাদের গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, "কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারবে।" এটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রবণতা, এই যে আমরা কোনো কাজ করতে চাই না। সেজন্য সপ্তাহের শেষে আমরা বিশ্রাম নিই। শহরের বাইরে আমরা বেড়াতে যাই। তখন সারা সপ্তাহের কঠোর পরিশ্রমের কথা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু তখন থেকেই আমাদের আবার কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমরা কর্মহীন জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। এটাই আমাদের প্রবণতা। কৃষ্ণ রাধারাণীসহ গোপীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো কাজ করেন নি। তার কোনো কর্ম নেই। আমরা ভাগবত বা অন্য কোনো বৈদিক শাস্ত্রে দেখি না যে, কৃষ্ণের একটি বড় কারখানা রয়েছে এবং তাকে দশটায় অফিসে যেতে হয়। তারপর অর্থ উপার্জন করতে হয় এবং রাধারাণীর সাথে আনন্দ উপভোগ করতে হয়। না, আমরা এ ধরনের দুষ্ট ভগবান চাই না। ভগবান হলেন তিনি, যার কোনো কিছু করতে হয় না।"[৮]

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা জড় জগতে অবস্থান করছি। তাই যদিও আমরা পারমার্থিক জীবনে নিয়োজিত আছি, তবুও আমাদের কাজ করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এ ধরনের কাজের একটা নমুনা দিয়েছিলেন, ভক্তরা কর্মে নিয়োজিত হয় না বরং ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হয়। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তপস্যা ও দান ত্যাগ করা উচিত নয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন, "কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত কারখানায় কাজ করতে পারেন, কিন্তু তিনি উপার্জিত অর্থ কৃষ্ণসেবায় ব্যয় করেন। যেহেতু তিনি ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করছেন, সে জন্য তিনি সাধারণ কর্মীদের থেকে ভিন্ন। কর্তব্যকর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। যদি কেউ তার কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে, তাহলে বুঝতে হবে এটা এক প্রকার মায়া। এমন বৈরাগ্যকে অজ্ঞতা বলা হয়। জড় জাগতিক সন্তুষ্টির জন্য যে কর্ম, তা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কিছু কর্ম রয়েছে যা আমাদের পারমার্থিক প্রগতিতে সাহায্য করে, যেমন– ভগবানের জন্য রান্না করা, ভোগ নিবেদন করা এবং তারপর প্রসাদ গ্রহণ করা।

অর্থ উপার্জন করাকে ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম বলে মনে করে কৃষ্ণভক্তের অর্থ উপার্জন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা হয়, অথবা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা যদি পারমার্থিক কৃষ্ণভক্তির সহায়ক হয়, তাহলে সেসব কর্ম কষ্টদায়ক বলে, তার ভয়ে সেগুলোর অনুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এই ধরনের ত্যাগ রাজসিক। রাজসিক কর্মের ফল সবসময় ক্লেশদায়ক হয়। সেই মনোভাব নিয়ে কেউ যদি কর্মত্যাগ করেন, তাহলে তিনি ত্যাগে যথার্থ সুফল কখনোই অর্জন করতে পারেন না।

তারপর, “হে অর্জুন! আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলেন, “এমন মনোভাব নিয়ে সর্বদাই নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত যেন ফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা হয়। এমনকি, কাজের ধরনের প্রতিও অনাসক্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণভাবনাময় কোনো ভক্ত যদি কখনও কোনো কারখানাতেও কাজ করেন, তখন তিনি কারখানার কাজের প্রতি আসক্ত হন না। ... আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বহু সভ্য রয়েছেন, যারা অফিসে, কলকারখানায় অথবা অন্য জায়গায় খুব কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং তারা যা রোজগার করছেন, তার সবই সংঘকে দান করছেন। এ সমস্ত মহাত্মারাই যথার্থ সন্ন্যাসী।”[৯]

এই তাৎপর্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, শ্রীল প্রভুপাদ কখনো কর্ম পরিত্যাগ করতে বলেননি, বরং কর্মী মনোভাব ত্যাগ করতে বলেছেন। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কর্ম ও ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে সম্পাদিত সেবার মধ্যে সম্পর্ক কী?

আমাদের পারমার্থিক জীবনের প্রথম থেকেই শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে উৎসাহিত করতেন। এই জগতে কারোর যদি কবিত্ব থাকে, তবে তিনি ভগবান সম্পর্কে লিখতে পারেন। তিনি কি শুধু নবীনদের উৎসাহিত করার জন্যই বলেছিলেন? হতে পারে। যাই হোক, এভাবেই আমাদের গুরুদেবের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে, তবেই আমরা ভগবানের ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব। এভাবে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা এবং ভগবানের কৃপার দ্বারা তার সঙ্গী হতে পারব।

এই কৃপা ও প্রচেষ্টার সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যশোদা মাতা যখন কৃষ্ণকে উদুখলের সাথে বন্ধন করেছিলেন, সেই লীলায়। তিনি চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকে রজ্জু দিয়ে বন্ধন করার জন্য। কিন্তু রজ্জুটি দু'ইঞ্চি পরিমাণ ছোট হতে লাগল। তার প্রচেষ্টা যথেষ্ট হলো না। কিন্তু যখন কৃষ্ণ মা যশোদাকে কৃপাবারি বর্ষণ করলেন, তখনই যশোদা মাতা ভগবানকে বন্ধন করতে সক্ষম হলেন।

আরেকটি প্রশ্ন ভক্তরা প্রায়ই করে থাকে, অভ্যন্তরীণ কর্ম বাহ্যিক কর্মের মতো তত মূল্যবান কি না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন কৃষ্ণভাবনায় কোনো বাহ্যিক কর্ম নেই। একজন ভক্তের সব কাজই চিন্ময়, ভগবানের বাসন পরিষ্কার, নামজপ যা করা হোক না কেন, ভক্ত যা-ই করেন, সবকিছুই চিন্ময়। যদি আমরা কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি, যেমন মন্দির নির্মাণ করা, অর্থ সংগ্রহ করা, তবে সেটা বাহ্যিক কর্ম, কারণ এসব পরিমাপ করা যেতে পারে। তাই এগুলোকে আমরা সাধনা গভীর করা বা জাগতিক বাসনা পরিত্যাগ করার চেষ্টার মতো অভ্যন্তরীণ কর্মের সাথে তুলনা করতে পারি না। কিন্তু আমরা কীভাবে বলতে পারি, একটি সেবা আরেকটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? কারণ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা ছাড়া, বাহ্যিক সেবা কর্মমিশ্রা ভক্তির স্তরে থেকে যায়। যখন আমরা শুদ্ধ হবো, তখন আমরাও অনেক বাহ্যিক সেবা করতে পারব।

১ প্রবচন, বোম্বে, নভেম্বর ১১, ১৯৭৫।
২ প্রাতঃভ্রমণ, তেহ্‌রান, আগস্ট ১২, ১৯৭৬।
৩ প্রবচন, লন্ডন, সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৭৩।
৪ প্রবচন, লন্ডন, সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৭৩।
৫ প্রবচন, লস্ এঞ্জেলস্, আগস্ট ১৭, ১৯৭২।
৬ প্রবচন, বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ২১, ১৯৭৬।
৭ প্রবচন, নিউ বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭২।
৮ প্রবচন, নিউ বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭২।

৯ ভ.গী. ১৮/৭-১১।

শ্লোক ২৮

সুখার্থী চেৎ ত্যজেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী চেৎ ত্যজেৎ সুখং।
সুখার্থীনঃ কুতো বিদ্যা কুতো বিদ্যার্থীনঃ সুখং ॥

সুখার্থী– সুখ প্রত্যাশী; ***চেৎ***– যদি; ***ত্যজেৎ***– ত্যাগ করা উচিত; ***বিদ্যার্থী***– বিদ্যা লাভে প্রত্যাশী; ***চেৎ***– যদি; ***ত্যজেৎ***– ত্যাগ করা উচিত; ***সুখং***– জাগতিক সুখ; ***সুখার্থীন***– সুখ প্রত্যাশীর জন্য; ***কুতঃ***– কোথায়; ***বিদ্যাঃ***– বিদ্যা; ***কুতঃ***– কোথায়; ***বিদ্যার্থীনঃ***– বিদ্যা লাভেচ্ছু; ***সুখং***– জাগতিক সুখ।

অনুবাদ

যদি পারমার্থিক উন্নতি চান, তবে আপনার ভাবা উচিত, মৃত্যু আপনার সন্নিকটে কিন্তু যদি জড়-জাগতিকভাবে সুখী হতে চান, তবে আপনার ভাবা উচিত, আপনি কখনই মৃত্যুবরণ করবেন না।[১]

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ একবার বলেছিলেন, দর্শন বলতে বোঝায় মৃত্যুকে সর্বদা নিজের সম্মুখে রাখা। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে, জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হলো জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধি। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়টি সবসময় মাথায় রাখেন। কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার কারণে, তিনি এতে ভয় পান না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "মৃত্যু অবশ্যই আসবে? এতে কোনো ভুল আছে কি? তিনি জানেন, এ দেহ ত্যাগ করার পর তিনি কৃষ্ণের কাছে যাবেন।"[২] যিনি এ ধরনের দৈহিক পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না, তাকে বলা হয় ধীর। তিনি উদ্বেগের কারণ থাকলেও, উত্তেজিত হন না।

চাণক্য পণ্ডিত জড়বাদীদের প্রতি শ্লেষপূর্ণ কথা বলে রসিকতা করেছেন। জড় সুখ ভ্রম মাত্র। তাই কোনো পাগল যদি এ ধরনের সুখভোগ করতে চায়, তবে তার উচিত মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া। চাণক্য পণ্ডিত জোরালোভাবে এটি প্রকাশ করতে না পারলেও আমি বলি এটি একটি শ্লেষপূর্ণ বাক্য, যা মৃত্যুতুল্য সচেতনতা উপহার দেয়।

কোনো লোককে যদি এমন চিন্তা করতে বলা হয়, সে অবশ্যই বলবে, "আমি মারা যাব।"

"আপনি উপভোগ করতে চান, খুব ভালো। তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে আপনি মৃত্যুকে ভুলে যান এবং ভাবুন আপনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন।" চাণক্য পণ্ডিত এ সম্পর্কে চিন্তা করতে অক্ষম বিষয়ীদের জন্য ভ্রান্ত দর্শন উপস্থাপন করেছেন। বিষয়ীরা মায়ার জগতে বাস করছে। এজন্য তাদের

অবশ্যই একটি মিথ্যা দর্শন নিয়ে বাঁচতে হবে। আশা করা যায়, পর্যায়ক্রমে তারাও উপলব্ধি করতে পারবে যে মিথ্যার চেয়ে সত্য নিয়েই বেঁচে থাকা ভালো ছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সবাই এই মিথ্যা আশাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তারা মৃত্যুর জন্য পরিকল্পনা করে না। ফলে হঠাৎ করে মৃত্যু এলে তারা হকচকিত হয় এবং তাদের মূর্খতা বুঝতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, যদি বিষয়ীরা আত্মার দেহান্তর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হয়, তবে তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। কোনো ব্যক্তি নিম্ন প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করে আরো দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার খবর কীভাবে মোকাবেলা করবে? তাই তারা এ সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করে না। তারা ভাবে, আত্মার দেহান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অবান্তর।

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি থেকে কেউ মুক্ত নয়। কেউ এই সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম নয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই এ অজেয় সমস্যাকে জয় করা যায়। একবার শ্রীল প্রভুপাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন করছি জীবনের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য। তাই আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করুন, যাতে এই সমস্যাগুলো দূর করা যায়।"[৩]

মৃত্যু যেকোনো সময় আসতে পারে, এই সচেতনতা থাকলে মানসিক দৃঢ়তা লাভ হয়। মাঝে মাঝে কৃষ্ণ আমাদের উপলব্ধি গভীর করতে সাহায্য করেন। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেরই আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিংবা অনেকেই নিজের সামনে অন্যের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব ঘটনা আমাদের দুঃখ দিয়ে থাকে।

আমরা আমাদের চারপাশ প্রত্যক্ষ করতে পারি ও প্রবহমান কালকে দেখতে পারি, আর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি। শাস্ত্রে এ সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আয়নায় আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখলেই আমরা আমাদের আসন্ন বার্ধক্য উপলব্ধি করতে পারি। ঋতু পরিবর্তন দেখতে পারি, প্রকৃতিতেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রত্যক্ষ করতে পারি। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদেরও মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তারা নাস্তিক তাই মৃত্যুর অনিবার্যতা তাদের কাছে অর্থহীন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "মৃত্যু একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু ভক্তের জন্য তা বিশেষ কিছু, কেননা মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণের কাছে যাচ্ছেন। শাস্ত্র আমাদের এ শিক্ষাই দিয়ে থাকে এবং

আমাদের এর প্রতিই বিশ্বাস থাকতে হবে, কারণ এটাই সত্য। নাস্তিক অস্তিত্ববাদীদেরও এ সম্পর্কে বিশ্বাস রয়েছে, সার্ত্রে ও কেমুস প্রভৃতি লেখকদের রচনাতেও এটি স্পষ্ট। এসব দার্শনিকরা শিক্ষা দেয় যে, সবকিছুই অযৌক্তিক। অস্তিত্ববাদীরাও চিন্তা করে অন্য কোনো ধর্মীয় মতবাদের চেয়ে এ দর্শন ভালো এবং সুগভীর। এসব দার্শনিকেরা তাদের গুরুদের অযৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে এবং এদের অনেকেই পরিশেষে আত্মহত্যা করে।

ভক্তরা কৃষ্ণকে অনুসরণ করে থাকে, যিনি বলেন চিজ্জগতের জীবনই অর্থবহ। যখন অস্তিত্ববাদীরা জড় জগতের মায়িক প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করে, তখন এই দর্শনই তাকে অসহায় করে দেয়। এজন্য ভক্তরা এ ধরনের উপলব্ধি প্রত্যাশা করেন না। মৃত্যু আমাদের কৃষ্ণের আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করে।

১ এ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ : বহু পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালাভ হয়। বিদ্যালাভ ও সুখলাভ – এই দু'টি কাজ কিন্তু একসঙ্গে হয় না। আরাম বা সুখ পেতে হলে বিদ্যালাভ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। বিদ্যালাভে আগ্রহী হলে সুখ বা আরামদায়ক ব্যাপারগুলো পরিত্যাগ করতে হবে।

২ প্রবচন, বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৬।

৩ প্রবচন, ডারবান, অক্টোবর ১১, ১৯৭৫।

শ্লোক ২৯

অহো বৎ বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মণং।
লক্ষীং তৃণ্যা মন্যন্তে তৎ ভারেণ নমন্তি চ ॥

অহোবৎ– কী আশ্চর্য; ***বিচিত্রাণি–*** বিস্ময়কর; ***চরিত্রাণি–*** চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য; ***মহাত্মণং–*** মহাত্মাদের, ***লক্ষীং–*** সম্পদ; ***তৃণ–*** ঘাসের মত; ***মন্যতে–*** মনে করে; ***তৎ–*** তাকে; ***ভারেণ–*** বোঝা; ***নমন্তি–*** নমস্কার করা; ***চ–***ও।

অনুবাদ

মহৎ ব্যক্তিদের আচরণ কী বিস্ময়কর। ধন-সম্পদকে তারা তেমন গ্রাহ্যই করেন না, কিন্তু একে তারা দায়ভার হিসেবে গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ, ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং অনেক বৈদিক রাজা মহাত্মাগণ ধনী ছিলেন, তারা তাঁদের অর্থ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। কৃষ্ণভাবনায় বিষয়-সম্পদ গ্রহণের নীতি দেখতে পাওয়া যায় সুদামা ব্রাহ্মণের কাহিনীতে, তিনি সরাসরি কৃষ্ণের কাছ থেকে প্রভূত সম্পদ লাভ করেছিলেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে, তার এই কাহিনী উল্লেখ আছে। ভগবান তার ভক্তকে সহজেই সম্পদ দান করেন না, এমনকি ভক্ত ভগবানের কাছে চাইলেও না। "জড় জগতে অবস্থান করায় পতনের আশঙ্কা থাকায় অপরিণত ভক্তকে ভগবান বিপুল ঐশ্বর্য দান করেন না। এটিই ভক্তের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী করুণার আরেকটি লক্ষণ। ভক্তের যাতে পতন না হয়, সেদিকেই ভগবানের প্রথম লক্ষ্য।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, কৃষ্ণ হলেন শুভানুধ্যায়ী পিতা। তিনি তার অপরিপক্ব সন্তানদের অর্থ দান করেন না। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তার পুত্র পরিপক্ব হয়েছে এবং কীভাবে অর্থ ব্যয় করতে হয় তা বুঝতে পারে, তখন তিনি তাকে সমগ্র কোষাগারটিই দান করতে পারেন। সুদামাকে ভগবান অনেক সম্পদ দান করেছিলেন। সবকিছু প্রাসাদে রূপান্তরিত হওয়ায় তিনি তার পূর্বের গৃহ চিনতে পারেননি। সুদামা এই পরিবর্তনকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ সুদামা বিপ্র এভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে ভগবানের কাছ থেকে যে ঐশ্বর্য-বৈভব তিনি পেয়েছেন, তা অসংযতভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যেন ব্যবহৃত না হয়, পক্ষান্তরে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা উচিত। বৈরাগ্যবান হয়ে ও ইন্দ্রিয়ভোগে অনাসক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ সেই নবলব্ধ ঐশ্বর্য গ্রহণ করলেন এবং পত্নীসহ সকল ঐশ্বর্য-সম্পদ ও সুযোগ সুবিধাগুলো ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করলেন।"[২]

তাই আমাদের সুদামা বিপ্রের পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত। আমরা যা কিছুই পাই– টাকা, শক্তি, শিক্ষা, সৌন্দর্য সবকিছুই কৃষ্ণের কৃপা বা দান

হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং তা কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। "জড় প্রাচুর্য পতনের কারণ হতে পারে এবং একই সাথে উন্নতিরও কারণ হতে পারে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী সবকিছু নির্ধারিত হয়।"

বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবোপাসকেরা সাধারণত ধনী হয়, অন্যদিকে বিষ্ণুভক্তরা সাধারণত দরিদ্র হয়ে থাকেন। তার অর্থ এই নয় যে বৈষ্ণব হলে সবাইকে জড় জাগতিকভাবে গরিব হতে হবে। বলি মহারাজ অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন– তিনি ত্রিলোকের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সবকিছু ভগবান বামনদেবকে দান করেছিলেন। পরিবর্তে ভগবান বিষ্ণু বলি মহারাজকে সমগ্র জগতের শাসনভার দান করেছিলেন। পরিশেষে তিনি ভগবান ব্রহ্মার কাছে বলেন, "কোনো মানুষ যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা উচ্চকুলে জন্ম, অদ্ভুত কর্ম, যৌবন, দেহের সৌন্দর্য, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য বা ধনের গর্বে গর্বিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছে।"[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন, ধন থেকে বঞ্চিত হওয়াকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করা উচিত নয়। কেউ যদি তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদে থাকেন এবং অনর্থক গর্বিত না হন যেন তিনিই সবকিছুর মালিক, তাহলে সেটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "ভগবান যদিও কখনো কখনো পুণ্যকর্ম জনিত ঐশ্বর্য হরণ করেন, তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তিজনিত ঐশ্বর্য কখনও হরণ করেন না। ভগবান তার ভক্তকে নিরভিমান করার জন্য তার সম্পদ হরণ করে নেন। কোনো বিশেষ ভক্তের কাজ যদি প্রচার করা হয়, কিন্তু তিনি তার পরিবার অথবা ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভগবানের সেবা করতে না চান, তাহলে ভগবান অবশ্যই তার সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে তাকে ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে শুদ্ধভক্ত সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হন।"[৪]

একজন শুদ্ধভক্ত কলুষিত না হয়েই ভগবানের সেবায় অর্থ ব্যবহার করতে পারেন, এভাবে তিনি তার শিক্ষাকে ব্যবহার করতে পারেন। "শিক্ষিত ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সমন্বিত অনেক সাহিত্য ও প্রকাশনার দ্বারা, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যবহার করতে পারেন। এটাই যথোপযুক্ত ব্যবহার। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং*। যখন আপনি আপনার বিদ্যা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করবেন, তখন সেই বিদ্যা সফল হবে।"[৫]

১ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যায় ১২, ।
২ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যায় ১২, ।
৩ ভাঃ ৮/২২/২৬।
৪ ভাঃ ৮/২২/২৮ তাৎপর্য।
৫ প্রবচন, মন্ট্রিয়েল, জুলাই ১২, ১৯৬৮।

শ্লোক ৩০

শরীরস্য গুণানাম চ দূরম অত্যন্তং অনন্তরম্।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসী কল্পান্তস্থায়ীনো গুণাঃ ॥

শরীরস্য– শরীরের; ***গুণানাম–*** গুণ (কোনো ব্যক্তির); ***চ–*** এবং; ***দূরম্–*** দূরে; ***অত্যন্তং–*** চূড়ান্তভাবে; ***অনন্তরং–*** এই দুইয়ের মধ্যে; ***শরীরং–*** শরীর; ***ক্ষণ–*** মুহূর্ত; ***বিধ্বংসী–*** ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; ***কল্পান্তে–*** কল্প কাল পর্যন্ত; ***স্থায়ীনঃ–*** বর্তমান থাকা; ***গুণাঃ–*** গুণসমূহ।

অনুবাদ

ব্যক্তির জড় দেহ ও সদ্‌গুণের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, জড় দেহটি চোখের পলকেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু খ্যাতি বা সুনাম চিরকাল থাকে।

তাৎপর্য

শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং যিশুখ্রিস্ট খুব অল্পকাল জগতে প্রকট ছিলেন, "কিন্তু তাদের দর্শন এবং ভগবৎ চেতনা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তার মাধ্যমে তারা এখনও বেঁচে আছে।"[১] তাদের কার্যাবলি গৌরবময় যশ দ্বারা প্রকাশিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে এমন আচরণ না করার উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তার যশকে ক্ষুণ্ন করবে। অবশ্য বীরত্বের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের সখা হিসেবে অর্জুনের খ্যাতি সমধিক। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সর্তক করে দিয়েছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না করলে তিনি তার যশ হারাবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতমে বর্ণিত মহাজন এবং মহান ভক্তগণ তাদের গৌরবময় কার্যাবলির জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। "ধ্রুব মহারাজের দিব্য কার্যকলাপ সারা জগতে প্রসিদ্ধ এবং তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তিনি শৈশবেই সমস্ত খেলার সামগ্রী পরিত্যাগ করে তার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ গ্রহণ করেছিলেন।"[২] এ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন,

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, সকলেরই আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু কেউ যদি যথাযথভাবে আচরণ করেন, তা হলে তার কীর্তি দীর্ঘকাল ধরে জগতে বিরাজ করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন চিরবিখ্যাত, তেমনই কৃষ্ণভক্তের খ্যাতিও চিরস্থায়ী।

তাই ধ্রুব মহারাজের লীলা বর্ণনায় দুটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার হয়েছে– বিখ্যাত এবং বিশুদ্ধ। ধ্রুব মহারাজ যে খুব অল্প বয়সেই গৃহ ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তা পৃথিবীর

ইতিহাসে একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

এসব ক্ষণজন্মা মহাত্মাদের বিপরীতে বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যা হাজার হাজার বছর বাঁচতে পারে। কোনো চিন্ময় গুণাবলি না থাকার কারণে তার দীর্ঘ আয়ুষ্কাল ব্যর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "বিষয়ভোগে প্রমত্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দীর্ঘজীবনে কী লাভ? তার থেকে বরং পূর্ণ চেতনাসম্পন্ন এক মুহূর্তও শ্রেয়, কেননা তা পরমার্থ সাধনের অন্বেষণ শুরু করিয়ে দেয়।"[৩]

যশ বলতে শুধু কয়েকটি ভালো কাজের মাধ্যমে কয়েক শতাব্দী এই পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকাকে বোঝায় না। একজন ভক্ত মৃত্যুর পরও অন্যের উপকার সাধন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ভক্ত মন্দির নির্মাণ করেন যেখানে ভক্তরা বসবাস করেন অথবা গ্রন্থ রচনা করতে পারেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব গ্রন্থ পড়ে কৃষ্ণভাবনা লাভ করতে পারে। এভাবে তিনি স্মরণীয় ও উপকারি উভয়ই হতে পারেন। অবশ্য বদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভক্তদের কর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বদ্ধ ভক্তের আত্মা অন্যত্র চলে গিয়ে নতুনভাবে কার্য আরম্ভ করে। প্রকৃতির কর্মচক্রের নিয়মবশত সে যদি পূর্বজন্মে কোনো ভালো কর্ম করে, তবে সে সুফল ভোগ করবে।

অবশ্য মহান আচার্যদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবনারূপ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সুকৃতি জমানোর প্রয়োজন হয় না। কারণ, তারা আসলে নিত্যমুক্ত। আমরা সেসব মহাত্মার জন্ম মৃত্যুর চক্র পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস শ্রবণ করি, কিন্তু মাঝে মাঝে তারা তীরের কাছাকাছি গিয়ে নৌকা পরিত্যাগ করেন শুধু আমাদের জন্য, যেন আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি। তাদের নির্দেশনাই তাদের নৌকা। যদিও তারা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন, আমরা তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করি। তিনি যাই করুন না কেন, তার মাধ্যমে তিনি নিজে এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ই উপকৃত হবেন। এটা বৈষ্ণব কৃপার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, জীবন একদিন শেষ হবেই, আমরা জানি না তা কখন হবে। কিন্তু 'কল্পান্ত স্থায়িনো গুণাঃ' যদি আপনি কৃষ্ণভাবনাময় হন, তবে আপনার পারমার্থিক গুণাবলি চিরন্তন থাকবে।"[৪] এভাবেই এই সংক্ষিপ্ত মানবজন্মকে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের কাজে লাগানো যেতে পারে। এটাই অন্তিম লক্ষ, এর মাধ্যমেই সজ্জনগণের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং তিনি নিজেও চিজ্জগতে কৃষ্ণসেবার পরমানন্দ লাভ করবেন।

এ শ্লোক থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, এ জগতে শ্রীল প্রভুপাদের যশ ও মহিমা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য ভক্তদের সাহায্য করা উচিত। এক অর্থে, আমরা বলতে পারি যে, শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা আমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই আমরা যাই করি না কেন তার মহিমা অক্ষুণ্ন থাকবে।

একবার ভারতে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রশংসাসূচক একটি নিবন্ধ পড়েছিলাম। বিষয়বস্তুর শেষে লেখক লিখেছিলেন, "যাই হোক ভবিষ্যতে কী হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।" শ্রীল প্রভুপাদ তখন আমাদের বলেছিলেন, এ থেকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। লেখক আমাদের 'ভগবানের দেয়া সংকেত' দিচ্ছেন। আমি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করলাম লেখকের সন্দেহ এই যে, শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণ শেষ পর্যন্ত তার সাথে থাকবে কিনা। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তার সকল শিষ্যও যদি চলে যায়, তবু তার গ্রন্থসমূহই নতুন ভক্ত নিয়ে আসবে।

গ্রন্থ বিতরণই তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম যার মাধ্যমে জনগণ ভবিষ্যতেও শ্রীল প্রভুপাদকে জানতে পারবে। এর মাধ্যমে আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা শুধু আমাদের বিশ্বস্ত হওয়ার উপরই নির্ভর করে না। তার গ্রন্থগুলো এতো শক্তিশালী যে, তা-ই নতুন নতুন ভক্ত তৈরি করতে পারে।

আমি আরও উপলব্ধি করেছিলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের যশ শুধু শিষ্যদের কার্যাবলির উপরই নির্ভর করে এমন নয়। তবুও, শিষ্যদের এ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। আমাদের সুপুত্র হওয়া উচিত, যাতে আমরা সম্পূর্ণ বনকে সুগন্ধে ভরিয়ে দিতে পারি।

আমাদের কর্মের কারণে ইস্‌কনের যশ নষ্ট হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চিরবিখ্যাত। জনগণ সর্বদা তার সংকীর্তন আন্দোলন এবং তার শিক্ষা পেয়ে উপকৃত হবে। কিন্তু সহজিয়াদের বিভিন্ন অপব্যাখ্যার জন্য, তার অপ্রকট হওয়ার কয়েক শত বছর পর জনগণ সংকীর্তন আন্দোলনকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত না। সাধারণ মানুষ ভাবত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন অবৈধ যৌন তৃপ্তির একটি সস্তা অজুহাত। পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও অন্যান্য মহাজন আবির্ভূত হয়ে এই আন্দোলনটির পুনর্জাগরণ করেছিলেন। বিভিন্নরকম অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত অনুসারীদের কারণে প্রকৃত পারমার্থিক আন্দোলনও আচ্ছাদিত হয়ে যেতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের যশ ও মহিমা সর্বদা অক্ষত থাকবে, কিন্তু কপট ও ভ্রান্ত মত প্রচারের মাধ্যমে তা আবৃত হয়ে যেতে পারে।

১ প্রবচন, বোস্টন, মে ৮, ১৯৬৮।

২ ভা ৪.১২.৫২।

৩ ভা ২.১.১২।

৪ প্রবচন, সানফ্রান্সিসকো, মার্চ ৮, ১৯৬৭।

শ্লোক ৩১

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চযত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥

ধনিকঃ– ধনী ব্যক্তি বা মহাজন; ***শ্রোত্রিয়ঃ***– বিদ্বান ব্রাহ্মণ; ***রাজা***– রাজা বা ভালো প্রশাসন; ***নদী***– নদী; ***বৈদ্যঃ***– চিকিৎসক; ***তু***– কিন্তু; ***পঞ্চমঃ***– পঞ্চম; ***পঞ্চ***– এই পাঁচ; ***যত্র***– যেখানে; ***ন***– না; ***বিদ্যন্তে***– থাকেন; ***ন***– না; ***তত্র***– সেখানে; ***দিবসং***– একদিন; ***বসেৎ***– বাস করা।

অনুবাদ

যে স্থানে মহাজন, বিদ্বান ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও চিকিৎসক নেই, সে স্থানে একদিনও অবস্থান করতে নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এ শ্লোকের উল্লেখ করে তার লেখনী ও প্রবচনে শুধু নদী, বন্ধু, বিগ্রহ ও ধামের ওপর মনোনিবেশ করেছিলেন। আধুনিক সমাজে মানুষ সুবিধার জন্য বড় বড় শহর গড়ার পক্ষে কথা বলে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যে কথাটি এখানে উল্লেখ করেছেন, তা কখনই ভেবে দেখে না। "শহর বলতে বড় বড় কসাইখানা, সিনেমা হল, বেশ্যালয়, কারখানা প্রভৃতি নোংরা স্থানকে বোঝায় না। এখানে এসবের কথা বলা হয়নি। কুন্তিদেবী বলেছিলেন, '*ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধা সুপক্কৌষধিবীরুধঃ*।' তিনি কখনই বলেননি, "এসব শহর ও নগরগুলো অগণিত কারখানা, কসাইখানা, বেশ্যালয়, সিনেমা হল, নাইট ক্লাব গড়ে ওঠার কারণেই বিকশিত হচ্ছে।" না। তখনকার দিনে এসব ছিলই না। সমগ্র বিশ্বকে নারকীয় করার জন্যই এসব আধুনিক বিষয়ের আবিষ্কার।"[১]

নদীর জড়-জাগতিক ও পারমার্থিক গুরুত্বের কথা শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি বর্তমান বিশ্বের নদীগুলোকে কীভাবে দূষিত হতে দেখেছেন, তাও বলতেন। "তারা পরিচ্ছন্ন থাকতে পারবে না, কারণ তাদের নোংরা কাজসহ মিল, কলকারখানার মতো বিভিন্ন বর্জ্যসৃষ্টিকারী বিষয় আছে। কলকাতাতেও নদীর পাশে অনেক পাটকল ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে। সকল আবর্জনা-মলমূত্র গঙ্গায় ফেলা হয়। কিন্তু গঙ্গা এতই শক্তিশালী যে তারপরও পরিষ্কার থাকে। শত শত লোক গঙ্গায় স্নান করে। তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।"[২] শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের প্রশান্তিময় গ্রাম্যজীবনের প্রশংসা করতেন। যেখানে মানুষ নদীর তীরে বাস করে, তাতে স্নান করে পবিত্র বলে বিবেচনা করে। এ নদী পরিবহনপথ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

গত কয়েক বছরে গঙ্গা এবং যমুনায় স্নান করার নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। ভক্তরা প্রায়ই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে– পারমার্থিক উন্নতির জন্য গঙ্গায় স্নান করা উচিত,

নাকি স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন কারণে স্নান না করা ভালো। বিজ্ঞানী ও পরিবেশবাদীরাই বিতর্ক বৃষ্টি করছেন। তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি নদী এতই নোংরা হয়ে থাকে যে তাতে স্নান করা যাবে না, তবে তাদেরই সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। প্রত্যেককেই আন্তরিকতার সাথে এটা গ্রহণ করা উচিত যে, পবিত্র নদীকে পাটকলসহ বিভিন্ন কলকারখানার দ্বারা দূষিত হতে দেওয়া যাবে না।

এমনকি আমরা একটি প্রতিবেদনে শুনেছি যে, সরকার নদীর পাশে কারখানা নির্মাণ করছে ধর্মকে নিরুৎসাহিত করার জন্যই। একথা সত্যি কি না জানি না, কিন্তু নাস্তিক ও ইহবাদীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই পবিত্র নদীসমূহ নষ্ট করছে, এ কথা বললে খুব বিস্ময়কর কিছু বলা হবে না। বৈদিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তারা কিছু কাজ করছে। তবে যে পরিমাণ ময়লা ও দূষিত পদার্থ নদীগুলোতে ফেলা হচ্ছে, সে তুলনায় এ প্রচেষ্টা নিতান্তই নগণ্য।

ভক্তদের বিশ্বাস আছে যে, যতই কলুষিত করা হোক না কেন, নদী তার পারমার্থিক সত্তা বজায় রাখে। নিয়মিত নদীতে স্নান করা বিশ্বাসের ব্যাপার। একে প্রসাদের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যথার্থ বিশ্বাস না রেখে স্নান করলে বা প্রসাদ গ্রহণ করলে আমরা অসুস্থ হয়ে যেতেই পারি। যদি কোনো ভক্ত নদীতে স্নান করতে অস্বস্তি বোধ করে, তবে তার উচিত নদীর জল মাথায় স্পর্শ করে সম্মান জানানো। যারা অধিক সাহসি, তারা তাতে স্নান করবে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবে।

ভারতীয় প্রথানুসারে, যদি কেউ তীর্থভ্রমণ করতে যায়, তবে তারা নদী সন্নিহিত মন্দিরে যায়। ভারতের প্রায় সকল তীর্থই গঙ্গা, যমুনা এবং অন্যান্য পবিত্র নদীর তীরে অবস্থিত। যদি কেউ তার মানবজীবন সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে তিনি পবিত্র নদীর পাশে বসবাসকারী পারমার্থিক সঙ্গীদের সাথে দেখা করতে যেতে পারেন এবং তাদের সাথে পারমার্থিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু অভক্তদের সাথে মেলামেশা ও ঘৃণ্য স্থানগুলো দর্শন করা অনুচিত।

কৃষ্ণভাবনার প্রচারকেরা বিশ্বের যেকোনো স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করতে পারেন, এমনকি যদি নদী অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়নি এমন নগরও থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গ্রামাঞ্চলের আদর্শ স্থানগুলোর চেয়েও বম্বের মতো বড় বড় শহরে শিষ্যদের প্রচারে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন। ভক্তরা দয়াপরবশ হয়ে সেসব আকর্ষণহীন স্থানে বসবাস করেন। তিনি আপামর জনসাধারণের পারমার্থিক চাহিদা মেটাতে চান। তাই তিনি জনাকীর্ণ শহুরে জীবনকেও কৃষ্ণভাবনা প্রচারের অনুকূল মনে করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি যমুনা নদীর তীরে তার ব্রজবাসী বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বৃন্দাবনের রাধাদামোদর মন্দির পরিত্যাগ করেছিলেন। একাই আমেরিকা গিয়েছিলেন, যেখানে নদী,

নগরজীবন এবং লোকজন সবাই কলুষিত ছিল। তার এ দয়ার দৃষ্টান্তের জন্যই আমরা এখন জীবনের উচ্চতর মূল্য অনুভব করতে পারছি, মন্দিরে বসবাস করতে চাচ্ছি, পবিত্র নদীর সুবিধা পাচ্ছি এবং জানতে পারছি কৃষ্ণভাবনাময় বন্ধুই আমাদের প্রকৃত বন্ধু।

নদীগুলো পবিত্র কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর অবতারগণ সেসব স্থানে লীলা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালক ও গোপীদের নিয়ে যমুনার তীরে খেলা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গা ও ভারতের অন্যান্য পবিত্র নদীতে লীলাবিলাস করেছিলেন। এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ভক্তরা কি পাশ্চাত্যের যেকোনো নদীতে গিয়ে পারমার্থিক অনুভূতি লাভ করতে পারেন? ইস্‌কনের কার্যাবলিতে বিশেষ ভূমিকা আছে যে নদীগুলোর, তা কি তীর্থ বলে গণ্য হতে পারে? উদাহরণস্বরূপ, গীতানগরীর নিকটে তুসকারোরা নদীর তীরটি ভক্তদের অনেকেরই ধ্যানের স্থান এবং এ থেকে গাভীসমূহের জল সরবরাহ করা হয়। এ স্থানকে পবিত্র বিবেচনা করা কি ভাবপ্রবণতা?

শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যের ইস্‌কন মন্দির ও খামারগুলোকে ধামে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মন্দিরগুলোকে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান অনুসারে নাম প্রদানের অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কিছু নাম প্রদান করেছিলেন। এখন আমাদের অসংখ্য হ্রদ এবং পুকুর রয়েছে পাশ্চাত্যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডও আছে। অনেক পাহাড়কে গোবর্ধন বলা হয়। এসব ধামের নামকরণ স্থানগুলোকে চিন্ময়করণেরই একটি অংশ। আর এখানে যেসব কাজ-কর্ম করা হয় সবই কৃষ্ণভাবনাময়। তা ধামেরই অংশ।

তবুও, আমরা তুসকারোরাকে যমুনা নদীর তুল্য ভাবতে পারি না, যেখানে কৃষ্ণ পদচরণা করেছিলেন, অসংখ্য লীলা সম্পাদন করেছিলেন এবং হাজার বছর ধরে ভক্তরা ভজন করেছিলেন। আমরা আশাবাদী, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আরও হাজার হাজার বছর ধরে চলবে। তখন ভক্তরা হয়তো তুসকারোরা নদীর তীরে হাজার হাজার বছর ধরে ভজন করে সে স্থানকে আরো পবিত্র করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, নববৃন্দাবন বৃন্দাবন ধামের মতোই উত্তম। তারপর তিনি বলেছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে এ তো উত্তম, কারণ এখানে কোনো মায়াবাদী নেই।"

পাশ্চাত্যের এ স্থানগুলো চিন্ময়ধামে রূপান্তরিত হওয়ার অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত হয় এবং অনেক ভক্ত একত্রিত হয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করেন, সেই স্থানগুলো অনেক শক্তিশালী হতে পারে।

১ প্রবচন, মায়াপুর, অক্টোবর ২০, ১৯৭৪।
২ প্রবচন, মায়াপুর, অক্টোবর ২০, ১৯৭৪।

শ্লোক ৩২

দরিদ্র দোষো গুণ-রাশি-নাশি

দরিদ্রদোষঃ – দরিদ্রতার দোষ; ***গুণরাশি*** – কারোর সদ্‌গুণাবলি; ***নাশি*** – ধ্বংসকারী।

অনুবাদ

অনেক ভালো গুণ থাকলেও দারিদ্র্য সমস্ত গুণই নষ্ট করে দেয়।

তাৎপর্য

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, কারও দারিদ্র্যেকে দোষ হিসেবে দেখা জাগতিক বিচার। একটি আমেরিকান প্রবাদ আছে, "আপনি যদি এতোই বিচক্ষণ হয়ে থাকেন, তবে আপনি ধনী নন কেন?" এটি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, অর্থই সবার কামনার বস্তু এবং যার অর্থ আছে সে-ই সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। কৃষ্ণভাবনা প্রচারেও অর্থ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, গরীব লোকের কথা কেউ শোনে না। তিনি বলতেন, যদি তিনি বিজ্ঞাপন দিতেন, এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী একটি গাছের নিচে বসে প্রবচন দিতে যাচ্ছেন, তাহলে অনেকেই আসতো না। সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সুরম্য মন্দির নির্মাণ করেছেন, বিশেষ করে ভারতে। যেখানে জনগণ এসে সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ জানতেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীদের খারাপ ধারণা রয়েছে যে– ভারতীয়রা ভিক্ষুক স্বভাবের এবং জনগণ সবাই দারিদ্র্যপীড়িত। তাই তিনি ভারতের পারামর্থিক চেতনার সাথে পাশ্চাত্যের জাগতিক সুযোগ-সুবিধার সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। "আমেরিকায় প্রচুর সম্পদ রয়েছে। কিন্তু পারমার্থিকভাবে গরীব। ভারতে বৈদিক সাহিত্য এবং সাধুসুলভ জীবন ও সংস্কৃতি রয়েছে, পারমার্থিক দৃষ্টি রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৈদেশিক আক্রমণে দেশটি দরিদ্র হয়ে গেছে। এ দুটি দেশকে অন্ধ ও পঙ্গু লোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে দুজনই প্রতিবন্ধী। কিন্তু পঙ্গু লোক অন্ধ লোকের কাঁধে উঠে তাদের সামর্থ্য বিনিময় করতে পারে। ভারতবর্ষের পারমার্থিক জ্ঞান ও আমেরিকার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা যেতে পারে।"[১]

দারিদ্র্য প্রায়শই চেতনাকে অধোগামী করে তোলে এবং চুরি করাসহ বিভিন্ন পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে। এটা প্রত্যেককে জড় অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। যাই হোক, মাঝে মাঝে দরিদ্র্য লোকেরা জড় প্রাচুর্য ও সম্পদ থেকে নিজেকে নিরাসক্তও করতে পারে এবং ভগবানের প্রতি অধিক নির্ভরশীল করে। দারিদ্র্য

হলো সম্পদের বিপরীত, এর ফলে গরীব ব্যক্তি চুরি করার জন্য ধাবিত হয়, অন্যদিকে ধনী ব্যক্তি অধিক সম্পদের লোভে অন্যকে প্রতারণা করে।

নারদমুনি তার সামনে নলকুবের ও মণিগ্রীবকে নির্লজ্জভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে দারিদ্র্যকেই ভক্তির অনুকূল বলে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেছিলেন যে, ধনীরাই সাধারণত নেশা, যৌনতা ও জুয়াখেলার প্রতি আসক্ত হয়। তারা এতটাই নির্দয় হয় যে, তাদের জন্য কসাইখানায় প্রাণিহত্যা হয়ে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ ধনী ও গরীবের মাঝে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ তুলে ধরেন: ধনী ব্যক্তি তার দেহ ও পাপকর্মের দ্বারা পরিচিত হয়। অন্যদিকে দরিদ্র ব্যক্তি অন্যের স্থানে নিজেকে দেখতে পারে। সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, অন্যকে কষ্ট দিলে সে ব্যথা অনুভব করবে।

যে মানুষের শরীরে কাঁটা বিদ্ধ হয়েছে, সে চায় না অন্য কেউ কাঁটাবিদ্ধ হোক। দারিদ্র্যগ্রস্ত বিচক্ষণ মানুষ চায় না যে, অন্য কেউ সেই অবস্থায় পতিত হোক। সাধারণত দেখা যায়, যেসব মানুষ দরিদ্র জীবন থেকে বিত্তবান হয়েছেন, তারা সাধারণত শেষ জীবনে নানারকম দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কৃপাপরায়ণ দরিদ্র লোকেরাই অপরের সুখ-দুঃখে সহানুভূতিশীল হতে পারে। দারিদ্র্যগ্রস্ত মানুষেরা সাধারণত অহঙ্কারে মদমত্ত হয় না এবং তারা সব রকম আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবানের কৃপায় যা লাভ হয়, তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে।[২]

নারদমুনি আরও বলেন যে, দারিদ্র্যগ্রস্ত থাকা এক ধরনের তপস্যা। তাই বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণেরা দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবন বরণ করে নিতেন, যাতে জড় ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে মত্ত না হতে হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করতে না পারায় তাদের ইন্দ্রিয়গুলো সংযত থাকে, তাই তারা হিংসাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হয় না।

একজন দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণ ঘর থাকে। সাধু-মহাত্মারা অনায়াসে সেখানে যেতে পারেন এবং তাদের ওপর কৃপা বর্ষণ করতে পারেন। ধনীব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। আমরা পাশ্চাত্যে দেখি 'কুকুর থেকে সাবধান' অথবা 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' বাড়ির সামনে এ ধরনের বিভিন্ন লেখা থাকে। ধনী ব্যক্তিরা সাধারণত সাধু ব্যক্তিদের দেখতে চাঁয় না।

আমরা খ্রিস্টানদের সন্ন্যাস আশ্রমগুলো দেখেছি, তারা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। অ্যাসিসি'র সেন্ট ফ্রান্সিস দরিদ্রদের পূজা করতেন এবং দারিদ্র্য ও দানের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রণয়ন করতেন।

আমরা বিত্তশালীই হই অথবা দরিদ্রই হই, ভক্তিমূলক জীবনযাপনের মাধ্যমে আমরা যেকোনো অবস্থাকেই পারমার্থিকতায় রূপান্তর করতে পারি এবং অভক্ত দরিদ্রদের অভাব ও সীমাবদ্ধতার প্রতি সংবেদনশীল হতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজের জীবন থেকে দরিদ্র ও বিত্তশালী জীবনের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন পকেটে মাত্র আট ডলারের সমতুল্য অর্থ নিয়ে। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপি হরেকৃষ্ণ আন্দোলন প্রচারের আচার্য হিসেবে অনেক সম্পদ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি সবসময়ই বিনয়ী ও বিশুদ্ধ থাকতেন এবং কীভাবে কৃষ্ণভাবনা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে জোর দিতেন। কারোর জাগতিক অবস্থার অপেক্ষা না করেই প্রচার করতেন। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতকে সকলের জন্য সুলভ করেছিলেন।

কৃষ্ণভাবনা আন্দোলনের ভক্তদের দারিদ্র্য অথবা বিত্ত নিয়ে অভিভূত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং শ্রীল প্রভুপাদের মতো যেকোনো পরিস্থিতিতেই সরল ও শুদ্ধ জীবনযাপন করলেই ভালো হয়। একবার একজন মন্দিরাধ্যক্ষ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে এসে মন্দির নির্মাণের জন্য বড় দালান কেনার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তিনি প্রভুপাদকে বুঝিয়েছিলেন, কীভাবে জমি বন্দক দিয়ে টাকা নিয়ে দালানটি ক্রয় করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ পরিকল্পনা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মন্দিরাধক্ষ্যকে বলেছিলেন যেন, 'বাড়তি ঝামেলা' ক্রয় না করে।

কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হওয়ার মানে এই নয় যে, আমাদের অনেক টাকা ও সুযোগ-সুবিধা আসবে। কৃষ্ণভাবনা প্রচারের জন্য কৃষ্ণ আমাদের প্রচুর অর্থ নাও দিতে পারেন। তাই আমাদের যা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েই আমরা সর্বোত্তম চেষ্টা করতে পারি। কোন অপরাধের ফলে আমরা দরিদ্র হয়েছি, সেটা বিবেচ্য নয়।

জনগণ আমাদের মন্দিরে পারমার্থিক নির্দেশনার জন্য আসে। যদি ভক্তদের প্রধান লক্ষ্য টাকা অর্জনের ওপর হয়, তবে সেটা প্রচারে প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক মন্দির সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু এ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সম্পদ অথবা দারিদ্র্য যাই দেওয়া হোক না কেন, ভক্তরা সবকিছু গ্রহণ করেন এবং নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের চেষ্টা করেন। যখন অর্থ আসে, তখন আমাদের তা সর্তকতার সাথে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত।

একজন ভক্ত হিসেবে সম্পদের প্রতি আমাদের পারমার্থিক দৃষ্টি রাখা উচিত, তেমনি দারিদ্র্যের কষাঘাতে পথচ্যুত হওয়া চলবে না। উন্মত্ততাবশত সম্পদ ও জড় প্রাচুর্যকে এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের যুক্তবৈরাগ্যের নীতি শিখিয়েছেন। বৈষ্ণবতার ইতিহাসে সাধুদের জড়প্রাচুর্য বা সম্পদ ত্যাগ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তখন নিয়ম ছিল: বৈরাগীরা যেকোনো ধরনের সেলাই করা কাপড় পরবেন না,

মোটরচালিত যানবাহনে চড়বেন না, সাগর পাড়ি দেবেন না। তারা হাতের তালুতে যা ধরে, তা খেয়েই তৃপ্ত থাকবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সামনে বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি জাগতিক প্রাচুর্যকে প্রচারে ব্যবহার করার মাধ্যমে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। উল্লিখিত নিয়মগুলো শুদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে আমরা সেসব সুযোগসুবিধা গ্রহণ করার পরেও বিশুদ্ধ থাকতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ তার নিজ গুরুদেবের কাছ থেকে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন যে, সবচেয়ে উত্তম বস্তুগুলো ভক্তদেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। অভক্তরা কেন তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করবে আর ভক্তরা কুঁড়েঘরে থেকে কৃষ্ণের পূজা করবে। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মোটরগাড়িতে চড়তেন এবং প্রিন্টিং প্রেসগুলো ব্যবহার করতেন। ভক্তদের উচিত শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করা এবং তিনি যতটুকু নির্ধারণ করে গেছেন সেটুকু সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করা।

যদি কোনো ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে সরল জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে সব ঠিক আছে। কিংবা কোনো ভক্তগোষ্ঠী যদি দারিদ্র্য বরণ করে নিতে চায়, তবে তারা নিতে পারে। তারা বলতে পারে না যে, সবাইকে তা অনুসরণ করতে হবে অথবা তারা শ্রীল প্রভুপাদের বড় বড় মন্দিরের বিপক্ষে যেতে পারে না। সরল জীবনই যথার্থ এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : যখন যমুনা দাসী ও অন্য মাতাজিরা একটি মাতাজিগোষ্ঠী গঠন করতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ যমুনা দাসীকে সরল জীবন গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাদের সামঞ্জস্যহীন কিছু করতে মানা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, লোকজনকে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা প্রাচুর্য দেখাতে পারি, কিন্তু ভক্ত সরল জীবন যাপন ও উচ্চচিন্তা করতেই পছন্দ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই আমাদের বিপরীত বিবৃতি দিতেন। তিনি বলেছিলেন, ভক্তদের সবকিছুই থাকা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদের এই বিবৃতি আমাদের একটা ভক্তগোষ্ঠীর চিত্র প্রদর্শন করায় যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যদের সাথে অবস্থান করে সুখী ছিলেন এবং তাদের সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে থাকতে শিখিয়েছিলেন। যেমন– কৃষ্ণের জন্য ১০৮টি গোলাপের ঝোপ, একটি পরিষ্কার ঝকঝকে মন্দির, একটি ঝাড়বাতি এবং একজন প্রকৃত নেতা। তিনি বলেছিলেন, এ অবস্থায় ভক্তদের সবকিছু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করা যাবে এবং তখন ভক্তরা জড় প্রাচুর্যের দ্বারা কলুষিত হবে না।

তিনি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, মানুষ কেন এটা মেনে নিতে পারে না যে তারা কতটুকু ঐশ্বর্য ভোগ করবে সেটা তাদের কর্মের দ্বারা নির্ধারিত। লোকেরা

তাদের প্রচেষ্টায় গরিব অথবা ধনী হয় না, হয় অতীতের ভালো ও খারাপ কর্মের জন্য। তারা মনে করে এটা অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদী দর্শন। তারা মনে করে এর ফলে মানুষ কর্মবিমুখ ও অনুন্নত হয়। তারা এ ধরনের অদৃষ্টবাদী মনোভাবের ভিত্তিতে ভারতের দারিদ্র্যকে দোষারোপ করে। অবশ্য ভারতবর্ষ পারমার্থিকভাবে দরিদ্র নয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, তাদের দারিদ্র্যের কারণ বৈদিক সংস্কৃতি ত্যাগ করার ফলে ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত এক প্রকার শাস্তি। বৈদিক সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে কারণ, অনেক বিদেশী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, জয় করেছে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির দ্বারা শাসন করেছে। এ জন্য ভারতবর্ষ তার প্রাচুর্য হারিয়েছে এবং দ্রুতই পারমার্থিক সম্পদও হারাচ্ছে। কৃষ্ণভাবনার দর্শন অদৃষ্টবাদের শিক্ষা দেয় না। এটা জড় প্রাচুর্যের বিপরীতে পারমার্থিক সম্পদের দিকে আলোকপাত করে এবং জনগণকে উৎসাহিত করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আর ভ্রমণ না করে চিরায়ত জীবনলাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে।

১ কক্ষে আলোচনা, হায়দ্রাবাদ, আগস্ট ১৯, ১৯৭৬।
২ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যায় ১০।

শ্লোক ৩৩

পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চঃ ॥

পুত্রান–পুত্রগণ; ***চ***–এবং; ***শিষ্যান***–শিষ্যগণ; ***চ***–এবং।

অনুবাদ

পিতার (গুরুর) সম্পত্তির ওপর পুত্র ও শিষ্য উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ দু'ধরনের পরম্পরা (যথা : শৌক্র ও শ্রৌত) বোঝাতে গিয়ে এই শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। "পূর্বে দু'ধরনের পরম্পরা ছিল। একটিকে বলা হতো শৌক্র এবং অন্যটি শ্রৌত। শৌক্র মানে জন্মের মাধ্যমে উত্তরাধিকার বা বংশপরম্পরা, যেমন পিতা-পুত্র। আর শিষ্যের জন্ম হয় বৈদিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে। শ্রৌত মানে শ্রবণ করার মাধ্যমে। ভারতে এখনও অনেক গোত্র রয়েছে। গোত্রের জন্ম হয়েছে মহান মহান ঋষিদের কাছ থেকে। যেমন আমাদের পরিবার গৌতম গোত্রীয়, অর্থাৎ গৌতম ঋষি থেকে আগত। তেমনি গুরু-পরম্পরাও একটি গোত্র। পুত্র আর ছাত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। চাণক্য পণ্ডিত বলেন, '*পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চঃ।*' তাদের একই ভাবা হয়। পুত্র হোক, আর শিষ্যই হোক উভয়ে সমান অধিকার প্রাপ্ত হবে। ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে তার কয়েকজন পুত্রকে এ জ্ঞান দান করেছিলেন, পরে তার শিষ্যদের। বৈদিক জ্ঞান বিতরণের এটিই পন্থা।"[১]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রীল প্রভুপাদ শৌক্র পরম্পরার চেয়েও পারমার্থিক পরম্পরাকে উঁচুতে স্থান দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, তথাকথিত নিত্যানন্দ বংশধরেরা পারমার্থিক পরম্পরার অন্তর্গত নয়। কেউ বলতে পারে না যে, সে জন্মসূত্রে আপনাআপনি পিতার পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছে। পারমার্থিক জ্ঞান জন্মগত অধিকার নয় কিংবা জাত-গোস্বামী হওয়ার ব্যাপার নয়। গুরুপরম্পরা পিতাপুত্রের ব্যাপার নয়, বরং গুরুদেব ও শিষ্যের সম্পর্ক এবং তা দীক্ষা ও শিক্ষার বিষয়। কেউ যদি তার জন্মগত অধিকার দাবি করতে চায়, তবে তাকে সেই মহাত্মার কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে হবে এবং তার নির্দেশে সাধনভক্তি অনুশীলন করতে হবে। তবেই সে পরম্পরার পারমার্থিক সন্তান হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারবে।

যখন বর্ণাশ্রম প্রথা অক্ষুণ্ন থাকে এবং সমগ্র সমাজ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন শৌক্র পরম্পরা ও গুরুপরম্পরা সমতুল্য হয়। পিতা ও মাতা গুরু হিসেবে

সন্তানদের শিক্ষা দেবেন, যদি কারও তেমন আলোকিত পিতামাতা পাওয়ার সৌভাগ্য না হয়ে থাকে, তবে সদ্‌গুরুর সন্ধান করা কর্তব্য। এমনকি সচেতন পিতামাতারও একই কর্তব্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজির নিকট প্রেরণ করেছিলেন। পিতা শুদ্ধভক্ত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করেছিলেন। আমিও শ্রীল প্রভুপাদকে প্রথম দর্শনের পর ক্রমান্বয়ে তাকে আমার প্রকৃত পিতা হিসেবে দর্শন করতে শুরু করি। এ সম্পর্কের বিষয়ে আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিরন্তন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছি। গুরুদেবই প্রকৃত পিতা, জন্মদাতা পিতা ক্ষণস্থায়ী।" শ্রীল প্রভুপাদ এও বলতেন যে, তার শিষ্যরাই তার প্রকৃত সন্তান এবং তার শিষ্যরা তাঁকে নিজের পুত্রদের চেয়েও ভালোভাবে সেবা করছে।

জড়বাদীদের কাছে 'জন্মগত অধিকার' বলতে পিতার সম্পত্তির অধিকারকে বোঝায়। শিষ্যরা গুরুদেবের কাছ থেকে এ ধরনের সম্পত্তি লাভের অভিলাষী নন। বরং তারা গুরুদেবের একান্ত ইচ্ছের বোঝা গ্রহণ করে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ তার গুরু মহারাজকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?" এটাই হলো জড় ও পারমার্থিক পিতা-পুত্রের মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য। আদর্শগতভাবে, উভয় সম্পর্ক পারমার্থিক বলে বিবেচিত হতে পারে। পুত্র ও শিষ্য উভয়ই পারমার্থিকভাবে পিতার কৃপা লাভ করার ক্ষেত্রে সমভাবে উপযোগী হতে পারে।

একজন ভক্তের পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের সাথেও সম্পর্ক রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যিনি তাকে স্মরণ করেন এবং ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেন, তিনি মুক্তি লাভের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।[২] প্রত্যেক জীবেরই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই শ্লোকটি আমাদের এ অধিকার লাভের উপায় বলে দেয়। 'দায়-ভাক্' শব্দের অর্থ হলো উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার লাভ করা। তাই যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অনুগত থাকেন এবং কোনো প্রকার অসন্তোষ ছাড়াই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা চালিয়ে যান, তিনি এমনিএমনি ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার লাভ করেন। আমরা আমাদের পিতা বা গুরুর কাছ থেকে যে অধিকার লাভ করতে পারি এবং পিতা বা গুরুর কাছে আমাদের যা প্রদান করা উচিত, তার ভিত্তিতেই আমরা উপযুক্ত হয়ে পূর্ণ উত্তরাধিকারীত্বের দাবি করতে পারি, এ শ্লোক সেই আদর্শই স্থাপন করে। অন্যথায়, পিতা বা গুরুর পুত্র অথবা শিষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

১ প্রবচন, লস্ অ্যাঞ্জেলেস্, জুলাই ৮, ১৯৭১।
২ ভা: ১০/১৪/৮।

শ্লোক ৩৪

অরি–প্রযত্নাম অভিসমীক্ষতে

অরি– শত্রু; ***প্রযত্নাম–*** প্রযত্ন সহকারে; ***অভিসমীক্ষতে–*** সতর্কভাবে দর্শন করে।

অনুবাদ

শত্রুর প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করবেন না। তাকে সর্বদা বিপজ্জনক মনে করুন।

তাৎপর্য

ভক্তরা সংখ্যায় পৃথিবীতে অল্প হলেও কৃষ্ণভাবনার বিরুদ্ধাচারী আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ভক্তদের কাছে বিপজ্জনক। কংসের আসুরিক কর্মে সহায়তাকারীরা তাকে সতর্ক করেছিল। যখন কংসের হৃদয়ে পরিবর্তন এসেছিল এবং সে তার ভগিনী দেবকী ও বসুদেবকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তখন কংসের সহযোগীরা হতাশ হয়েছিল। তারা কংসকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, ভক্তদের বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তারা কংসকে বলেছিল যে, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্রের মতো দেবতাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, কেননা ভগবান বিষ্ণুও সকল জীবের হৃদয়ে লুকিয়ে থেকে তাদের পরিকল্পনায় বাধা দিতে পারবেন না।

তাই তোমায় এই সকল দেবতাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তবুও তাদের উপেক্ষা করা ঠিক হবে না, কেননা তারা আমাদের চিরশত্রু। আত্মরক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। দেবতাদের অস্তিত্ব সমূলে উৎপাটিত করার জন্য আমাদের সবসময় আপনার সেবায় প্রস্তুত থাকতে হবে এবং আমরা সর্বদাই আপনার আদেশের জন্য প্রস্তুত থাকব।

দেহের তুচ্ছ কোনো রোগও যদি অবহেলা করা হয়, তা দুরারোগ্য হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনই, কেউ যদি তার ইন্দ্রিয় দমন করার ব্যাপারে সচেতন না হয়; তাদের ইচ্ছেমতো পরিচালিত হতে দেয়, তবে তাদের সংযত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই দেবতাদের সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে, নতুবা তারা একদিন দুর্দমনীয় হয়ে উঠবে।[১]

কিছু কিছু ভক্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এলেও নির্ভীক থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তারা যেন কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার অব্যাহত রাখে এবং শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ যখন দশম স্কন্ধের অনুবাদ ও ভাষ্য লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন পশ্চিমা বিশ্বে সংস্কৃতিবিরোধী আন্দোলন এবং ভারতেও কতিপয় ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের দ্বারা বোম্বে মন্দির নির্মাণে বাধা সৃষ্টি হয়।

এমনকি শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেবকী ও বাসুদেবের ওপর কংসের নির্যাতনের ভাষ্য রচনা করছিলেন, তখন তিনি নিজের আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিজেকে বসুদেবের সাথে তুলনা করছিলেন যিনি কংসের ভয়ে ভীত ছিলেন, কারণ যদি সে তার নবাগত কৃষ্ণকে বধ করে।

কংস যে বসুদেব ও দেবকীর সুন্দর শিশুকে হত্যা করবে, তা যেমন আশা করা যায়নি, তেমনই আধুনিক সমাজও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতিতে অসুখী হওয়া সত্ত্বেও বাধা দিতে পারবে না। তবুও আমাদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও হত্যা করা যায় না, তবুও শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব স্নেহবশত ভয়ে কম্পিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, কংস এক্ষুনি এসে তার পুত্রকে হত্যা করবে। তেমনই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদিও শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং কোনো অসুরই এতে বাধা দিতে পারে না, তবুও অসুরেরা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে এই আন্দোলনকে বন্ধ করে দিতে পারে বলে মনে করে আমরা ভীত হই।[২]

শ্রীল প্রভুপাদের ভীতি জড়-জাগতিক ভীতির মতো ছিল না, বরং তা ছিল কৃষ্ণকে সুরক্ষা করতে গিয়ে বসুদেবের পিতৃসুলভ দিব্যানন্দপ্রসূত উদ্বেগ। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বলেছিলেন যে, সৃষ্টির শুরু থেকেই দেবতা আর অসুরেরা পরস্পরের বিরোধী ছিল। ভক্তেরা কাউকেই শত্রুরূপে দেখেন না, "কিন্তু অসুরেরা বৈষ্ণবদের নিরন্তর কষ্ট দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করত, কেননা তারা চায় না, বৈষ্ণবতার প্রচার হোক।"[৩]

আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ পিতার মতো ইস্‌কনকে নিয়ে ভীত হয়েছিলেন। এটি ২৬নং সেকেন্ড এভিনিউতে ঘটেছিল, ডন নামের এক ছেলে মন্দিরে ঘুমাত। তখনও তার দীক্ষা হয়নি এবং কিছুদিন পর সে মন্দিরে আসা বন্ধ করে দেয়।

তারপর একদিন সে তার পকেটে মারিজুয়ানা মাদক নিয়ে আসে। এসে ভক্তদের সে এ সম্বন্ধে বলছিল। এক নবীন ভক্ত যে কখনো মারিজুয়ানা গ্রহণ করেনি, সে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল যে, ডন নিচের সিঁড়িতে মারিজুয়ানা নিয়ে এসেছে। সেই ভক্তযুবক আরও বলল যে, ডন গর্গমুনির সাথে তর্ক করছে, গর্গমুনির মুখে আঘাত করেছে। প্রভুপাদ সবকিছু শুনে বললেন যে, তিনিও ডনের মুখে আঘাত করবেন। প্রভুপাদ তখন ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। তিনি তার পুত্রকে (পারমার্থিক) ঐ লোকের আঘাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের চক্র থেকে উদীয়মান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, আমরা যেন ডনকে মন্দিরে প্রবেশ করতে না দিই। শ্রীল প্রভুপাদ

এতটাই উদার ছিলেন যে, তিনি একজন ভবঘুরেকেও মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতেন। কিন্তু মারিজুয়ানা ও হিংস্রতাপূর্ণ আচরণের জন্য ডনকে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিপক্ষকে দমনে খুব শক্তিশালী ছিলেন, কারণ তিনি সবসময় কৃষ্ণকে স্মরণ করতেন। ভক্তরা স্বভাবতই উগ্র অসুর ও অসুরিক কার্যাবলির দ্বারা সন্ত্রস্ত হন, কিন্তু এই উদ্বেগ যেন কখনো আমাদের চেতনায় প্রবেশ করে কৃষ্ণের স্থান দখল না করে। ভগবান নৃসিংহদেবকে প্রার্থনা করতে বিভিন্ন দেবতা তার সামনে এসেছিলেন। এক দল দেবতা বলেন যে, হির্‌ন্যকশিপুর প্রভাবে তারা শ্রীবিষ্ণুর পরিবর্তে হিরণ্যকশিপুর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। "এখন আপনি তাকে হত্যা করেছেন এবং আমাদের মন আপনি পুনরায় অধিকার করে নিতে পারেন।" কিন্তু আমাদের মনকে এভাবে মগ্ন হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা একজন শত্রুর ক্ষমতা অনুধাবন করে বিপদকে উপলব্ধি করতে পারি। তবে পুনরায় কৃষ্ণমুখী হওয়া উচিত। মৃত্যুর সময় আমাদের অবশ্যই কৃষ্ণের পরিবর্তে শত্রুকে নিয়ে ভাবা উচিত হবে না।

ভক্তরা সাধারণ শত্রুদেরও সম্মুখীন হতে পারেন। মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে যে, সর্বাধিক একীভূত শক্তি সবার সাধারণ শত্রু বলে পরিগণিত। বিভিন্ন রকমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা ভক্তদের একত্রিত করতে পারে। আমরা দেখতে পাই, সংস্কৃতিবিরোধী আন্দোলন যখন আরও সক্রিয়ভাবে আমাদের আন্দোলনকে আক্রমণ করেছিল। তখন ভক্তরা উপলব্ধি করেছিল যে, তারা একই গুরুদেবের সন্তান, তাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

যদি কাল ও মৃত্যুরূপী শত্রুর ব্যাপারে আমরা সচেতন হই, তবে পরস্পরকে শত্রু হিসেবে দেখা থেকে বিরত হতে পারব। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, শত্রু ও মিত্রের মধ্যে আমাদের ভেদ দর্শন করা অনুচিত। যদি কোনো ভক্ত অপর একজন ভক্তকে শত্রু হিসেবে দেখে, তবে তা আমাদের প্রচারকেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে। আমরা একই পরিবারের সদস্য। ভক্ত হওয়া এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের ব্যাপারে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে, তবে তা (কোনোটিই খারাপ নয়) কোনো বিরোধিতার জন্ম দেবে না। শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, কোনো দেশে অনেক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে, কিন্তু সবার লক্ষ্য এক, আর তা হলো দেশের উন্নয়ন। ইস্‌কনে যখন রাজনীতি প্রকট আকার ধারণ করবে, তা এরঅনেক ক্ষতি সাধন করবে। তার মানে এই নয় যে, তারা তাদের শত্রু গুরুভ্রাতাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সেনাপতির ন্যায় শুদ্ধভক্তের সব প্রতিশ্রুতিসহ কৃষ্ণের সুরক্ষার ব্যাপারে সজাগ আমাদের মতো ভক্তদের শ্রীল প্রভুপাদ অনুপ্রাণিত করেছেন : "কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্রাহ্মণ-সভ্যতা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে। কিন্তু বিশেষভাবে তা যখন পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রচার করা হচ্ছে, তখন অসুরেরা নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

১ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যায় ৪।
২ ভা: ১০/৩/২২ তাৎপর্য।
৩ ভা: ১০/৪/৪২ তাৎপর্য।
৪ ভা: ১০/৪/৪১ তাৎপর্য।

ক্ষম-রূপং তপস্বীনম্॥

ক্ষম– ক্ষমার দ্বারা; ***রূপম্–*** এই রূপে; ***তপস্বীনম্–*** তপস্বাকারীদের।

অনুবাদ

তপস্বীর তপস্যার শক্তি নিহিত তার ক্ষমা করার সামর্থ্যের মধ্যে।

তাৎপর্য

ক্ষমা ব্রাহ্মণের সম্পদ। প্রচারক হিসেবে যে কৃষ্ণভাবনা প্রচারের প্রতি অকৃতজ্ঞ, প্রত্যাখ্যানকারী অথবা বিরোধী, তাকেও ভক্তদের অবশ্যই ক্ষমা করা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ যিশুখ্রিস্ট, হরিদাস ঠাকুর এবং নিত্যানন্দ প্রভু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু তবুও তারা ধৈর্যশীল ছিলেন, কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল পতিত জীবদের মুক্ত করা। সাধুর গুণ হলো তিনি সকল পতিত জীবের প্রতি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কৃপালু।[১]

এ শ্লোকে চাণক্য পণ্ডিত দুটি শব্দ– ক্ষমা ও তপস্যাকে সমন্বিত করেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করা সহজ কাজ নয়। জড়জাগতিক প্রবণতা হলো পাল্টা আঘাত করা, 'চোখের বদলে চোখ' এবং 'দাঁতের বদলে দাঁত'। একজন শুদ্ধ আত্মার হৃদয়ে প্রতিশোধের কোনো স্থান নেই। যদি তিনি ক্রুদ্ধও হন, তবুও তিনি ক্ষমা করবেন। নারদমুনির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি কুবের পুত্রদের পাপাত্মক কার্য দেখে ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। যদিও নারদমুনি তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, তবুও তিনি তাদের কৃপাই করেছিলেন এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে দর্শন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমরা যদি ক্ষমাশীলতা পরিহার করে তপশ্চর্যার অনুশীলন করি, তাহলে আমাদের তপস্যা আমাদেরকে আরও কঠোর করবে। সে কারণেই, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তপস্যা হলো ক্ষমা এবং ধৈর্য্যশীল মনোভাব নিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিষ্ণু, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।"[২]

একজন ভক্তের নিকট ক্ষমার ভিন্ন তাৎপর্য থাকতে পারে। এর অর্থ হতে পারে, যে আমাদের অপরের অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে ক্ষমা করা। এও হতে পারে যে, আমাদের নিজেদেরও ক্ষমা করা। একজন ভক্ত যদি অন্যকে ক্ষমা করতে পারেন, তবে কেন নিজেকে ক্ষমা

করতে পারবেন না? আমরা এ পৃথিবীতে আমাদের নিজেদেরই বেশি সাহায্য করতে পারি। অন্যদের ক্ষমা করার মাধ্যমে আমরা তাদের পুনরায় কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে পারি। আর নিজেদের ক্ষমা করে আমরাও ঠিক একই সুযোগ নিজেদের মধ্যে বৃদ্ধি করতে পারি।

যাই হোক, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সর্বদাই ক্ষমা করা উচিত কিনা। ক্ষমা তো মহৎ গুণ। কিন্তু তা তো বিচারের পরিপূরক নয়। কেউ ভুল করলে তাকে ঘৃণা করা ভক্তের উচিত নয়। ভক্ত যদিও ক্ষমা করে থাকেন, কিন্তু তাকে এমন আচরণ করতে হতে পারে যাতে অপরাধকারী কষ্ট পেতে পারে অথবা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা গুরু ও শাস্ত্রের নির্দেশে সেই ভূমিকা পালন করতে পারি।

ক্ষমা করার আরেকটি অর্থ হলো যারা নিজেদের সংশোধন করে আমাদের সাথে সঙ্গদান করতে চায়, তাদের গ্রহণ করতে আগ্রহী হওয়া। তাই সকলকে ক্ষমা করার মনোভাব এবং প্রশাসনিক বিচার পরস্পরবিরোধী নয়। ক্ষমা করার মানে এই নয় যে, আমরা সকল প্রকার আচরণকেই সমান মনে করব, ভালো-মন্দের মধ্যে ভেদ করব না। এমনকি যদি আমরা দেখি যে, কেউ ভুল করছে এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনও আমরা তাদের সাথে শোভন আচরণ করতে পারি এবং যেই মাত্র সে তার ভুলের জন্য অনুতাপ করবে, তখন আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, পিতা ঠিক সে রকমই। যেইমাত্র তার পুত্র ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়, তখনই তিনি তার পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। পিতা তার পুত্রকে ক্ষমা করে নিজের আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। পুত্র যদি বিদ্রোহী হয়ে উঠে তবে পিতা তাকে ক্ষমার নামে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, সকল অর্থ ও সম্পত্তি পুত্রকে দিয়ে ধ্বংস করতে দিতে পারেন না।

অনুরূপভাবে, অসুরদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রযোজ্য নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন অশ্বত্থামাকে ক্ষমা না করতে, যেহেতু অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচ পুত্রকে বধ করেছিল। অর্জুন তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন আদেশ করেছিলেন। অর্জুনের ন্যায় ভক্তরা ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু যে ভক্তের নিকট অপরাধী কৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেন না। যদিও কৃষ্ণ তখনই ক্ষমা করতে প্রস্তুত হন যখন অপরাধী তার সকল প্রকার খারাপ মনোভাব ত্যাগ করেন।

যখন দুর্বাসা মুনি মহারাজ অম্বরীষের কাছে অপরাধ করেছিলেন, তখন ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বধ করার জন্য তার সুদর্শন চক্র পাঠিয়েছিলেন। দুর্বাসা মুনি যখন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন, মহারাজ অম্বরিষ তখন ধ্যানে

দেখতে পেয়েছিলেন যে দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং তাই তিনি দুর্বাসাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন যেন তিনি সুদর্শন চক্রের আঘাত থেকে রক্ষা পান। দুর্বাসা যখন অবশেষে ভগবান বিষ্ণুর নিকট গেলেন, বিষ্ণু তাকে অম্বরিষ মহারাজের চরণে ক্ষমা চাইতে বললেন। অম্বরীষ মহারাজ এমন ক্ষমাশীল ছিলেন যে দুর্বাসা মুনিকে সুদর্শন চক্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজের পুণ্যফলও তাকে দান করেন। দুর্বাসা মুনি তখন বলেন :

"হে মহারাজ, আজ আমি ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য দর্শন করলাম, যদিও আমি অপরাধ করেছি, তবুও আপনি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যাঁরা শুদ্ধ ভক্তের পতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছেন তাদের পক্ষে অসাধ্য এবং দুস্ত্যজ্য কী আছে? যাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করামাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কী-ই বা অসম্ভব হতে পারে? হে রাজন, আপনি আমার অপরাধ দর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন। তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহিত হলাম।"[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই তার ক্ষমা গুণের প্রদর্শন করতেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পারমার্থিক পিতা (গুরু), কেননা তিনি সর্বদাই তার শিশুসুলভ পুত্র ও কন্যাকে ক্ষমা করতেন। আমার মনে পড়ে, ১৯৭৭ সালে একবার আমি শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করতে ভারতে গিয়েছিলাম, তখন একজন ভক্তের সাথে ভ্রমণ করেছিলাম, যিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাস আশ্রম ও সাধনা ত্যাগ করে শ্রীল প্রভুপাদকে দেখতে ফিরে এসেছিলেন। প্রভুপাদ তার প্রতি কোনো প্রতিশোধমূলক আচরণ প্রদর্শন করেননি। তিনি তাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে আমাদের সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, প্রভুপাদ তাকে বলেন, কেউ সন্ন্যাসী না গৃহস্থ তাতে যায় আসে না, সে আমাদের সাথে থাকবে এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করবে।

অন্য আরেকটি ঘটনার কথা বলি, এক ভক্ত বেশ কয়েক বছর আগে চলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসে প্রভুপাদের সাথে যখন সে সাক্ষাৎ করেছিল তখন প্রভুপাদ তার সাথে বসে তাদের পুরনো স্মৃতিগুলো স্মরণ করেছিলেন। প্রভুপাদ ছিলেন মধুর স্বভাবের এবং সবাইকে সাদরে গ্রহণ করতেন। তাই তার সন্তানরা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল।

১ ভাঃ ৩/২৫/২১ তাৎপর্য।
২ শিক্ষাষ্টকম, শ্লোক-৩।
৩ ভাঃ ৯/৫/১৪-১৭।

শ্লোক ৩৬

ধনানী জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎশ্রেয়ত ।
সৎ নিমিত্তাম বরং ত্যাগ বিনাশে নিয়তে সতি ॥[১]

ধণানী– ধনী; ***জীবিতম–*** অস্তিত্ব; ***চ–*** এবং; ***এব–*** নিশ্চিতভাবে; ***পরার্থে–*** পরম উদ্দেশে; ***প্রজ্ঞান–*** একজন জ্ঞানী ব্যক্তি; ***উৎশ্রেয়ত–*** পরিত্যাগ করা উচিত; ***সৎ–*** নিত্য; ***নিমিত্তাম–*** জন্য; ***বরম–*** উৎকৃষ্ট; ***ত্যাগঃ–*** ত্যাগ করা; ***বিনাশে–*** ধ্বংস; ***নিহ্যতে–***নিযুক্ত হয়; ***সতি–*** তাই।

অনুবাদ

কারও অধিকারে যা আছে তার সবই বরং সৎ উদ্দেশে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশে ব্যয় করা উচিত, কারণ মৃত্যুকালে কেউ তার সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রিশ অধ্যায়ে– ভগবান কপিলদেব "অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা" এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন–

"তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে, সে যে ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাথেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়।"[২] এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন মানুষ অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার পরিবার এবং নিজের ভরণ–পোষণ করে, তখন সেই ধন পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই উপভোগ করে, কিন্তু তাকে একাই নরকে যেতে হয়। তার পরিবারের সদস্যরা পিতার অবৈধ কাজের জন্য কিছুটা প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে পারে, কিন্তু পিতাই বিশেষভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। জড় সুখভোগের ফল হচ্ছে যে, কেউ তার ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে যেতে পারে না, সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়। যে ধন সম্পদ সে উপার্জন করেছিল, তা তাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হয় এবং সে কেবল তার কর্ম ফল সঙ্গে নিয়ে যায়। এই পৃথিবীতেও কোনো মানুষ যদি কাউকে হত্যা করে কিছু ধন সংগ্রহ করে, তার পরিবারের সদস্যরা যদিও সেই পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তবুও তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তিটি হত্যা করে তার পরিবার প্রতিপালন করেছে, তাকেই হত্যাকারীরূপে ফাঁসি দেওয়া হয়। পাপ কর্মের ফল অপ্রত্যক্ষভাবে যে ভোগ করছে, তার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে অপরাধ করেছে সে বেশি দায়ী। মহান জ্ঞানী চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে, তা সব যেন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশে ব্যয় (সৎ) করা হয়, কারণ সে তার সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের অধিকারভুক্ত অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার হল কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জন করার জন্য ব্যবহার।"[৩]

অর্থ উপার্জন বিষয়ে আলোচনা হলে ভক্তরা প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন : কৃষ্ণভাবনামৃতের জন্য আমরা কীভাবে অর্থ ব্যয় করতে পারি? আমাদের উপার্জনের কী পরিমাণ অংশ কৃষ্ণভাবনা প্রসারের জন্য ব্যয় করা উচিত? যিনি তার জীবন এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে চান এবং এ সময় যিনি কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে চান তার জন্য এ প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ পাপকার্যের সাথে যুক্ত থাকতে চায় না।

এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বিস্তৃত এবং বিভিন্নভাবে সমাধান করা সম্ভব। প্রথমত : এ নীতিশাস্ত্রের শ্লোকটিকে আমাদের সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি জড় সম্পদ লাভের জন্য কর্ম করি, মুক্ত হওয়ার অভিলাষ করি, তাহলে নিজেদের মুক্ত করার উপায় খুঁজে পাব। পরম্পরার সাথে যুক্ত গুরুদেবই বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। তাই গৃহস্থ শিষ্যদের কাছে অসম্ভব কিছু দাবি করা উচিত নয়। ভক্তরা এককভাবে তাদের পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপলব্ধি করে উপার্জনের কিছু টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রূপ গোস্বামী যখন রাজকার্য পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আমাদের উপার্জিত অর্থ কীভাবে ব্যয় করতে হবে, তার উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

চিরন্তন উদ্দেশে আমার ত্যাগ স্বীকারের প্রথম অভিজ্ঞতা হয়, যখন শ্রীল প্রভুপাদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। প্রথমত আমি তার কাছ থেকে ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের তিনটি ভাগ কিনেছিলাম। পরে কল্যাণ অফিসে কাজ করে আমি উপার্জনের পুরোটাই কৃষ্ণভাবনার জন্য দিয়ে দেই। এছাড়া পূর্বের সঞ্চয়ের প্রায় ৬০০ ডলারও অনুদান দিয়েছিলাম। আমি যখন প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন ধনী ছিলাম না, কিন্তু আমি শিখেছিলাম কীভাবে আমার অধিকারভুক্ত সব কিছু উৎসর্গ করতে হয়।

আমি শুধু অর্থই উৎসর্গ করিনি, নিউইয়র্ক শহরের জনাকীর্ণ নোংরা স্থান পরিত্যাগ করে কানাডার উপকূলের পাশে কোনো সবুজ দ্বীপে বাস করে লেখালেখি করার জন্য অর্থ ব্যয় করার স্বপ্নও ত্যাগ করেছিলাম। আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তার অর্থ প্রয়োজন। তাই ধীরে ধীরে আমি তাকে আমার অর্থের কিছু অংশ– বিশ ডলার, চল্লিশ ডলার করে দান করতে লাগলাম। অবশেষে আমি আমার বাকি সঞ্চয়– প্রায় চারশত ডলার তাকে দিয়ে দেই। এ বিষয়ে আমি পরে একটি কবিতাও লিখেছিলাম–

"জীবন আমার রক্ষা পেল, নরকের টিকিটখানি হস্তান্তর হলো।"

আমি কীভাবে উপলব্ধি করলাম যে, নরকে যাওয়ার টিকিটগুলো আমি তার কাছে হস্তান্তর করেছি? আমি ইতোমধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে শিখেছি

যে, যদিও আমি আমার সুন্দর স্বপ্নগুলো পূর্ণ করার জন্য অর্থ সঞ্চয় করছি, কিন্তু পরিণতিতে আমাকে সেজন্য আরও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হতে হতো। শ্রীল প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমি আমার অধিকাংশ অর্থই মারিজুয়ানার পেছনে ব্যয় করতাম। আমার দ্বীপের বাগানে মারিজুয়ানা পাওয়া খুব সহজই হতো। সর্বোপরি, তা একটি মারাত্মক জড়-স্থান।

অন্য ভক্তদেরও একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক ভক্ত তার সঙ্গীত জীবনে সাফল্যের প্রায় দ্বার প্রান্তে পৌঁছার পর, অর্থসহ সবকিছু ত্যাগ করে গুরুর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। জড়-সম্পত্তি রাখার মানে হলো, আরও পাপপূর্ণ জীবনে জড়িয়ে পড়া এবং কৃষ্ণভাবনা থেকে দূরে সরে যাওয়া।

তাই, আমরা আমাদের অর্থসমূহ আমাদের গুরুদেবকে দিয়ে পারমার্থিক ব্যাংক হিসাবে সেখানে জমা রেখেছিলাম।

অন্য একটি প্রশ্ন: এ শ্লোকে এও দাবি করে যে, 'অন্যদের হিংসা করার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ' উপভোগ করার ফলে আমরা পাপের দ্বারা কলুষিত হই। যদি কোনো ভক্ত কোনো দাতার কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করে তার পরিবারকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত রাখেন, তবে সে ভক্ত কি ঐ দাতার পাপের প্রতিক্রিয়া ভোগ করবে?

শ্রীল প্রভুপাদ তার কয়েকটি পত্রে লিখেছেন যে, তিনি চান না ভক্তরা সংকীর্তন করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে নিজেদের জীবন নির্বাহ করুক। আমি একটি দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করছি– এক ভক্ত এমন এক শহরে বাস করত যেখানে কোনো মন্দির ছিল না। সে বাইরে গিয়ে অনুদান সংগ্রহ করত এবং সেই অর্থ দিয়ে নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করত। অনুদান সংগ্রহ করা অবশ্যই কর্তৃপক্ষের কাজ। কিছু কিছু দেশে ইস্‌কন দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে; আমাদের তহবিল সংগ্রহের কাজ সরকারের নজরে রয়েছে, আর কেবল পারমার্থিক উদ্দেশেই আমাদের অনুদান সংগ্রহ করা উচিত।

সরকারের নজরদারি ছাড়াও অনুদান সংগ্রহের সময় আমাদের সকল প্রকার অসৎ কর্ম করা থেকে দূরে থাকতে হবে। গুরু এবং কৃষ্ণের সেবার জন্যই কেবল অনুদান সংগ্রহ করা উচিত। তার মধ্যে শত ভাগ গুরুদেবের প্রচারকার্যে ব্যবহার করা উচিত। অবশ্যই, ভক্তরা তাদের ভরনপোষণের জন্য প্রয়োজন হলে অনুদান সংগ্রহ করতে পারে তবে তাকে অবশ্যই এ বিষয়ে খোলাখুলি বলতে হবে যে, সে কেন অনুদান চাইছে। যদি কেউ সহানুভূতিশীল হয়ে তার জীবন নির্বাহের জন্য অর্থ অনুদান করতে চায়, তবে অনুদান গ্রহণ করা ঠিক হবে, কিন্তু মিথ্যা বলা অবশ্যই উচিত নয়। অর্থ যদি ইস্‌কনের জন্য ব্যয় না করা হয়, তবে ইস্‌কনের নামে তা সংগ্রহ করা ঠিক হবে না।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, 'অন্যদের হিংসা করার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ' দ্বারা কপিল মুনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? সব অর্থই কি অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় না?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত থাকে।

"হে কৌন্তেয়! সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করা উচিৎ নয়। যেহেতু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত থাকে।"[৪] ক্ষত্রিয়কে হয়তো হত্যা করতে হতে পারে। বৈশ্যকে হয়তো তার লাভ গোপন করার জন্য মিথ্যা কথা বলতে হতে পারে। ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে প্রাণী উৎসর্গ করতে হতে পারে। শূদ্রকে হয়তো এমন কোনো ব্যক্তির সেবা করতে হতে পারে, যিনি অসৎ কাজে লিপ্ত। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন–

"নিজের বৃত্তিমূলক কর্ম করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত। সেটিই মূল বিষয়। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কোনো বিশেষ কর্ম করা হয়, তখন সেই বিশেষ কর্মের ক্রটিগুলো পবিত্র হয়ে যায়। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে কর্মফল যখন পবিত্র হয়, তখন মানুষ অন্তরে আত্মাকে দর্শন করে এবং সেটিই হচ্ছে আত্মোপলব্ধি।"[৪]

প্রবৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করার ব্যাপারে ভক্তদের সতর্ক হতে হবে। তাদের চূড়ান্তভাবে পাপপূর্ণ পেশা বেছে নেওয়া উচিত নয়। এটাও প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে, তাদের সেই পেশা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকতে পারে, যেখানে তার কর্মকে সে কর্মফলমুক্ত মনে করতে পারে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে কর্পোরেট পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি গোহত্যাসহ আরও বিভিন্ন ধরনের পাপপূর্ণ কাজে সহায়তা করে। ভক্তকে তো শুধু তার কর্তব্যকর্ম করতে হয় এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখার প্রয়াস করতে হয়। তাই যতটা সম্ভব নির্মল ও অনাসক্ত থাকতে হবে। যতটা সম্ভব উগ্র কোনো কর্মে নিয়োজিত না হওয়াই ভালো। সময় ও শক্তি সংরক্ষিত রেখে কৃষ্ণভাবনা ও আত্মোপলব্ধির পন্থাকে ভালোবাসা উচিত।

১ শ্লোকটি যদিও পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে, তবু যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ এখানে একটু ভিন্ন গুরুত্ব নিয়ে সেটি আলোচনা করেছেন, তাই তা পুনরায় উল্লেখ করা হলো।

২ ভা: ৩/৩০/৩১।

৩ ভা: ৩/৩০/৩১ তাৎপর্য।

৪ ভগী: ১৮/৪৮।

শ্লোক ৩৭

কৃত প্রতিকৃতিম কুরাত হিংসিতে প্রতিহিংসিতে
তত্র দোষম ন পশ্যামি যো দুষ্টে দুষ্টম আচরেত ॥

কৃতে– যখন কাজ করা হয়; ***প্রতিকৃতিম–*** দয়া দেখানো; ***কুরাত–*** করা উচিত; ***হিংসিত–*** জবাবে; ***তত্র–*** সেখানে; ***দোষম–*** দোষ; ***ন–*** না; ***পশ্যামি–*** দেখা; ***য–*** যে কেউ; ***দুষ্টে–*** প্রতারকের সাথে ব্যবহারে; ***দুষ্টম–*** প্রতারক; ***আচরেৎ–*** আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

দয়ার জবাব দয়ায়, আক্রমণের জবাব প্রতি আক্রমণের দ্বারা দিলে তাতে কোনো দোষ থাকে না। প্রতারকের সাথে ব্যবহারে প্রতারণার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে।

তাৎপর্য

এ শ্লোকটির শেষের অংশটুকু অধিক জোরালো। ভক্তকে অবশ্যই বোকা বা অসহায় হলে চলবে না এবং অভক্ত বা অতিচালাক অসুরদের কোনো সুযোগও দেওয়া যাবে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি আগ্রহ এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সম্পদ রক্ষা করতে হবে। অসুরেরা যখন প্রচার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন ভক্তকে তার চেয়েও বেশি চটপটে হতে হবে। বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর পরিকল্পনার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন–

হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দিয়েছিলেন– "হে দৈত্যগণ, তোমরা এ বালককে এমনভাবে গুরুকুলে রক্ষা কর, যাতে ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে।[১] আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কখনও কখনও ভক্তদের কর্মীর পোশাক পরতে হয়, কারণ আসুরিক রাজ্যে সকলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বর্তমান যুগের অসুরেরা এ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে একটুও পছন্দ করে না। গৈরিক বসন পরিহিত, তিলক-মালাধারী বৈষ্ণবদের দেখামাত্রই তারা উত্ত্যক্ত হয়। তারা হরেকৃষ্ণ বলে বৈষ্ণবদের উপহাস করে। কখনও কখনও কেউ কেউ অবশ্য নিষ্ঠা সহকারেও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যেহেতু পরম মঙ্গলময় তাই পরিহাস করেই হোক, আর নিষ্ঠা সহকারেই হোক, তা কীর্তন করার ফলে তাদের লাভই হয়। অসুরেরা যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তখন বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, কারণ তার ফলে বোঝা যায় যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের

ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে। হিরণ্যকশিপুর মতো বড় বড় অসুরেরা বৈষ্ণবদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং তারা সর্বদা চেষ্টা করে যাতে বৈষ্ণবেরা তাদের গ্রন্থাবলি বিক্রয় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার না করতে পারে। এভাবে বহুকাল পূর্বে হিরণ্যকশিপু যা করেছিল, আজও তা হচ্ছে। এটিই বৈষয়িক জীবনের ধারা। অসুর বা জড়বাদীরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতি একেবারেই পছন্দ করে না এবং নানাভাবে তারা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তবুও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের এগিয়ে যেতে হবে– বৈষ্ণববেশেই হোক অথবা অন্য বেশে হোক, তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন '*শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ*'– সৎ ব্যক্তিকে যখন শঠের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, তখন তাকেও শঠের মতো আচরণ করতে হয়, প্রতারণা করার জন্য নয়– তার প্রচারকার্য সফল করার জন্য।

চাণক্যের উপদেশসমূহ সৎ ব্যক্তির জন্য। এ শ্লোকটি একজন অপরিণত ভক্ত বা অশুদ্ধ মনোভাবের কোনো ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। নবীন ভক্তরা মনে করতে পারে যে, তারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের নামে খামখেয়ালী করে নিয়ম ভঙ্গ করতে পারবে, কিন্তু এর ফলে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতেরই অপযশ হবে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, 'কৃষ্ণের জন্য প্রতারণা' করার ঘটনাটি বিগত বছরগুলোতে বহুবার অবাঞ্ছিত ফল বয়ে এনেছে।

ভক্তিপথ হল খুরধারের ন্যায়; কেউ যদি সতর্ক না হয় তবে রক্ত ঝরতে পারে। যে নিজেই অশুদ্ধ অথবা অদক্ষ তার পক্ষে এই শ্লোক প্রয়োগ করার পন্থা জানা অসম্ভব। সে কারণেই আমাদের পরিচালনা করার জন্য সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরুদেব সাধু-শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হন।

এই জড় জগতে কীভাবে ভক্তরা আচরণ করবে, প্রভুপাদ তা আমাদের এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, "ধরি মাছ, না ছুই পানি।" অভক্ত চতুরদের চেয়েও কীভাবে বেশি চতুর হতে হবে এবং একইসাথে শুদ্ধতা ও ব্রাহ্মণের গুণগুলো ধরে রাখতে হবে– তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশল। অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা শেখা উচিত।

কৃষ্ণই সবচেয়ে দক্ষ এবং চতুর (চতুরশিরোমণি)। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, "সমস্ত বঞ্চনাকারীর মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া।" প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন :

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে নানা রকম প্রবঞ্চনাকারী আছে। সব রকম প্রবঞ্চনার মধ্যে দ্যূতক্রীড়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, তাই তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পরমেশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কোনো মানুষের থেকেও অনেক বড় প্রবঞ্চক হতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি

কাউকে প্রতারণা করতে চান, তাহলে কেউই তাকে এড়াতে পারেন না। ভগবান সব ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ, এমনকি প্রতারণাতেও।"[২]

তাই যদি কেউ কৃষ্ণ অথবা তার ভক্তকে প্রতারণা করতে চায়, কৃষ্ণ তখন শুধু প্রতারককেই ধরবেন না জবাবে প্রতারকের সাথে প্রতারণাও করবেন। উদাহরণস্বরূপ, ভগবান বুদ্ধ নাস্তিকদের সাথে প্রতারণা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কতটা প্রতারণা করতে পারেন, তা বোঝানোর জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ভগবান বুদ্ধের উদাহরণ দিতে পছন্দ করতেন। ভগবান বুদ্ধ এমন একটি সময়ে আবির্ভুত হয়েছিলেন যখন তথাকথিত বৈদিক অনুসারীরা প্রাণী হত্যায় মত্ত হয়েছিল এবং তারা দাবি করত যে, তারা বেদের বিধান অনুযায়ীই সবকিছু করছে। ভগবান বুদ্ধ নিরীহ প্রাণিদের রক্ষা করতে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি এমন একটি সময়ে এসেছিলেন যখন মানুষ নাস্তিকতার দিকেও ঝুকে যাচ্ছিল। তাই তিনি তাদের বেদ না মেনে তাকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন। তিনি নাস্তিকদের সাথে প্রতারণা করেছিলেন, কেননা তারা ভগবানের পূজা করতে চায়নি।

ভগবানও মোহিনীমূর্তির রূপ ধারণ করে অসুরদের প্রতারণা করেছিলেন। তিনি এতই সুন্দরী ছিলেন যে, অসুরদের অমৃত থেকেও বঞ্চিত করতে পেরেছিলেন। এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যারা মনে করে যে তারা কৃষ্ণকে প্রতারণা করেছে, তাদের পরাভূত করার জন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করতে পারি।

[১] ভা. ৭.৫.৭

[২].ভ.গী. ১০.৩৬

অর্নি আখ্যাবত।

অনুবাদ

যিনি গৃহত্যাগ করেন না এবং অঋণী, তিনিই সুখী।

তাৎপর্য

যে কেউ শুনতে উৎসুক হবে কীভাবে গৃহত্যাগ না করে সুখী হওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ভারত ও আমেরিকার যাত্রীদের দুর্দশার কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন। বলতেন, এই অস্বাভাবিক অবস্থা কলিযুগের লক্ষণ। প্রভুপাদ একটি প্রবচনে নিউইর্য়কবাসীদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, সেখানে কর্মস্থলে কিংবা বিদ্যালয়ে যেতে হলে প্রথমে ট্রেনে, তারপর নৌকায় এবং তারপর পাতালপথে যেতে হয়। এ বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে স্ট্যাটেন থেকে ম্যানহ্যাটন ও ব্রুকলি পর্যন্ত বহু বছরের আমার প্রতিদিনের ভ্রমনকেই প্রকাশ করে। সেই দিনগুলোতে এ কাজ করা আমাদের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, বিশেষ করে যদি আমরা উপশহরে বাস করতে চাই এবং একইসাথে একটি স্বনামধন্য স্কুলে যেতে চাই কিংবা একটি মর্যাদাসম্পন্ন চাকরি করতে চাই। স্বনামধন্য সবকিছুই শহরে অবস্থিত। কিন্তু যখন আমরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করি, ভ্রমণ করা যে কতটা মানসিক চাপের, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শহরে ঢুকে বের হতে দিনের চার ঘন্টা সময় লেগে যায়। কিন্তু এর কি বাস্তবিকই প্রয়োজন আছে?

চাণক্য পণ্ডিত ঈঙ্গিত করেছেন যে, সুখ মানে হলো গৃহে অবস্থান করে অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো মেটানো। বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করাই হলো আদর্শ পন্থা। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন বৈদিক পল্লীতে কৃষিকাজ করে খাদ্য উৎপাদন করা হয়। ভারতের পল্লী জীবন এখনও বৈদিক জীবনেরই প্রতিফলন বলে মনে হয়। কৃষকসহ আরও অনেকেই আছে যারা গ্রামেই ব্যবসা করে এবং গ্রামেই তাদের পেশা। পশ্চিমারা, বিশেষ করে আমেরিকানরা "গতিশীলতার" প্রতি এতটাই আকৃষ্ট যে ভুলবশত এই "গতিশীলতাকে" স্বাধীনতা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গতিশীলতা হলো অস্থিরতারই নামান্তর মাত্র। তারা মনে করে যে, নিরন্তর গতিশীল না থাকলে তারা নিস্ক্রিয় হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও, তারা ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, কিংবা ফ্লোরিডাতে সুখ খুঁজে পায় না। তারা অনেক ভ্রমণ করে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য ধরা দেয় না। ঠিক একটি গাধার মতো। গাধার সামনে লাঠিতে গাজর (মুলা) ঝুলানো থাকে, কিন্তু সে কখনই তা ধরতে পারে না।

আমেরিকানরা গৃহত্যাগ করে কর্মস্থলে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, গৃহের প্রতি তারা প্রায়ই আকৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ আমেরিকান একটি আদর্শগত ধারণা পোষণ করে যে, তারা গৃহে অবস্থান করার জন্যই অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। কিছু পরিবারের সদস্য চায় যে, তাদের শিশুরা যেন বিপজ্জনক শহরেই বেড়ে ওঠে। তাই যাতায়াতের সময় তারা মনে করে যে, পরিবারের জন্য তারা তাদের শ্রম ও সময় উৎসর্গ করছে। শহরের বাসস্থান এবং জীবনযাত্রার মান যোগান দিতে গিয়ে পিতা ও মাতা উভয়কেই কর্মস্থলে যেতে হয়। এর ফলে সন্তানেরা শৈশবকাল থেকেই বেতনভুক্ত পালকের দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করে বড় হতে থাকে। এভাবে পরিবারের সদস্যদের ঘনিষ্ঠতা ভেঙ্গে যায়। সেসব কাজ সম্পন্ন করার পর ফিরে আসার গৃহটি কোথায়? সুতরাং মানুষ এত মোহের মধ্যে থাকে যে, তারা ভাবতে বাধ্য হয়– তাদের অবশ্যই প্রতিদিন বহুদূর পর্যন্ত যাতায়াত করে কিছু অর্জন করতে হবে।

প্রচারকগণও ভ্রমণ করেন, কিন্তু তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের কাছে প্রচারের নানা সুবিধা দর্শন করে উজ্জীবিত হন। শ্রীল প্রভুপাদই হলেন প্রথম বৈষ্ণব, যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। একজন সংবাদপত্রের মুখপাত্র তাকে "জেট এইজ পরিব্রাজকাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তার নিজের সুবিধার জন্য বৃন্দাবনেই থাকতে পারতেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি কৃষ্ণভাবনা প্রসারের জন্য বিপদ ও হয়রানিমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি প্রচার না করি, তবে ভ্রমণই সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য বাধা হয়ে দাড়াবে।

যখন আপনি কোনো গাড়ীতে উঠেন, তখন পুরোপুরি উদ্বিগ্ন থাকেন এই ভেবে যে, যেকোনো মূহুর্তে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তা মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। যদি আপনি পুরোপুরি উদ্বিগ্ন থাকেন, হতে পারে তা বিমান, কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে আপনি মারা যেতে পারেন। বিমানে ওঠার সাথে সাথে উদ্বিগ্ন হতে হয়, কেননা যেকোনো মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? উদ্বেগমুক্ত হওয়াই প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, যিনি গৃহত্যাগ করেন না এবং যিনি অঋণী, তিনিই সুখী, "বর্তমানে মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হয় এবং প্রত্যেকেই ব্যাংকের কাছে ঋণী থাকতে হয়।"

ভ্রমণ এবং ঋণ গ্রহণকে আধুনিক সভ্যতার সুবিধা বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত তা উড়িয়ে দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তা হলো দুশ্চিন্তার উৎস। "আমেরিকার ব্যাংকগুলো প্রচারণা চালায়, আপনি আমার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে গাড়ি কিনুন, বাড়ি কিনুন, তারপর আপনি যখন

বেতন পাবেন, তখন সে ঋণ পরিশোধ করবেন। দেখুন, ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে আপনি যা ইচ্ছে তাই কিনতে পারবেন। তারপর পুনরায় অর্থশূন্য। শুধু সেই কার্ডটিই অবশিষ্ট থাকলো আর কিছু নয়।”

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ইস্‌কনের এখনও অনেক বাকি। এই কলিযুগে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এ যুগে আমরা ভ্রমণ ও ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা যদি ‘সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার’ নির্যাস গ্রহণ করতে পারি, তবে আমরা ভ্রমণের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে পারব এবং ঋণ গ্রহণ করে ক্রয় করা থেকেও দূরে থাকতে পারব।

আমি এর আগের একটি শ্লোকে উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রভুপাদ মন্দিরের অধ্যক্ষকে কীভাবে উদ্বিগ্নতা ক্রয় না করতে বলেছিলেন। তিনি আরেক মন্দিরের অধ্যক্ষকে বলেছিলেন যে, তিনি তখনও ঋণ পরিশোধ করেননি। “তুমি সেখানে ছিলে কিন্তু দেনা পরিশোধ করতে পারনি। কিন্তু তিনি এসে দেনা পরিশোধ করেছিলেন। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, তিনিই সুখী যিনি গৃহে অবস্থান করেন এবং যার কোনো ঋণ নেই। লন্ডন মন্দির এতটাই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে তা এক লজ্জার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আমি তখনও পর্যন্ত কিছু বলিনি। কিন্তু আমি বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম যখন দেখছিলাম মন্দিরের ঝাড়বাতিটি খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঝাড়বাতিটি ছাড়া মন্দিরটি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমিই শ্যামসুন্দরকে বলেছিলাম এরকম একটি ঝাড়বাতি লাগবে, তাই সে অর্থ ধার করে ঝাড়বাতিটি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু যেহেতু আমরা তা পরিশোধ করতে পারিনি, তাই সেটি খুলে নেওয়া হয়েছিল।”

চাণক্য পণ্ডিতের এ শ্লোকটি পড়ে একজন ভক্ত বলেছিলেন, “আমি নিজেকে অপরাধী বোধ করছি। আমি সুরক্ষিত নই।” তিনি একজন ভ্রাম্যমান বিক্রয় প্রতিনিধি এবং তার আমেরিকান গেমস্ অফ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার প্রবণতা ছিল। এই শ্লোকটির সাহায্যে আমাদের প্রত্যেকেই কিছু উপলব্ধি করতে পারবে। তাই সেই ভক্ত মনে করেছিল, এটি তাকে উপলব্ধি অর্জনে সহায়তা করেছে, নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, “কিন্তু আমি তো এটি শ্রীল প্রভুপাদের জন্য করছি।”

আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হবে যে, তা আমাদের সুখী বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি ঘটাচ্ছে কি না? ভ্রমণ কিংবা ঋণের কোনো প্রয়োজন আছে কি না? এই মুহূর্তে আমাদের সামনে অন্য কোনো উপায় নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং গৃহে অবস্থান করে যতটা সম্ভব হরিনাম জপ করার চেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

আদৌ-মাতা গুরুঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজ-পত্নীকা।
ধেনুর ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তেতা মাতর স্মৃতা ॥

আদৌ– প্রথম; ***মাতা–*** নিজের মা; ***গুরুঃ–*** গুরুর; ***পত্নী–*** স্ত্রী; ***ব্রাহ্মণী–*** ব্রাহ্মণের পত্নী; ***রাজ-পত্নীকা–*** রাজার পত্নী; ***ধেনুঃ–*** গাভী; ***ধাত্রী–*** ধাত্রী মাতা; ***তথা–*** এবং; ***পৃথ্বি–*** পৃথিবী; ***সপ্ত–*** সাত; ***এত–*** এগুলো; ***মাতরঃ–*** মাতাগণ; ***স্মৃতঃ–*** মনে করা হয়।

অনুবাদ

গর্ভধারিণী মা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজপত্নী (রাণী), গাভী, সেবিকা এবং পৃথিবী– এ সাতজন আমাদের মাতা বলে অভিহিত।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ গাভী হত্যার বিরুদ্ধে তার যুক্তির সমর্থনে এ শ্লোকটি ব্যবহার করতেন। এ দিক বিবেচনা করলে নীতিশাস্ত্র বৈদিক সাহিত্যকেই সমর্থন করে। শ্রীমদ্ভাগবতমে ধর্ম বৃষরূপে মূর্ত হয়েছিলেন। পরীক্ষিত মহারাজ গাভীকে অম্বা বা মাতা বলে সম্বোধন করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, গাভীকে এই সম্মান আবেগের বশবর্তী হয়ে দেওয়া হয়নি বরং বাস্তব দর্শনের ভিত্তিতেই তা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে তিনি হরবংশলালজীকে লিখেছিলেন, "ভারতীয়দের জীবন-ধারায় প্রত্যেককেই অপরের কল্যাণ সাধন করার উপদেশ দেওয়া হয়। তবে এর মানে শুধু অপর মানুষের কল্যাণ নয় বরং সকল জীবের কল্যাণ সাধনকেই বোঝায়।" ভারতীয়রা ঠিক গো-উপাসক নয়, যেভাবে অন্যরা ব্যাখ্যা করে থাকে। বরং মানব শিশুকে দুগ্ধ দান করার জন্য ভারতীয়রা গাভীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের হৃদয়ানুভূতি এত উন্নত যে, শুধু দুগ্ধ সরবরাহ করার মাধ্যমে গাভীকে সপ্তমাতার এক মাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ যখন জানতে পারতেন যে, পশ্চিমারা গাভী-সুরক্ষাকে অস্বাভাবিক ও অপ্রাসঙ্গিক হিন্দু মতবাদ মনে করে, তখন তিনি গাভী সুরক্ষার পক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তার যুক্তি উপস্থাপন করতেন। লস্ অ্যাঞ্জেলেসের একটি বাগানে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, "গাভী খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি। তোমরা এর দুধ থেকে অনেক পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পার। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলেও গোহত্যা ঠিক নয়। অন্তত নৈতিক দিকটি বিবেচনা করলেও, তোমাদের গোহত্যা করা উচিত নয়। কেননা তোমরা গাভীর দুগ্ধ পান কর, তাই গাভী তোমাদের মাতা।"[২]

আমি যখন প্রথম শুনলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন গাভী আমাদের মাতা, তা আমার চেতনায় স্পর্শ করেছিল যে, দেহ থেকে যে দুধ দান করে, সেই আমাদের মাতা। তাহলে কীভাবে আমরা আমাদের নিজের মাকে হত্যা করতে পারি? শ্রীল প্রভুপাদ ওয়াশিংটন ডি.সি.তে বৈকালিক দর্শনের সময় অতিথিদের কাছে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন : "সাত ধরনের মা আছেন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে, গাভীও মাতা এবং তুমি পৃথিবী মাতার উপর গাভী মাতাকে বধ করতে পার না। তুমি গাভীর শেষ দুগ্ধবিন্দুটিও নিচ্ছ, তারপর আবার তাকে কসাইখানায় পাঠাচ্ছ। এটি কি খুব ভালো সভ্যতা?"[৩]

শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে স্বদেশীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের পায়ের নিচের ভূমিকে মাতা বলে সম্বোধন করতেন। তারপর তিনি গোহত্যা বন্ধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, "পৃথিবী মানে এই ভূমি। আর স্বদেশীরা এই পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করছেন; আবার তারাই আর এক মাতা ধেনুকে হত্যা করছে। এটি তো শঠতাপূর্ণ সভ্যতা।"[৪]

যদি তারা তাদের মাতার তত্ত্বাবধান করে, তবে সব মাতারই দেখাশোনা করতে হবে। না, তারা কেবল দেশমাতারই চিন্তা করে আর গোমাতাকে হত্যা করে। এটাই শঠতা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে চাঁদকাজীর সাথে তর্ক করেছিলেন, তিনি ষাড়কে পিতা এবং গাভীকে মাতা বলে অভিহিত করেছিলেন।

পিতা-মাতা মারি' খাও— এবা কোন্ ধর্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম ॥ (চৈ.চ.আদি. ১৭/১৫৪)

অনুবাদঃ যেহেতু বৃষ ও গাভী আপনার পিতা ও মাতা, তা হলে তাদের হত্যা করে তাদের মাংস খান কী করে? এটি কোন্ ধর্ম? কার বলে আপনি এই পাপকর্ম করছেন?[৫]

শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে লিখেছেনঃ "আমরা গাভীর দুধ খাই এবং ক্ষেতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার জন্য বৃষ আমাদের সাহায্য করে, সেই কথা সকলেই জানে। তাই, যেহেতু আমাদের পিতা আমাদের খাদ্যশস্য দেন এবং মাতা দুধ দেন যা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি, তাই বৃষ ও গাভী হচ্ছে আমাদের পিতা ও মাতা। কোনো সভ্য সমাজে, কোনো মানুষ তার পিতা-মাতাকে হত্যা করে মাংস খাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।"[৬]

খ্রিস্টানদের প্রতি দশটি আজ্ঞার একটি হলো, "হত্যা করো না"। এর প্রেক্ষিতে তাদের বোঝানো খুবই কঠিন কাজ। এই নির্দেশটি গোহত্যা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। প্যারিসে কার্ডিনাল ড্যানিয়েলের সাথে সাক্ষাতের সময়

প্রভুপাদ বলেন :"বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী সাত ধরনের মাতা রয়েছেন, সেহেতু আপনি আপনার মাকে হত্যা করতে পারেন না, এটা ভালো দর্শন নয়। একে অস্বীকার করতে পারেন না যে, "গাভী মাতা নয়?" কার এত স্পর্ধা আছে? আপনি সকালে গাভীর দুধ পান করছেন। খ্রিস্ট বলেছেন, "হত্যা করো না। সকল প্রকার হত্যা বন্ধ করতে হবে।" বৈদিক সাহিত্য কিছুটা উদার। এটি বলছে না, "তুমি হত্যা করো না।" বরং এটি বলছে, "অন্ততপক্ষে তুমি গাভী হত্যা করো না।" সকল প্রকার হত্যা বন্ধ করা সম্ভব নয়। বেদ সে ব্যাপারে অবগত। কিন্তু অন্তত গোহত্যা করো না। এটাই সভ্যতা এবং এই খ্রিস্টানরা হাজার হাজার কসাইখানা চালাচ্ছে। এটা কি খুব ভালো প্রস্তাব?[৭]

কার্ডিনাল ডানিয়েল বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ... আমি তা জানি, আমি তা জানি। আর এটা বন্ধ করা আমাদের জন্য কঠিন কাজ।"[৮]

চাঁদ কাজীর সাথে আলোচনার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইসলাম ধর্মের এ নীতিকে পিতৃঘাতী ও মাতৃঘাতী বলে প্রতিবাদ করেছিলেন। খ্রিস্টান ধর্ম পর্যবেক্ষণ করে প্রভুপাদ ভাবছিলেন যে, তাদের শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে গোরক্ষাকে সমর্থন করে কিন্তু তবুও খ্রিস্টানরা তা অমান্য করে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একটি তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "খ্রিস্টান ধর্মের একটি প্রধান অনুশাসন হচ্ছে 'তুমি কাউকে হত্যা করবে না।' (Thou shalt not kill)। কিন্তু তবুও, খ্রিস্টানেরা সেই অনুশাসন অমান্য করে। তারা হত্যা করার ব্যাপারে এবং কসাইখানা খোলার ব্যাপারে খুব দক্ষ। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি মুখ্য বিধি হচ্ছে, সব রকম আমিষ আহার বর্জন। গরুর মাংসই হোক, আর পাঠার মাংসই হোক, কৃষ্ণভক্ত কোনো মাংসই আহার করেন না। তবে আমরা বিশেষ করে গরুর মাংস আহার করতে সকলকে নিষেধ করি, কেননা শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, গাভী আমাদের মাতা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুসলমানদের গোহত্যার প্রতিবাদ করেন।" (চৈ.চ.আদি. ১৭/১৫৪)[৯]

গোহত্যায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই এর ফল ভোগ করতে হবে অর্থাৎ, যে হত্যার অনুমোদন দেয়, যে হত্যা করে, যে মাংস বহন করে, যে মাংস বিক্রি করে, যে মাংস রন্ধন করে, যে মাংস পরিবেশন করে এবং যে মাংস আহার করে– প্রত্যেককেই ফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা মাতার (গাভী) যত্ন নিচ্ছে না। সেহেতু তারা পাপী। তাদের অবশ্যই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। মানুষ যখনই পাপচারী হয়ে ওঠে, প্রকৃতিও তৎক্ষণাৎ স্বতই শাস্তি প্রদান করে। তোমরা কেউ এটি অতিক্রম করতে পারবে না।"[১০]

পৃথিবীও যে মাতা বলে গৃহীত হবে, শ্রীল প্রভুপাদ তা ব্যাখ্যা করেছেন। "পৃথিবীকে মাতা বলার কারণ সে আমাদের আশ্রয়সহ খাবার হিসেবে ফল, ফুল, শস্য সবকিছুই দেয়।"[১১]

তিনি আরো বলেন কেন সকলেই তার নিজের জন্মভূমিকে 'মাতৃভূমি' বলে সম্বোধন করেন। ভাষাকে 'মাতৃভাষা' বলা কেন? ধরিত্রী মাতা সকল জীবের জন্মদান করেন এবং তাদের সারা জীবন ধরে পালন করেন।" সেখানে রুটি আছে, কাপড় আছে এবং মাখনও রয়েছে। কিন্তু তা কোথা থেকে আসছে? *'সর্ব-কাম-দুক্ষা মহী'* পৃথিবী থেকে। তাহলে কারখানার পেছনে কেন ছুটছেন? ধরিত্রী মাতা আমাদের সবকিছু প্রদান করেছে, এজন্যই তাকে মাতা বলে সম্বোধন করা হয়।"

যেহেতু অধিকাংশ মানুষ নির্দ্বিধায় অন্ততপক্ষে প্রতীকিভাবে হলেও 'মাতা ধারিত্রী'কে স্বীকার করে নেয়, তাই শ্রীল প্রভুপাদ এই স্বীকৃতিকে ব্যবহার করে পরম পিতার অস্তিত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদ যখন লস্ অ্যাঞ্জেলেসে একজন সাংবাদিকের সাথে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমরা পৃথিবী থেকে এসেছি। তাই ধরিত্রীও মাতা। বিভিন্ন প্রকার পুত্র সন্তান থাকতে পারে। সেটা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু সবকিছুই পৃথিবী থেকে আসছে এবং তাই সবকিছুই তার সন্তান (পুত্র)। তাহলে তাদের পিতা কোথায়? অবশ্যই পিতা আছেন। পিতা ব্যতীত কোনো মায়ের পক্ষে কি সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব?

যেহেতু পৃথিবী মাতা এবং তার সন্তানদেরও অস্তিত্ত্ব রয়েছে, তাই পিতার অস্তিত্ত্বকে সংগত কারণেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। "আমি আমার পিতাকে নাও দেখতে পারি, কিন্তু পিতা অবশ্যই আছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

পিতা নিজেই তার স্বরূপ এভাবে প্রকাশ করছেন: *অহম বীজপ্রদ পিতা* "আমিই বীজ-প্রদানকারী পিতা।" ভগবান রয়েছেন এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের মূর্খতার কারণে মনে করি, ভগবান নেই, পিতাও নেই।"

মাঝে মাঝে আধুনিক যুগের মানুষ অবাক হয়, ভক্তরা যদি পৃথিবীকে মাতা মনে করে তাহলে তারা কেন পৃথিবীকে পূজা করে না বা পরিবেশের যত্ন নেন না?

ভক্তরা পৃথিবীকে পূজা করে না যেমনটি আমরা গাভীকে পূজা করি না, বরং আমরা পৃথিবীকে সম্মান করি এই কারণে যে, আমরা স্মরণ করতে পারি যে পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীর উপর পদচারণা করেছিলেন। তাই পৃথিবীও তার মহান ভক্ত।

তাই, আমরা বায়ু এবং পানি দূষণ করতে চাই না এবং আমরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয় করতে চাই না। আমরা মূলত প্রকৃতিকে কৃষ্ণভাবনামৃতের অংশ হিসাবে সংরক্ষণ করে থাকি। আলাদাভাবে পূজা করতে হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, আমরা যখন ভক্ত হই তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শাকাহারী হই এবং অহিংসা অনুশীলন করি। একে ভিন্ন কোনো কারণ হিসেবে আমাদের গ্রহণ করতে হয় না। অনুরূপভাবে, পৃথিবীকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হিসেবে দেখি। সে আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুরই যোগান দেয়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যে কাজটি আমরা পৃথিবীর জন্য করতে পারি তা হলো– সংকীর্তন যজ্ঞ। শ্রীল প্রভুপাদ যখন টম্পকিন স্কয়ার পার্কে জনসমক্ষে প্রথম হরিনাম সংকীর্তন করেন, একটি সংবাদপত্র খুবই দক্ষতার সাথে শিরোনাম লিখেছিল "এখন পৃথিবী রক্ষা করুন" [Save earth now]| হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে বোমাবাজি, অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষনিধন, বিষাক্ত বর্জের প্রভাব এবং অনিয়ন্ত্রিত তেল উত্তোলন (শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, অনিয়ন্ত্রিত তেল উত্তোলন পৃথিবীর ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারে।) ও পৃথিবীর উপর অসুরদের অত্যাচারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারি। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন প্রণালীর প্রভাবে সব সম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকে বর্ণিত আরও পাঁচ ধরনের মাতাকে বৈদিক সভ্যতা অনুসারে সম্মান করার নির্দেশ দেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মচারীদের গুরুকুলে অবস্থানকালে গুরুপত্নীর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তাহলে যুবক ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সেই মাতাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেওয়া। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

শিষ্য এবং গুরুপত্নীর সম্পর্ক মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। মা কখনও কখনও তার পুত্রের কেশ প্রসাধন করেন, দেহে তেল মর্দন করেন অথবা স্নান করান। তেমনই, গুরুপত্নীও মাতার মতো শিষ্যের লালন-পালন করতে পারেন। কিন্তু গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তাহলে যুবক ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সেই মাতাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেওয়া। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। [ভাগবত - ৭.১২.৮ তাৎপর্য]

ব্রাহ্মণপত্নীও সপ্তমাতার একজন। "জ্ঞানবান পণ্ডিত তোমাদের সম্পর্কে কী হবেন? তিনিও গুরু, কারণ সেই জ্ঞানবান পণ্ডিতের কাছ থেকে তোমরা অনেক কিছু শেখ। তাই সে পিতা এবং তার পত্নী মাতা। *'আদৌ মাতা গুরু পত্নী ব্রাহ্মণী রাজ-পত্নীকা'* রাজপত্নীকা মানে রাণী। তাই রাণীও মাতা, কেননা রাজা হলেন পিতা। তিনি নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করেন।"

ধাত্রী মাও একজন মাতা এবং তাকেও সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদন করেছেন। 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে :

পূতনা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাকে তার বুকের দুধ পান করাবার জন্য স্তন দান করেছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যেহেতু তার ধাত্রী মাতাকে সংহার করতে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি চোখ বন্ধ করে ছিলেন। কিন্তু তার এই ধাত্রীমাতাকে সংহার করা তার গর্ভধারিণী মাতা বা লালন-পালনকারী মাতা যশোদার প্রতি তার ভালোবাসার থেকে ভিন্ন নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং মা যশোদার মতো বাৎসল্যরসে তার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। যশোদার ন্যায় পূতনাকে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি দান করেছিলেন।

চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকে বর্ণিত সপ্তমাতা ছাড়াও শাস্ত্রে আরও অনেক ধরনের মাতার উল্লেখ আছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে তার পিত্রালয়ে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত সকল মাতাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাদের সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন : শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সাত প্রকার মাতা রয়েছেন– ১) প্রকৃত মাতা, ২) গুরু-পত্নী, ৩) ব্রাহ্মণ-পত্নী, ৪) রাজার পত্নী, ৫) গাভী, ৬) ধাত্রী, এবং ৭) পৃথিবী। এরা সকলেই মাতা। শাস্ত্রের এই নির্দেশ অনুসারে, পিতার পত্নী হওয়ার ফলে বিমাতাও মাতারই মতো, কেননা পিতা হচ্ছেন গুরু। ব্রহ্মাণ্ড-পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিমাতার প্রতি কীভাবে আচরণ করতে হয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন আদর্শ পুত্রের ভূমিকায় লীলা বিলাস করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক নারীই মনে করে, যেন প্রত্যেকের স্ত্রীকেই মায়ের মতো দর্শন করা হয়। "প্রত্যেক নারীকেই মাতৃবৎ দর্শন করা উচিত; সে বয়সে ছোট কি বড় তা বিবেচ্য বিষয় নয় এবং এটিই হলো সঠিক পন্থা। ভারতে এখনও অপরিচিত ব্যক্তি কোনো নারীকে 'মাতা' বলে সম্বোধন করেন। প্রথম সম্পর্কই হলো মাতা। এখন তারা 'বোনজি' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছে। তবে না, এটি বৈদিক শিষ্টাচার নয়। নিজের স্ত্রী ব্যতীত সকলকেই মাতা বলে সম্বোধন করতে হবে। এটিই সভ্যতা। আপনি যদি শুরু থেকেই অন্য কোনো নারীর সাথে মাতৃবৎ সম্পর্ক স্থাপন করেন; তাহলে অন্য কোনো সম্পর্কের প্রশ্নই উঠে না। মানুষ যদি নারীকে মায়ের মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে অবাধ যৌনাচার বন্ধ হয়ে যাবে।

শাস্ত্রকেও মাতা বলে অভিহিত করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের বলতেন যে, বেদ হলো মাতা এবং গুরু হলেন পিতা। আমার মনে পড়ে, ১৯৬৬ সালে কৃষ্ণভাবনায় যোগদানের কারণে এক ভক্তকে তার মা পরিত্যাগ করেছিল। সে এ নীতি থেকে সান্ত্বনা পেয়েছিল যে বেদ হচ্ছে তার মাতা। আমার মনে আছে, সে সানন্দে এ কথা বলে বেড়াত যে, "আমার মা আমাকে ত্যাগ করেছে। আমার নতুন মাতা হলো বেদ এবং আমার নতুন পিতা হলো স্বামীজি। এখন তারা আমাকে রক্ষা করবেন।"

দার্শনিকভাবে, আমরা বলতে পারি যে, সমগ্র জড়শক্তি জীবনের মাতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে :

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবান্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ (ভ.গী. ১৪.৪)

অনুবাদঃ হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

সুতরাং পিতা হলেন বীজ প্রদানকারী এবং মাতা দেহ দানকারী। এ কারণেই জড়া প্রকৃতিও আমাদের মাতা। শ্রীল প্রভুপাদ গাভী সুরক্ষা এবং নারীকে যথাযথ সম্মান করার জন্য চাণক্য পণ্ডিতের এই শ্লোক থেকে প্রচারের জন্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

১ পত্র, আগস্ট ২, ১৯৫৮।
২ কথোপকথন, লস এ্যাঞ্জেলস্, জুন ২৪, ১৯৭৫।
৩ প্রবচন, ওয়াশিংটন ডি. সি. জুলাই ৮, ১৯৭৬।
৪ প্রাতভ্রমণ, মায়াপুর, মার্চ৫, ১৯৭৬।
৫ চৈ.চ. আদি ১৭/১৫৪
৬ চৈ.চ. আদি ১৭/১৫৪
৭ কথোপকথন, লস এ্যাঞ্জেলস্, জুন ২৪, ১৯৭৫।
৮ কক্ষে কথোপকথন, প্যারিস, আগস্ট ৯, ১৯৭৩।
৯ চৈ.চ. আদি ১৭/১৫৫
১০ প্রবচন, লন্ডন, জুলাই ২৪, ১৯৭৩।
১১ প্রবচন, হনলুলু, মে ২২, ১৯৬৭।

শ্লোক ৪০

একেনাপি কু-বৃক্ষেণ দাহ্যমানেন বহ্নিনা।
দাহ্যতে তৎ-বনম সর্বং কু-পুত্রেন কুলম্ যথা॥

একেন– একটি মাত্র; ***অপি–*** এমনকি; ***কু-বৃক্ষেণ–*** খারাপ বৃক্ষ; ***দাহ্যমানেন–*** পুড়ে যায়; ***বহ্নিনা–*** অগ্নির দ্বারা; ***দাহ্যতে–*** পুড়ে যায়; ***তদ্বনং-*** যে বনে বৃক্ষটি থাকে; ***সর্বম্-*** সকল; ***কুপুত্রেণ–*** কু পুত্রের দ্বারা; ***কুলম্–*** পরিবার; ***যথা–*** তেমনি।

অনুবাদ

একটিমাত্র বৃক্ষে লাগা আগুনের দ্বারা যেমন সম্পূর্ণ বন ভস্মে পরিণত হতে পারে; তেমনি একজন কুপুত্রের দ্বারাও সম্পূর্ণ পরিবার ধ্বংস হতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তার প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক পরিবার ইস্‌কন পরিচালনার জন্য নির্দেশনা হিসেবে এ ধরনের শ্লোকসমূহ প্রায়ই ব্যবহার করতেন।

"কীভাবে একজন ব্যক্তির দ্বারা একটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠান মহিমান্বিত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে, তা চাণক্য পণ্ডিতের দুটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, বনে যদি একটি সুগন্ধী ফুলের বৃক্ষ থাকে, তা এর সুগন্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ বনকে মহিমান্বিত করতে পারে। ঠিক তেমনি একটি বৃক্ষে যদি আগুন লাগে, তবে তা সম্পূর্ণ বনকে ভস্মে পরিণত করতে পারে। এ উপমাটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চরিত্রবান সন্তান পরিবারকে যেমন গৌরবোজ্জ্বল করতে পারে, তেমনি অসচ্চরিত্রের সন্তান পরিবারের সমস্ত সুনাম ক্ষুণ্ন করতে পারে। অনুরূপভাবে, আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের (ইস্‌কনে) কোনো খারাপ ভক্ত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানকেই ভস্মীভূত করতে পারবে। জি.বি.সি'র দায়িত্ব হলো ইস্‌কনের প্রত্যেক সদস্য প্রতিদিন ষোলোমালা জপ এবং বিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করা। আশা করছি, যতটা সম্ভব ইস্‌কনকে শুদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে জিবিসি সন্ন্যাসীগণ ভ্রমণ কার্যক্রমের (touring programme) মাধ্যমে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবেন।"[১]

শ্রীল প্রভুপাদ এ চিঠিটি এমন এক সময় দিয়েছিলেন যখন তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন একটি অভ্যন্তরীণ কঠিন সময় পার করছিল। সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্কট ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইস্‌কন তার আন্দোলনের পরিশুদ্ধতা বজায় রেখেছে। যাই হোক, প্রভুপাদের বক্তব্যে আমরা দেখতে

পাই যে, সমগ্র প্রতিষ্ঠানে আমাদের প্রত্যেকের কী ভূমিকা থাকা উচিত। প্রত্যেক শিষ্যেরই সর্বদা একজন ভালো পুত্র বা কন্যারূপে আচরণ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কখনও খারাপ হওয়া উচিত নয়। আমাদের অবদান এবং দৃষ্টান্তকে কখনো তুচ্ছ করে দেখা উচিত নয়।

আমাদের এও মনে করা উচিত নয় যে, প্রভুপাদের কোনো ভালো (পারমার্থিকভাবে উন্নত) পুত্র বা কন্যা ছিল না। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন, "নিজের চরকায় তেল দাও।" প্রত্যেক সদস্যের উচিত শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলনকে এমনভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া, যেন তাতে ইস্‌কনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না হয়ে বরং তা বৃদ্ধি পায়।

শ্রীল প্রভুপাদের চিঠিতে আরো লক্ষ করা যায় যে, তিনি নিয়ম-কানুন অনুসরণ এবং প্রতিদিন ষোল মালা জপ করার বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। আমরা যদি আমাদের দীক্ষার মৌলিক প্রতিজ্ঞাগুলো রক্ষা না করি, তাহলে আমরা যে শুধু ভণ্ড বলেই বিবেচিত হব তা নয়, বরং আমরা আমাদের আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে এগিয়ে নিতে পারব না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, জিবিসি এবং পরিব্রাজকাচার্য সন্ন্যাসীদের প্রধান দায়িত্ব হলো ভক্তদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অনুপ্রেরণা যোগানো।

[১] পত্রাবলি, আগস্ট ২৫, ১৯৭০।

শ্লোক ৪১

রূপ যৌবন সম্পন্ন বিশাল কুল-সম্ভবা।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধ এব কিংসুকা ॥

রূপ– সৌন্দর্য; ***যৌবন–*** যৌবন; ***সম্পন্ন–*** সজ্জিত; ***বিশাল-কুল–*** একটি মহৎ পরিবার; ***সম্ভবঃ–*** জন্ম গ্রহণ করে; ***বিদ্যা–*** জ্ঞান; ***হীন–*** শূন্য; ***ন–*** না; ***শোভন্তে–*** ভালো দেখায়; ***নির্গন্ধ–*** গন্ধহীন; ***এব–*** মতো; ***কিংসুকাঃ–*** কিংসুকা গাছের ফুল।

অনুবাদ

রূপ-যৌবনসম্পন্ন উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি জ্ঞানহীন হয়, তাকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয় না, ঠিক যেমন গন্ধহীন হওয়ায় কিংসুকা বৃক্ষের সুন্দর ফুলকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয় না।

তাৎপর্য

নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার গুরুত্বকে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমরা প্রশ্ন করতেই পারি, “শিক্ষার অর্থ কী?” শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বেতে প্রাতঃভ্রমণকালে ড.প্যাটেলসহ আরও কয়েকজনের কাছে সংস্কৃতি এবং শিক্ষার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন :

শ্রীল প্রভুপাদ : চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, “*মাতৃবৎ পর দারেশু*” অর্থাৎ প্রত্যেক নারীকে মাতৃরূপে দর্শন করো। এটি হলো সংস্কৃতি। শিক্ষার আধুনিক সংজ্ঞা অত্যন্ত বাজে, অ আ ক খ শেখা। এটা শিক্ষা নয়। সংস্কৃতি ব্যতিত শিক্ষার কী অর্থ থাকতে পারে?

ড. প্যাটেল : তাহলে, সংস্কৃতিই এসব কিছুর ভিত্তি।

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ, সংস্কৃতিকে সহায়তা করতে শিক্ষা প্রয়োজন। এমন নয় যে, আপনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কুকুরের মতোই থেকে যাবেন। সেটি শিক্ষা নয়। শিক্ষা হলো সেটি, যেমনটি চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন ‘*মাতৃবৎ পর-দারেশু*’... প্রথমেই অপর নারীকে মাতৃরূপে দর্শন করতে শেখা। এখান থেকেই সংস্কৃতি শুরু হয়। কিন্তু তারা স্কুল এবং কলেজ জীবনের শুরু থেকেই মেয়েদের প্রলোভিত করতে শিখে।[১]

একজন সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি তার আচরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তার জ্ঞান নিছক কেতাবী নয়। এমনকি কেবল বৈদিক সাহিত্যের বিদ্যা অর্জন করলেও তাকে সংস্কৃতিবান বলা যাবে না, যদি সে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি: ইন্দ্রিয় দমন, পরিচ্ছন্নতা, তপস্যা, ধার্মিকতা প্রভৃতি অনুসরণ না করে।

মানুষের জীবনে চিন্ময় জ্ঞান এবং সৎ-গুণাবলি উভয়ই একইসাথে থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার লীলার মাধ্যমে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। "'শ্রী' শব্দের অর্থ সুন্দর। তিনি অত্যন্ত সুন্দর। তাই তার নাম কৃষ্ণ। তার সৌন্দর্য্যের কারণেই তিনি সকলকে আকৃষ্ট করেন। কেউ শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে সুন্দর হতে পারে না। ঐশ্বর্যস্য যশস্য শ্রীয়ো এবং জ্ঞান। তিনি শুধু সুন্দরই নন ..... ফুল যেমন সুন্দর হলেও তার সুগন্ধ না থাকলে, তা গুরুত্বহীন হয়ে যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শুধু সুন্দরই নন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীও। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেছিলেন যা এখনও বড় বড় পণ্ডিত, ধার্মিক এবং দার্শনিক অধ্যয়ন করেন। এটিই হলো জ্ঞান।"[২]

শ্রীল প্রভুপাদ জানতেন যে, তার পাশ্চাত্যের শিষ্যদের সংস্কৃতির কোনো প্রশিক্ষন নেই। তিনি তার প্রধান জি.বি.সি ব্যবস্থাপকদের ভারতে গিয়ে সংস্কৃতি শেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমার মনে আছে, আমি তা শুনে একজন গুরুভ্রাতার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। 'সংস্কৃতি' নামে যে একটা কিছু আছে, আমরা উভয়েই তা শুনে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। পাশ্চাতে সংস্কৃতি বলতে নৈতিক আদর্শ বা আচরণ না বুঝিয়ে কলা এবং সঙ্গীতকে উপলব্ধি করাকে বোঝানো হয়। আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, এটি তখনও আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি। কঠোর পরিশ্রম, গ্রন্থ বিতরণ এবং মন্দির পরিচালনা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ (এবং চাণক্য পণ্ডিত) সংস্কৃতি বলতে যা বুঝিয়েছিলেন, তখনও তা আমরা পূর্ণভাবে শিখতে পারিনি।

মাঝে মাঝে ভক্তরা অবাক হতো এই ভেবে যে, ভারতে গিয়ে সংস্কৃতি শিক্ষার কোনো বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে কিনা। তারা মনে করে, ভারতের পারমার্থিকতার মৃত্যু ঘটেছে এবং বৈদিক সংস্কৃতি এখন আর নেই। শ্রীল প্রভুপাদ ভারতকে একটি হাতির সঙ্গে তুলনা করে তাদের জবাব দিয়েছিলেন। হাতির মৃত্যু হলেও এর দাঁত এবং চামড়ার মূল্য অনেক। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চেয়ে পারমার্থিকভাবে মৃত ভারতই শ্রেয়। ভারতে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমেই আমরা কেবল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারি না। প্রকৃতির তিন গুণ এবং কলিযুগ ভারতকে পরাভূত করেছে। তারপরও বৃন্দাবনে, মানুষের আচরণে এবং অধিকাংশ ভারতীয় ধার্মিক পরিবারে সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা অধ্যয়ন এবং আয়ত্ত করেও আমরা সংস্কৃতি শিখতে পারব। শ্রীমদ্ভাগবতসহ অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য উন্নত সংস্কৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ। অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ক্ষত্রিয়ের আইন, ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য এবং বৈদিক আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারব। আমরা মাঝে

মাঝে কেবল বৈদিক সংস্কৃতির বাহ্যিক অলংকার অনুশীলন করতে পারি, কিন্তু প্রকৃত বৈদিক সংস্কৃতি হলো কৃষ্ণভাবনামৃত; হৃদয়কে কোমল ও উৎকৃষ্ট করে মানবিক আদর্শের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার পন্থা। এটা বাহ্যিক নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, *মাতৃবৎ পরদারেশু* – নিজের স্ত্রী ব্যতীত সকল নারীকে মাতৃরূপে দর্শন করা। একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তির আরও অনেক গুণাবলি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সংস্কৃতিবান ব্যক্তি অহিংস হবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের টেবিলের উপর পিঁপড়াকে হত্যা না করে সরিয়ে দিতে দেখে তাদের প্রশংসা করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, "পূর্বে, তোমরা এদের হত্যা করতে, কিন্তু এখন তোমরা পরিশুদ্ধ হয়েছ।"

আরেকটি গুণাবলি : জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব রয়েছে। শৈশবকাল থেকে অথবা পরবর্তীতে যখন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করি তখন থেকে আমাদের পরিচ্ছন্নতা শিখতে হবে। শ্রীবিগ্রহ সেবাও সংস্কৃতির অংশ। অভক্তদের কাছে বিগ্রহসেবা বোধগম্য নয়। অভক্ত বিগ্রহসেবাকে মূর্তিপূজা মনে করে, কিন্তু তা হলো পারমার্থিক সংস্কৃতির অনুশীলন। বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি এর দ্বারা চর্চিত হয়, যেমন- শারীরিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা, সময়নিষ্ঠা এবং স্বার্থহীনতা। পশ্চিমাদের নিকট গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা একেবারেই অজানা। কিন্তু বৈষ্ণবীয় জীবনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা ইস্‌কন ভক্তদের আদর্শ যাচাই করলে অনুভব করতে পারব যে, আমরা অনেক সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করেছি। প্রভুপাদের কৃপাতেই আমরা সংস্কৃতির সেই সকল উপাদন আয়ত্ত করতে পেরেছি।

সংস্কৃতি শেখার আরেকটি উপায় হলো শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সাথে যে রকম আচরণ করেছেন, তার অনুসন্ধান করে দেখা। শ্রীল প্রভুপাদ যা কিছুই করেছেন, তার সবই ছিল সংস্কৃতি। এমনকি তিনি যেভাবে জল পান করতেন সেটিও সংস্কৃতি। শ্রীল প্রভুপাদ এমনই অভিজাত ও অমায়িক ছিলেন। তিনি তার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ অভক্তকেও সম্মান করতেন। ভক্তদের পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতেন। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্মান করতেন। তিনি তার নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করতেন না, বরং একজন ভিক্ষুকের (সন্ন্যাসীর) মতো জীবনযাপন করতেন। ধনী শিষ্যদের কাছ থেকে সুযোগ নিতেন না। সংস্কৃতিবান ভিক্ষু-সন্ন্যাসী এবং শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে বাস করতেন। প্রতিদানে তিনি তাদের কৃষ্ণভাবনামৃত দান করতেন।

পরম সংস্কৃতি হলো চিন্ময়জ্ঞান এবং সর্বদাই কৃষ্ণভাবনামৃতে নিমগ্ন থাকা। শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের অনুপ্রেরণা যোগাতেন, যেন তারা "সংস্কৃতিরূপ অস্ত্র" ব্যবহার করে মানুষের মন জয় করে তাদেরকে সেই সংস্কৃতি গ্রহণ করতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে তিনি কলা, সাহিত্য বলতে সুন্দরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত উপস্থাপন করাকে বুঝিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এমনকি পাশ্চাতের সংস্কৃতিকেও কৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যবহার করতে উৎসুক ছিলেন।

বৈষ্ণবদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নও সংস্কৃতির একটি অংশ। চৈতন্যচরিতামৃতসহ অনেক গ্রন্থে আমরা বহু ভক্তের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যাদের সংস্কৃতি স্পষ্টতই বিধি মার্গের ঊর্ধ্বে ছিল। সেই ভক্তগণ রাগানুগা বা স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির স্তরে ছিলেন। যখন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তগণ জগন্নাথপুরীতে এসেছিলেন, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রাসাদের ছাদ থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তারা প্রথমে মস্তক মুণ্ডিত না করেই মন্দিরে গিয়েছিলেন। উপবাস না করে সোজা মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তার হাত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু ভক্তরা একটি পবিত্র স্থানে ভ্রমণের নিয়ম প্রায় লঙ্ঘন করছিলেন, তাই গোপীনাথ আচার্য রাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই ভক্তরা রাগমার্গের স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং যখন নিজ হাতে তাদের প্রসাদ বিতরণ করছেন, তখন কে আর নিয়মনীতির জন্য অপেক্ষা করে?

তার অর্থ এই নয় যে, এই ভক্তগণ কোনো সংস্কৃতির অনুশীলন করেননি। তারা মহিলাসহ নিজেদের মধ্যে জেষ্ঠ্য, কনিষ্ঠ বা সমতার ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন। সকলেই ছিলেন পরিপক্ক ভক্ত যেহেতু নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেও তারা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসতে পেরেছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত ছিলেন এমন ভক্তের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করে এক স্থানে অবস্থান করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। যখন মহাপ্রভু পুরী থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার ব্রত ভঙ্গ করে মহাপ্রভুকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলেন। মহাপ্রভু তখন বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আমার সাথে থাকার জন্য তুমি তোমার ব্রত ভঙ্গ করছো?" গদাধর পণ্ডিত উত্তরে বলেন, "আমার ব্রত চুলোয় যাক।"

কেউ বলতে পারবে না, যে এই ভক্তগণ সদাচারী নন। তারা ছিলেন উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত; কেননা সকল সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য ভগবৎপ্রেম। একবার ভোরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার বিছানায় বসে ছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাকে প্রসাদ এনে দিলেন। তখন তিনি তার মুখ পর্যন্ত ধৌত করেননি বা সকালের গায়ত্রী মন্ত্রও জপ করেননি। এসব নিয়মভঙ্গ করে প্রসাদ গ্রহণ করতে দেখে মহাপ্রভু তার প্রতি খুশিই হয়েছিলেন। তবে তার অর্থ কি এই যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রতিদিনই বিছানায় বসে প্রাতঃরাশ করতেন? না। কিন্তু মহাপ্রভু যখন প্রসাদ এনে দরজায় কড়া নেড়েছেন তখন কে বলতে পারে যে, "দুঃখিত,

আমি এখনও মুখ প্রক্ষালন করিনি, পরে আসুন?"

আমাদের মতো সাধারণ ভক্তদের কী কথা? আমরা আমাদের সরলতার দ্বারা কৃষ্ণকেও ভালোবাসতে শিখতে পারি। অনেক শ্লোক নাও জানতে পারি অথবা শাস্ত্রজ্ঞানে দক্ষ নাও হতে পারি, কিন্তু কৃষ্ণকে জানতে পারি। মহাপ্রভু মাঝে মাঝে এমন আচরণ করতেন যাতে মনে হতো, তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত নন। যখন গর্বিত বল্লভাচার্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে কৃষ্ণের বিভিন্ন নামের তালিকা শ্রবণ করতে চাইলেন, তখন মহাপ্রভু তাকে বললেন, "আমি কৃষ্ণের নামের বহু অর্থ মানি না, কেবল আমি এই জানি যে, কৃষ্ণনামের দুটি অর্থ হলো শ্যামসুন্দর আর যশোদানন্দন। কৃষ্ণ নামের একমাত্র অর্থ হলো, তিনি তমালের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণের এবং তিনি মা যশোদার পুত্র। এটাই সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। আমি কৃষ্ণনামের এ দুটো অর্থই জানি, শ্যামসুন্দর আর যশোদানন্দন। আর কোনো অর্থ আমি বুঝি না, আর তা বোঝার সামর্থ্যও আমার নেই।"৩ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এ নাম দুটি প্রেমরসের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তিনি নির্দেশ করলেন যে, যে কারো জন্য যা প্রয়োজন তা হলো প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কিছু মধুর নামের অর্থ জানা। তিনি এও নির্দেশ করলেন যে, বল্লভাচার্য তার জ্ঞানের জন্য অহংকারী হয়েছিলেন।

প্রকৃত জ্ঞান হলো শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা এবং তাকে ভালোবাসা। যদি কোনো সরল ভক্ত তা অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদেরকে তার গ্রন্থগুলো পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ এ যুগের লোক স্বভাবতই তর্কপ্রিয় ও নাস্তিক। তাদের পরাস্ত করার জন্য আমাদের অবশ্যই যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তিনি আরো বলেছেন যে, যদি আমরা তার গ্রন্থগুলো নাও পড়তে পারি, তবু যেন শুধু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি।

কেউ সরল হতে পারে, কিন্তু তাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। অন্যথায় সে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করছে না। এমনকি আমরা যদি সারা বিশ্বে একটি ধার্মিক রাষ্ট্রও খুঁজে পাই, তবু দেখবো যে সেটিও কলির দ্বারা পরাভূত হচ্ছে। যে জাতি ধর্মহীন, তা নির্বোধ জাতি ছাড়া আর কী হতে পারে। অজ্ঞ লোকের কাছে আকর্ষণ করার মতো কিছুই থাকতে থাকতে পারে না। অজ্ঞতা বিপজ্জনক। গুরুত্ব আছে বলেই সরলতা অথবা কুটিলতাবর্জিত মনোভাব ভগবৎচেতনার সাথে যুক্ত করতে হবে এবং বৈদিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এর মধ্যেই নিহিত।

১ প্রাতঃভ্রমণ, বোম্বে, ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৫।

২ প্রবচন, নাইরোবি, অক্টোবর ২৭, ১৯৭৫।

৩ চৈ. চ. অন্ত্য ৭/৮৫-৭।

শ্লোক ৪২

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্।
উপদেশো হি মুর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে ॥

পয়ঃপানম্– দুধ পান; ***ভুজঙ্গানাম্***– সাপের; ***কেবলম***– কেবল; ***বিষবর্ধনম***– বিষ বর্ধন করে; ***উপদেশঃ***– উপদেশ; ***হি***– বাস্তবিকই; ***মুর্খানাম***– মূর্খদের; ***প্রকোপায়***– প্রকোপ; ***ন***– না; ***শান্তয়ে***– শান্ত হয়।

অনুবাদ

দুধ পান করার ফলে সাপের শুধু বিষই বৃদ্ধি পায়। তেমনই মূর্খকে সদুপদেশ দান করলে তারা ক্রুদ্ধ হয়। মানসিক প্রশান্তি তারা লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী তার উপদেশামৃত গ্রন্থে উপদেশ দিয়েছেন যে, ভক্তরা অন্য ভক্তের কাছে মনের কথা আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রীতি বিনিময় করবে। শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন, ভক্তদের অবশ্যই নির্বিশেষবাদী বা নাস্তিকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে ভাব বিনিময় করা উচিত নয়। "যদি কোনো সাপকে দুধ-কলা খাওয়ানো হয়, তবে তার বিষই কেবল বৃদ্ধি পায়। তদ্রূপ ঈর্ষাপরায়ণ মায়াবাদী বা কর্মীদের কাছে আমাদের মনের কথা কখনই প্রকাশ করা উচিত নয়। এ ধরনের আলোচনা কোনো সাহায্যে আসবে না। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক। এমনকি গভীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস না করাই উত্তম, কেননা তারা কোনো সদুপদেশ দান করতে পারবে না।"[১]

ভারত ও পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণভাবনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে মানুষের রেগে যাওয়ার অনেক অভিজ্ঞতা শ্রীল প্রভুপাদের রয়েছে। আবার খারাপ লোকের ভক্তে পরিণত হওয়ার মতো ভালো অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে। ১৯৭৪ সালে বৃন্দাবনে শিষ্যদের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "মূর্খ ও অসৎ লোকদের যদি তুমি সুপরামর্শ দাও, তবে তারা তাতে রেগে যাবে। সাঁপকে যদি তুমি দুধ ও কলা খেতে দাও, তবে তাতে তার বিষই বৃদ্ধি পাবে। *'পয়ঃ পান ভুজঙ্গপানাং কেবলং বিষবর্ধণম্।'* কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারাও প্রশিক্ষিত হচ্ছে। এখন তোমরা প্রশিক্ষিত হচ্ছ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশেষত আমেরিকার সংস্কৃতিকে সংশোধন করছ।"[২]

বিষধর সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের পদ্ধতিটি হচ্ছে, তাদের ব্যবহারিক সেবায় নিযুক্ত করা। প্রত্যক্ষ নির্দেশনা তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি করবে। তাই বরং বাস্তব কিছু দাও– "এখানে এসে বসো, প্রসাদ গ্রহণ করো,

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো এবং আমাকে সাহায্য করো। এভাবে তাদের সাথে আমাদের ব্যবহার এমন হবে, ঠিক শিশুদের সাথে যেমন হয়। শিশুরা কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না। কিন্তু তাদের প্রভাবিত করার মতো কোনো না কোনো উপায় বের করাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। সে রেগে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। সে তো মূর্খ...। যদি তুমি সাঁপকে দুধ খেতে দাও তবে তার বিষই বৃদ্ধি পাবে। তাই ব্যবহারিক কিছু দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করতে হয়। সেটাই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন, ব্যবহারিকভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করা।"[৩]

সাঁপের উপমাটি নিছক কল্পনার ব্যাপার নয়। একদিন জেনেভাতে শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন, তখন এক ভদ্রলোক তার কাছে এলে তিনি পাপ ও পুণ্যকর্ম সম্পর্কে তাকে বলতে শুরু করেন, কিন্তু সেই ভদ্রলোক তা না শুনে চলে যান। প্রভুপাদ তখন মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি তুমি কোনো মূর্খকে উপদেশ দাও, তবে সে তৎক্ষণাৎ রেগে যাবে। তখন তিনি সাপের স্বভাব ব্যাখ্যা করলেন। "দুধ সাঁপের অত্যন্ত প্রিয়। মাঝে মাঝে সাঁপুড়েরা দুধ-কলা একত্রে মিশিয়ে তাদের সন্তুষ্টির জন্য খেতে দেয়। কিন্তু এর ফল কী হয়? খাদ্য গ্রহণ করেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ওদের বিষদাঁতগুলো বিষে পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন সু-স্বাস্থ্যের ফলে তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একইভাবে দাঁত সাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দন্তকোটরে মারাত্মক বিষ থাকে, যখন ওরা ছোবল দেয়, তখন বিষ শরীরে প্রবেশ করার ফলে মানুষ বা প্রাণী মারা যায়।"[৪]

কিন্তু কেউ যদি কোনো সাধু বা মহাত্মাকে দুধ প্রদান করে, তাহলে তাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলো বিকশিত হয়, ফলে তারা উচ্চতর পারমার্থিক চিন্তা করতে পারে। "একইভাবে ভগবান সকলকেই আহার প্রদান করছেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে জীবের বিশেষ বিশেষ চরিত্র গঠিত হয়।"[৫] একথা স্মরণ করে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, সাঁপের অনাহারে থাকাই উত্তম। শ্রীল প্রভুপাদ তাই বলেছিলেন, নিয়তি তাই সর্প-প্রকৃতির ব্যক্তিরা যাতে অন্যদের ক্ষতি না করতে পারে, সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা থেকে মাঝে মাঝে বিরত থাকে।

নীতিশাস্ত্রের এই শ্লোকের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতমে অনেক শ্লোক রয়েছে। ঋষিগণ যখন মহারাজ বেন এর আসুরিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা অতিষ্ঠ হয়ে ভাবছিলেন, "এই দুষ্ট রাজাকে সমর্থন করা ঠিক দুধ দিয়ে কালসাঁপ পোষার ন্যায়। এখন সে-ই সব রকমের দুঃখ-কষ্টের কারণ।"[৬]

ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর ন্যায় আসুরিক ব্যক্তিকে বর প্রদানের ব্যাপারে সতর্ক করে ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, "হে ব্রহ্মা, হে পদ্মসম্ভব, সর্পকে

দুধপ্রদান করা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই অত্যন্ত ক্রুরস্বভাব ঈর্ষাপরায়ণ অসুরদের বরদান করাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাই অসুরদের আর কখনই এই প্রকার বর দান না করার জন্য আমি তোমাকে সতর্ক করছি।"[৭]

নারদ মুনিও একইভাবে স্বকাম কর্মকাণ্ডে যুক্ত প্রাচীনবর্হিকে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করতে চাননি। কেননা নারদমুনি এই নীতি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন যে, সৎ উপদেশ প্রদান করলে মূর্খদের কেবল ক্রোধই উৎপন্ন হয়। সেই উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে তারা আরও বিরুদ্ধ হয়ে উঠে। "নারদমুনি তা খুব ভালোভাবেই জানতেন, তাই তিনি রাজাকে তার সারা জীবনের ইতিহাসের মাধ্যমে পরোক্ষ্যভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।"[৮]

সমুদ্র মন্থনের সময়ও একই ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। "অসুরেরা স্বভাবতই সর্পের মতো ক্রুর। সেজন্য তাদের অমৃতের ভাগ দান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা তা সর্পকে দুগ্ধদান করার মতোই ভয়ানক। একথা বিবেচনা করেই অচ্যুত ভগবান অসুরদের অমৃতের ভাগ প্রদান করেননি।"[৯]

রাজা কংসও সর্পের ন্যায় ক্রুর স্বভাবের ছিল, যে সব ধরনের সৎ পরামর্শ বর্জন করেছিল। সে জন্য দেবকী জানতেন যে, কংসকে উপদেশ দিলে তার ক্রোধই বৃদ্ধি পাবে। চাণক্য পণ্ডিত যেমন আরেকটি শ্লোকে বলেছেন যে, ক্রুর ব্যক্তি সাঁপের চেয়েও ভয়ানক, কেননা মন্ত্র বা ঔষধির মাধ্যমে সাঁপকে বশে আনা যায়, কিন্তু ক্রুর ব্যক্তিকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কংস অবশেষে নিহত হয়েছিল এবং কেউ তার জন্য কোনো দুঃখ-শোক প্রকাশ করেনি।

একইভাবে বিদুর যখন দুর্যোধনকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি উপরোক্ত শ্লোকের বর্ণনার ন্যায় দুর্ভাগ্যের স্বীকার হয়েছিলেন। "চারিত্রিক গুণাবলির জন্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদেরও সম্মানীয় বিদুর যখন এভাবে বলতে লাগলেন, তখন তিনি দুর্যোধন কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন।"[১০]

ভগবদ্গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অপূর্ণ কাম হতাশা ও ক্রোধের সৃষ্টি করে। কাম জড় দেহের মিথ্যা অহংকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবিরোধী কামাচারে লিপ্ত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ হয়ে থাকে। ক্রোধ হচ্ছে বাসনার বড় ভাই।

সর্পের ন্যায় ক্রোধী ব্যক্তিরা ধর্মীয় বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে আর পরিণামে হতাশা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা যদি এরকম স্বভাবের লোকের কাছে প্রচার করি, "মহাশয়, আপনি যদি সুখী হতে চান, তবে মাংসাহার ত্যাগ করুন, এটা বড় পাপকর্ম।" তবে তা কেবল তার ক্রোধই বৃদ্ধি করবে।

যাই হোক, মানুষ যখন অপরের কাছ থেকে সদুপদেশ শ্রবণ করে, তখন তার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার পেছনে আরেকটি কারণ থাকতে পারে। মানুষ প্রতারিত হলে ক্রুদ্ধ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ ভগবান সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনাপূর্ণ বক্তব্য শুনে বিভ্রান্ত। তারা প্রতারক ধর্মীয়গোষ্ঠীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত। সে জন্য কেউ যদি নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে দাবী করে বা তার মত সম্বন্ধে বলে, তবে তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তারা তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। অনেকেই হয়তো পারমার্থিক জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চায় না।

ক্রোধের কারণে হিংসা বৃদ্ধি পায়। ক্রোধ ভয়েরই উল্টো পিঠ। উভয়ই অপূর্ণ কাম থেকে আসে। অতৃপ্ত কামের দরুণ যাদের হতাশার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের কাছে কৃষ্ণভাবনা বড় হুমকিস্বরূপ। মানুষ যখন হুমকি অনুভব করে, তখন তারা ভয় পায় এবং ভয় তাদেরকে আরও ক্রোধী করে তোলে।

এ যুগের মানুষ স্বভাবতই বিদ্রোহী ও অবাধ্য মনোভাবের। তারা প্রচারকের কাছ থেকে শ্রবণ করতে পছন্দ করে না, কারণ তারা বহুবার প্রতারিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃতে এর সবই দরকার– আচার্যের প্রতি বাধ্যতা, শরণাগতি, ইন্দ্রিয়সংযম। তাই তা তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। আমরা মাংসাহারী মাংসের শিল্প, পতিতালয়, জুয়াখানা এবং সিগারেট শিল্পের জন্য হুমকী, কারণ যদি এসব বন্ধ হয়ে যায়, তবে মানুষ কীভাবে উপার্জন করবে। পিতামাতা অত্যন্ত রেগে যান, যখন তারা দেখেন যে তাদের সন্তানেরা পারমার্থিক জীবন গ্রহণ করছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মধ্বজীরাও রেগে যায়, কেননা এতে তাদের চার্চের লোকও কমে যায়।

এসবের মুখোমুখি হয়ে কেউ হয়তো বলতে পারে যে, তাহলে আমাদের সর্পের ন্যায় ক্রোধী ব্যক্তিদের কাছে প্রচার না করাই ভালো। না। সকলের কাছেই আমাদের প্রচার করতে হবে। সেটাই চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা। তবে এর প্রতিক্রিয়ার জন্যও আমাদের তৈরি থাকতে হবে। "মূর্খ ও ক্রোধী ব্যক্তিদের সদুপদেশ দেওয়ার ফলে তাদের ক্রোধই বৃদ্ধি পাবে।"[১১] তা সহ্য করার জন্য ভক্তদের তৃণাপেক্ষা দীন হতে হবে। যে ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের মাঝে প্রচার করেন, তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বলেছেন যে, প্রসাদ বিতরণের এতো মহিমা যে, তা এমনকি সর্প স্বভাব ব্যক্তিদেরও পরিবর্তন করতে পারে। সকল পরমার্থবাদীই ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, কেননা ইন্দ্রিয় সাঁপের মতো সব সময়ই দংশন করতে প্রস্তুত। সাঁপের বিষ যদি অপসারণ করা যায়, তবে তা সাধারণ সরীসৃপের ন্যায় হয়ে যায়। যোগীরা ধ্যানের মাধ্যমে যা অর্জন করতে চায় ভক্তরা কেবল প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমেই তা অর্জন করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ সর্পের মতো ইন্দ্রিয়গুলো থেকে সকল বিষ অপসারণ করে।

এই শ্লোকে সর্পকে দুধ এবং আসুরিক লোকদের উপদেশ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি আসুরিক লোকদের উপদেশের পরিবর্তে দুধ প্রদান করা হয়, তবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করা তাদের জন্য সহজ হবে এবং এটা তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি করবে না। আমরা সকলেই আসুরিক লোকদের বলতে শুনেছি, "আমি এত সুস্বাদু মিষ্টি কখনই খাইনি। অনেক ধন্যবাদ।" প্রসাদ বিতরণ অত্যন্ত শক্তিশালী। কৃষ্ণভাবনাকে যারা কান দিয়ে গ্রহণ করে না, তারা প্রসাদের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবে। প্রসাদ তাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারে। কেননা এটা কোনো সাধারণ আহার নয়, ভগবৎ-নিবেদিত প্রসাদ।

প্রচারককে সহিষ্ণু হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত বুদ্ধিমানও হতে হবে। "আমাদের প্রচার করতে হবে। কিন্তু আপনি যদি তাদের সরাসরি মূর্খ, মায়াপহৃতজ্ঞানা, দুস্কৃতিনঃ বলেন, তবে তারা রেগে যাবেই। কেননা *'সত্যম মাম্ সত্যম অপ্রিয়ম্।'* আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সত্য প্রকাশ করতে হবে। অন্যথায় তারা রেগে যাবে।"[১২]

শ্রীল প্রভুপাদ, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কৌশল ব্যাখ্যা করেছেন। অভক্তদের কাছে গিয়ে প্রশংসার দ্বারা প্রথমে তাদের উদ্বেলিত করতে হবে, যা তাদের শ্রবণের প্রতি আসক্ত করবে। তারপর আমরা তাদের বলতে পারি, "আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি এতদিন অর্থহীন, যা শিখেছেন তা ভুলে যান, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হোন, তবে আপনার জীবন সার্থক হবে।" আমাদের প্রচার এমন হবে।

যদিও শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের আসুরিক ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সত্য উপস্থাপন করতে বলেছেন, কিন্তু তিনি নিজেও অনেক অনুষ্ঠানে আসুরিক ব্যক্তিদের সরাসরি বোকা ও বদমাস বলে ভর্ৎসনা করেছেন। সে জন্যই তিনি তার প্রচারে এত সফল? কেন এত লোক তাদের সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের সমালোচনাকে গ্রহণ করেছেন?

সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রীল প্রভুপাদ সম্পর্কে আমাদের পূর্বের আলোচনাই সেটি নির্দেশ করে। প্রভুপাদ ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র। তিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় লোকজন তার যুক্তিকে গ্রহণ করতে রাজী হতেন, যদিও তারা তাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে চাইত না। যদিও তারা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের সাথে তর্ক করতো কিন্তুকদাচিৎ কেউ কেউ পশ্চাতে শ্রীল প্রভুপাদের সমালোচনা করত।

অ্যালেন ব্রুকের টেলিভিশনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠান করার কথা এখনও আমার মনে পড়ে। অ্যালেন ব্রুক অতিথিদের শায়েস্তা করতে খুব পটু ছিলেন। তিনি সকলের সামনে অতিথিদের নাস্তানাবুদ করতেন। তারপর সকলে যখন

হাসতেন, তখন তিনি তার চুরুটে আগুন ধরিয়ে বলতেন, Next? তারপর নতুন অতিথি মঞ্চে আসতেন।

ভক্তরা ভয় পাচ্ছিল শ্রীল প্রভুপাদ মঞ্চে অপমানিত হন কি না? কিন্তু অ্যালেন ব্রুক শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি এতো শ্রদ্ধাশীল ছিল যে, এমনকি তার সামনে একটি সিগারেটও সে মুখে দেয়নি। তিনি করজোড়ে বসে প্রভুপাদের সাথে আলোচনা করেন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ একজন প্রকৃত স্বামী আমাদের সামনে অবস্থান করছেন।

সে প্রভুপাদের সাথে 'অবৈধ যৌনসঙ্গ পরিত্যাগ' এই নিয়মটির বিরোধিতা করল। শ্রীল প্রভুপাদ এত সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন যে, সে শুধু নিজের জীবনেই তা প্রয়োগ করেননি, বরং বৈধনীতি হিসেবেও তা গ্রহণ করেছে। শ্রীল প্রভুপাদ যুক্তির দ্বারা তাকে পরাস্ত করেছেন। সেই শো-তে তিনি কয়েকবার তার প্রজ্ঞার দ্বারা ব্রুককে হতচকিত করেছিলেন। কীভাবে এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া যাবে, ব্রুকের তা জানা ছিল না। কীভাবে কেউ এমন যুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন প্রত্যেকেরই বাবা আছে এবং আদি পিতার কাল নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা সেই বংশ নির্ণয় করতে পারি। প্রভুপাদের প্রচার এতই মহিমান্বিত ছিল যে ব্রুকের মতো সবাই অবশেষে মেনে নিতো যে, সব ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই।

কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে সফল হওয়ার একটি কারণ হলো, তিনি বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ এবং সম্পূর্ণ ভদ্রলোক ছিলেন। তাছাড়া তার কথাগুলো এতো যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, তার বিরোধিতা করা খুব কঠিন ছিল। এ্যালেন জিন্সবার্গের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, "এমনকি শ্রীল প্রভুপাদের সাথে আমি একমত হতে না পারলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার পূর্ণ শরণাগতির মধুরিমা আমি অনুভব করতাম।" যারাই শ্রীল প্রভুপাদের সাথে আলোচনা করতো, সবাই তার সেই মধুরিমা উপলব্ধি করতেন এবং মতবিরোধের চেয়েও সেটির প্রভাব ছিল গভীর।

মানুষ তাদের সারা জীবনেও প্রভুপাদের মতো এমন ব্যক্তিত্ব দর্শন করেনি। তারা তার মধুরিমায় স্নাত হতো। সেখানে গ্রহণীয় অনেক বিষয় ছিল– তার উপস্থিতি, তার শিষ্য, তাদের সম্পর্ক, দর্শন, প্রসাদ প্রভৃতি। প্রত্যেকেই এ ধরনের অনুভূতি ও প্রভুপাদের মধুরিমার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত।

ভগবানের প্রতি এমন শরণাগত ভক্ত আর কে পূর্বে দেখেছে? শ্রীল প্রভুপাদ তাদের সরাসরিই বলতেন, তারা কেন এতো পাপময় কাজে লিপ্ত "তুমি গর্ভে তোমার সন্তানকে হত্যা করছো, মাকে হত্যা করছো? তুমি তোমার মাকে

হত্যা করছো? এটি কি কোনো ভালো কাজ, কেন তোমরা এমন করছো?

" কিন্তু আমি তা করি না।"

প্রভুপাদ বলতেন, "তুমি না, আমি সকলের কথা বলছি।" কখনও তিনি কাউকে নির্দেশ করে এমনভাবে বলতেন যে, কেউ তার বর্ণনার মতো পাপী হতে চাইত না।

তার উপস্থিতি ছিল নির্ভর করার মতো গভীর ও স্থির। মানুষ তাকে অসম্মান করতে চাইত না। তা করার জন্য তাদের নাম ধরে ডাকার আশ্রয় নিতে হতো। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ভদ্র, নিষ্পাপ, পণ্ডিত ও প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি। প্রভুপাদের অতি উন্নত অবস্থা বুঝতে পারতো না এমন ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যেত। তবে যারা তার কাছ থেকে দূরে থাকতো, তারাই তার বিরোধীতা করার সাহস করত– "আসন থেকে নেমে আসুন! যদি সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতার প্রত্যেককে একে একে প্রভুপাদের সামনে আনা হয়, তবে সম্ভবত তারা মোহাবিষ্ট হবে, কিছুটা ফরাসি বিপ্লবীদের মতো, ঠিক যেমনভাবে প্রভুপাদ ভারতে নকশালদের মুখোমুখি হয়েছিলেন।"

কেউ যদি প্রভুপাদকে অপমানিত করার চেষ্টা করতো, তবে তিনি তা আমলে নিতেন না। তখন তারা আর তর্ক করতে পারতো না। ভাগবতে বর্ণিত আছে, যখন মৃগারীর সাথে নারদ মুনির সাক্ষাৎ হয়, তখন নারদ মুনির অতি উন্নত অবস্থার দরুন মৃগারী তার সামনে আর খারাপ আচরণ করতে পারেনি।

১ শ্রী উপদেশামৃত, শ্লোক– ৪
২ প্রাতঃভ্রমণ, বৃন্দাবন, মার্চ ১৪, ১৯৭৪।
৩ প্রাতঃভ্রমণ, বৃন্দাবন, মার্চ ১৫, ১৯৭৪।
৪ প্রবচন, জেনেভা, জুন ১, ১৯৭৪।
৫ ভাঃ ৪/১৮/২২ তাৎপর্য।
৬ ভাঃ ৪/১৪/১০।
৭ ভাঃ ৭/১০/৩০।
৮ ভাঃ ৪/২৫/৯ তাৎপর্য।
৯ ভাঃ ৮/৯/১৯।
১০ ভাঃ ৩/১/১৩।
১১ প্রাতঃভ্রমণ, নাইরোবি, অক্টোবর ২৮, ১৯৭৫।

১২ প্রবচন, বৃন্দাবন, নভেম্বর ১৭, ১৯৭৬।

পরিশিষ্ট

চাণক্য পণ্ডিত ব্যবহৃত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকসমূহ

কী ত্যাগ করা কর্তব্য?

ত্যজেধর্ম্ম দয়াহীনং বিদ্যা হীনং গুরু ত্যজেৎ।
ত্যজেৎক্রোধমুখী ভার্যান্নিঃ স্নেহাবান্ধবত্যজেৎ ॥

বিদ্যাহীন গুরু, দয়াহীন ধর্ম, স্নেহহীন বন্ধু আর ক্রোধযুক্তা স্ত্রী পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ বিদ্যাহীন গুরু শিষ্যকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। প্রীতিহীন বন্ধুও কোনো উপকারে লাগে না। যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করেন সেই ধর্ম যদি দয়াহীন হয়, সেই ধর্ম কোনো কাজে লাগে না। প্রচণ্ড ক্রোধযুক্তা স্ত্রী সংসারে অমঙ্গল ঘটায় তার ফলে সংসারে অশান্তি ঘটে।

চিন্তনীয় কাজ

কঃ কালঃ কানি মিত্রানি কো দেশঃ কৌ ব্যয়াগমৌ।
কস্যাহং কা চ মে শক্তিরিতি চিন্ত্যং মুহূর্ম্মুহূ ॥

কোনো কাজ করার পূর্বে ভেবে চিন্তে করতে হবে। কাজ সম্পন্ন করার পর আর ভেবে চিন্তে লাভ নেই। কাজ করার পূর্বে ভাবতে হয় যে – কোন দেশ, কোন সময়, কে বা বন্ধু, কিবা আয় কিবা ব্যয়– নিজেরই বা শক্তি কত?

সব সমান হয় না

একোদর সমুদ্ভূতা এক নক্ষত্র জাতকাঃ।
ন ভবন্তি সমাশীলে যথা বদরিকন্টকাঃ ॥

একই মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে এবং একই নক্ষত্রযোগে জাত হয়েও সকলের হৃদয়বৃত্তি সমান হয় না। সমান পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সমান গুণী হবার নিশ্চয়তা নেই। একই বৃক্ষে ফুল ও কাঁটা বিদ্যমান, কিন্তু সেই ফুল কাঁটার পার্থক্য অনেক।

কর্মফল

কর্ম্মায়ত্ত ফলং পুংসা বৃদ্ধি কর্ম্মানুসারিণী।
তথাপি সুধীযশ্চার্য্যাঃ সুবিচার্য্যৈব কুর্ব্বতে ॥

কর্মানুযায়ী বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তদনুসারে ফললাভও হয়ে থাকে। কু-কর্মের ফলে কু-বুদ্ধিলাভ ও সেরূপ কু-ফল লাভ হয়ে থাকে। সে কারণে জ্ঞানীগণ চিন্তা-ভাবনা করে কার্যে লিপ্ত হন।

দুঃখ কি?

মূর্খ শিষ্যোপদেশেন দুষ্টা স্ত্রী ভরনেন চ।
দুঃখিতে সংপ্রয়োগেন পণ্ডিতোহপ্যসীদতে ॥

মূর্খ শিষ্যকে উপদেশ দান করে কোনো ফল হয় না। কারণ মূর্খ উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। দুষ্টা স্ত্রীর ভরণ পোষণ করা দুঃখের কারণ।

নিশ্চিত গ্রহণীয়

যে ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিসেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥

যিনি নিশ্চিত বস্তু পরিত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে গমন করেন, তিনি নিশ্চিত-অনিশ্চিত উভয় হারিয়ে ফেলেন।

সু-ব্যবহার

দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরজনে শাঠ্যং সদা দুর্জ্জনে।
প্রীতি সাধুজনে স্ময়ঃ খলজনে বিদ্বজনে চার্জ্জবম্ ॥
শৌর্য্যং শত্রুজনে ক্ষমা গুরুজনে নারীজনে ধূর্ত্ততা।
ইত্থং যে পুরুষা কলাসু কুশলাস্তেস্বেব লোকস্থিতি ॥

সকলের সাথে সম ব্যবহার করা চলে না, শঠের সাথে শাঠ্যতা, খলের সাথে অহংকারী মনোভাব, নারীর সাথে ছলনা, সাধুজনের সাথে সম্প্রীতি, বিদ্বানের সাথে সারল্য, শত্রুর সাথে বীরত্ব, আপনজনকে দাক্ষিণ্য, গুরুজনকে ক্ষমা এবং পরজনকে দয়া করা কাম্য। এরূপ ব্যবহারে মানুষ সংসারে উন্নতি করতে পারে।

বিদ্যার্থীর পরিত্যাজ্য

কাম ক্রোধ তথা লোভং স্বাদ শৃঙ্গার কৌতুকে।
অতি নিদ্রাহতি সেবে চ বিদ্যার্থী হ্রষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বাদযুক্ত আহার্য দ্রব্য ভোজনের ইচ্ছে, সেজেগুজে থাকার ইচ্ছে, কৌতুক, অতিসেবা ও অতিনিদ্রা– বিদ্যার্থীগণের ত্যাগ করা বিধেয়, কারণ এই অষ্টপ্রকার প্রবণতা বিদ্যা অর্জনে বিশেষ বাধা স্বরূপ।

সাধারণ বুদ্ধি

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্ ।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি ॥

সাধারণ বুদ্ধি না থাকলে– শাস্ত্র বেটে খাওয়ালেও কোনো লাভ নেই। দর্পণ (আয়না) অন্ধের কোন কাজে লাগবে?

বৃথা শোক

একবৃক্ষা সমারূঢ়া নানাজাতি বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে দশ দিশ যান্তি কা কস্য পরিবেদনা ॥

রাতের বেলা একটা বৃক্ষে নানাজাতির পক্ষীকুল বাস করে আর তখন অনেক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আবার সকাল হলে তারা যে কোথায় উড়ে চলে যায় আর দেখা যায় না। এটা চির সত্য; মানুষও তেমনি কয়েকদিনের জন্য সংসারে আসে, নানান পরিচয়ে আবদ্ধ হয় আবার শেষের দিনে কে কোথায় চলে যায় কারো সাথে আর সম্পর্ক থাকে না। তার জন্য শোক অকারণ।

বুদ্ধি যার বল তার

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্ ।
বনে সিংহো মদোন্মত্তো জম্বুকেন নিপাতিতঃ ॥

বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বল, মূর্খ শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী হলেও তার দৈহিক বলের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী না হলেও অসাধ্য সাধন করতে পারে। যেমন শিয়ালের চালাকিতে মদগর্বিত সিংহের প্রাণ যায়।

সর্বত্র সর্ব দ্রব্য মিলে না

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো ন হি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে ॥

সকল বনে চন্দন কাঠ পাওয়া যায় না, প্রত্যেক গজে গজমতি থাকে না, প্রত্যেক পর্বতেই মাণিক্য থাকে না, ঠিক তদনুরূপ প্রত্যেক স্থানেই সাধুরা ব্যক্তি অবস্থান করে না।

অবস্থাভেদে পলায়ন

উপসর্গেহন্যচক্রে চ দুর্ভিক্ষে চ ভয়াবহে।
অসাধু জনসংসর্গে যঃ পলায়তি সঃ জীবতি ॥

মহা দুর্ভিক্ষ, মহা উপদ্রব শুরু হলে অথবা শত্রু কর্তৃক ঘোরতরভাবে আক্রান্ত হলে – পলায়নই একমাত্র পথ। এ সকল ক্ষেত্রে পলায়ন করার ফলে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়ে থাকে। সেরূপ দুষ্টজনের সংসর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত, নতুবা প্রাণ হানিকর বিপদ উপস্থিত হতে পারে।

অনিষ্টের কারণ

হেলা হি কার্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় হীনতা।
যাচ্ঞা স্যাদ্ মাননাশায় সর্ব্বনাশায় সর্ব্বনাশায় কুক্রিয়া ॥

আলস্যের ফলে কার্য পণ্ড হয়, দারিদ্র্য বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায়, যাচ্ঞার ফলে সম্মান নষ্ট হয়, কিন্তু কুকার্যের ফলে সব কিছু বিনষ্ট হয়।

বল বা ক্ষমতা

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরানামনৃতং বলম্ ॥

দুর্বলের নিজ বল না থাকায় রাজা বা আইনের বলের আশ্রয় নিতে হয়। মূর্খের বল নীরবতা, কারণ কথা বললে তার বিদ্যার জাহির হয়ে পড়ে। শিশুর অন্য কোনো বল নেই, ক্রন্দনই তার একমাত্র বল। আর মিথ্যার আশ্রয় করে চোর ও অসাধু ব্যক্তিগণ নিজেকে রক্ষা করে থাকে। সুতরাং মিথ্যাই তাদের একমাত্র বল।

লজ্জা ত্যাগ

ধনধান্য প্রয়োগেষু বিদ্যাসংগ্রহেণেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জঃ সুখী ভবেৎ ॥

ধন ধান্য ও বিদ্যালাভের ব্যাপারে – লজ্জা থাকা কোনো মতে উচিত হবে না। আহার ও ব্যবহারে লজ্জা করলে কষ্ট পেতে হয়। তাই সেরূপ লজ্জা অর্থহীন। যারা এ সকল ব্যাপারে লজ্জা করে না– তারাই সুখ লাভ করে থাকে।

সন্তোষ লাভ

তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরা ঘনগর্জ্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্ত্বো খলাঃ পরিবিপত্তিষু ॥

ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা তুষ্ট হয়, ময়ূর মেঘ গর্জনে আনন্দে নৃত্য করে। সজ্জন ব্যক্তি পরের সুখে সুখী হয়। কিন্তু দুষ্ট বা অসজ্জন ব্যক্তি পরের দুঃখে ও বিপদে আনন্দ লাভ করে।

অতি সারল্য ক্ষতিকর

নাত্যন্তং সরলৈভাব্যং গত্বপশ্যম্ বনস্থলীম্।
ছিদ্যন্তে সরলাস্তত্র কুজাস্তিষ্টন্তি পাদপাঃ ॥

সংসারে সরল লোকদের উপর সকলে আঘাত হানে, কিন্তু বাঁকা-চোরা লোকদের ওপর সহজে কেউ আঘাত হানতে চায় না। বনভূমির সোজা ও সরল বৃক্ষগুলি কাটা হয়ে থাকে, বাঁকা বাঁকা গাছগুলি সহজে কেউ কাটে না। সারল্য ভালো তবে অতি সরলতা ক্ষতিকারক।

নিরক্ষর মূর্খ

শ্বানপুচ্ছমিব ব্যর্থ জীবিতং বিদ্যয়া বিনা।
ন গুহ্যং গোপনে শক্তং ন চ বংশ নিবারণে ॥

বিদ্যাহীন মূর্খ ব্যক্তির জীবন কুকুরের লেজের মত অচলমান। কারণ কুকুরের লেজ এমন যে সে তার গুপ্ত অঙ্গকেও ঢাকা রাখতে পারে না। সে মশা মাছি গায়ে বসলে তাকে তাড়াতে পারে না। তেমন মূর্খ বা বিদ্যাহীন মানুষ নিজের খারাপ স্বভাবকে পরিবর্তন করতে বা নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় না।

বান্ধব

পরমন্তু গুণো যস্তু নির্গুণহপি গুণো ভবেৎ।
ইন্দ্রোহপি লঘুতাং যাতি স্বয়ং প্রখ্যাপিতৈগুণৈঃ ॥

গুণবান ব্যক্তির কখনো আত্মপ্রশংসা করা উচিত নয়, নিজ গুণের বড়াই নিজে করলে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সম্মান নষ্ট হয়। তাতে সামান্য মানুষ তো দূরের কথা, যার প্রশংসা অপর লোকে করে তাকেই প্রকৃত গুণী বলা হয়ে থাকে।

বুদ্ধিহীন

দানার্থিনো মধুকরা যদি কর্ণতালৈ দুরীকৃতা করিবরেণ
তস্যৈব গণ্ডযুগ মণ্ডন হানিরেব ভঙ্গাং পূর্ণবিকচ পদ্মবনে বসন্তি ॥

হাতী যেমন নিজের মদগন্ধে অন্ধ হয়ে কানের কাছে গুঞ্জরিত ভ্রমরকে তাড়াতে থাকে। তাতে ভ্রমরের কোনো ক্ষতি হয় না, হাতীর গণ্ডস্থলই অশোভমান হয়। তখন ভ্রমরা পদ্মবনে চলে যায়। এরূপে যদি কোনও ব্যক্তি কোনো গুণী ব্যক্তির সম্মান বা আদর না করে থাকে, তাতে গুণী ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হয় না। গুণীর আদর বা সম্মান করবার অনেক লোক পাওয়া যাবে কিন্তু মূর্খ কোনোদিন গুণী লোককে পাবে না। গুণীই গুণীজনকে লাভ করতে পারেন।

বদ্‌গুণ

তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়া মুখে বিষম্।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে দুর্জ্জনে বিষম্ ॥

সর্পের দন্তে যেমন বিষ থাকে, মাছির মুখে বিষ থাকে, বৃশ্চিকের বিষ থাকে তার লেজে কিন্তু দুষ্ট লোকের সারা দেহে বিষ আছে, তাই সে বিষধর। সেজন্য সর্বদা দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

চাণক্য পণ্ডিত ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় শ্লোকাবলি

মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানী কর্ষতি ॥

এই বদ্ধ জগতের জীবসমূহ আমার অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। তারা নিত্য এবং শাশ্বত। কিন্তু বদ্ধ জীবনের জন্য তারা মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করছে। এই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন।

একাদশী ব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।
গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত পালন করেন ও শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন তারাই বৈষ্ণব।

তুলসী মূল মৃত্তিকাশ্চ তিলকানি নয়ন্তি যে।
তুলসী কাষ্ঠ পঙ্কৈশ্চ বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষের মূল দেশের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করেন, অথবা তুলসী কাষ্ঠ ঘর্ষিত পঙ্ক দ্বারা তিলক ধারণ করেন তারাই পরম বৈষ্ণব।

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকঃ পাপ বুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধা কোপাগ্নিনা হরেঃ॥

যে সকল ব্যক্তি তুলসী মালঅ ধারণ করার আবশ্যকতা কী, এই সকল হেতু দেখিয়ে বা হেতুবাদ বশত মালা ধারণ না করে, সেই সকল পাপবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনন্ত নরক ভোগ করে এবং শ্রীহরির কোপানলে দগ্ধ হয়।

তুলসী কাষ্ঠ মালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতিকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেন বাতোদ্ধৃত যথাদলম্॥

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করেন তাকে দেখে যমদূতগণবায়ু তাড়িত পত্রের ন্যায় সেই স্থান হতে পলায়ন করে।

নৃত্যং দত্তা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকম্ সংশয়ঃ।
স্বয়ং নৃত্যেন সম্পূজ্য তস্যৈবানুচর ভবেৎ॥

শ্রীভগবানের সম্মুখে নৃত্য করা শাস্ত্রসম্মত। অপরের দ্বারা নৃত্য করালে যে নৃত্য করায় তার রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। যে ভক্ত স্বয়ং নৃত্য করে সে ভক্ত শ্রীভগবানের অনুচর হয়ে থাকেন।

হরেঃ সঙ্কীর্তনং পূণ্যং মহাপাতক নাশনম্।
সর্বকাম প্রদং লোকেহ্যপবর্গ ফলপ্রদম্॥

শ্রীহরির নাম সংকীর্তন অতি পূণ্যময় এবং মহাপাতক নাশকারী। এই মহাপূণ্যময় কীর্তন সর্বকাম ফলপ্রদ ও অপবর্গ দায়ক। নামে রুচি হলে প্রেমের উদয় হয়, আর প্রেমে হরিকে সহজে মেলে।

একং দেব্যা রবৌ সপ্ত ত্রীনি কুর্য্যাদ্‌বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে কুর্যাৎ শিবেশ্চার্ধং প্রদক্ষিণং॥

স্ত্রী দেবতাকে একবার, সূর্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার. বিষ্ণুকে চারবার, শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করবে।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি শঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরুরগ্রে চান্যথা নিস্ফলং ভবেৎ॥

বিষ্ণুকে নিজের বামভাগে, শিবকে ও শক্তিকে ডানভাগে, গুরুকে নিজের অগ্রে রেখে প্রণাম করতে হয়, নতুবা প্রণাম নিস্ফলা হয়।

কৃষ্ণনামং জগবন্ধুং জগদ্বীজং গুণং পরম্।
বিশ্বাধারং কৃষ্ণনামং জগতাং পাবনং পরম্॥

কৃষ্ণনাম জগতের বন্ধু, জগতের বীজ ও পরম গুণযুক্ত। বিশ্বের আধার কৃষ্ণনামজগতের পরম পাবন স্বরূপ।

গোবিন্দ নাম সদৃশং ন ত্যাগো ন ব্রতং মূলে।
ন সংকল্প নাপি শৌচং ন পূণং ন ফলং তথা।

গোবিন্দ নামের তূল্য ত্যগ অর্থাৎ দান নেই, ব্রত নেই, সংকল্প নেই, শৌচ অর্থাৎ শুচিতা নেই এবং পূণ্যফলও নেই।

গোকোটি দানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ গঙ্গাম্বু হি কল্পবাসঃ।
যজ্ঞায়ুতং মেরু সুবর্ণ দানং গোবিন্দ কীর্তন সমং নং শতাংশৈঃ॥

গ্রহণ কালে কোটি গো-দান করলে, প্রয়াগে গঙ্গাজলে কল্পকাল যাবৎ বাস করলে, অযুত সংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান করলে, মেরু সদৃশ সুবর্ণ দান করলেও গোবিন্দ নাম কীর্তনের শতাংশের এক অংশ হয় না।